# ডোরাকাটার অভিসারে

## শের জঙ্গ

অনুবাদ :

সুভাষ মুখোপাধ্যায়



বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম (বি) সংস্করণ
এপ্রিল, ১৯৬০

প্রকাশক
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
অশোককুমার ঘোষ
নিউ শশী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

পনের টাকা

পিতৃদেবের পুণ্যস্মৃতিতে

যিনি ছিলেন মহৎপ্রাণ শিকারী, ভয় কী জিনিস যিনি জানতেন না, যিনি ছিলেন সংবেদনশীল কবি, যিনি ভালবাসতে আর ভালবাসা পেতে জানতেন, আমার অন্তরে যিনি শিকারের নেশা জাগিয়েছিলেন এবং আমাকে যিনি হাতে ধ'রে শিকার শিখিয়েছিলেন।

Tryst With Tigers
by Sher Jung
15 00

# কথারম্ভ

জানোয়ারদের মধ্যে একটি প্রজাতি, সে হল বাঘ—তাকে নিয়েই এ বইয়ের সমস্ত গল্প, বলা হয়েছে একজনেরই অভিজ্ঞতার কথা, তা হল লেখকের।

এই বইয়ের অধিকাংশ জুড়ে যেসব গল্প, তার সবই সত্য ঘটনা অবলম্বনে- ঠিক যা ঘটেছিল তার অবিকল বর্ণনা। প্রত্যেকটি চরিত্রই রক্তমাংসের সত্যিকার মানুষ—নামধাম সমস্তই যথাযথ।

বইটির দুটি ভাগ। টুকরো টুকরো ব্যক্তিগত কাহিনী এবং জায়গামত লাগসই ঘটনা সহযোগে নানা দিক থেকে বাঘ সম্পর্কিত আলোচনা—এই নিয়ে বইয়ের প্রথম অংশ; দ্বিতীয় ভাগে আমি বলেছি আমার বাঘ শিকার আর জঙ্গল চুঁড়বার গল্প।

আমার অগ্রজ শিকারীদের কাছে আমি বহুভাবে ঋণী; তথ্যের যে বিপুল মণিমঞ্জুষা তাঁরা রেখে গেছেন, আমাকে তা বিস্ময়ে অভিভূত করে, আমি তা থেকে নিয়েছিও অনেক। তাঁদের মধ্যে অল্প কয়েকজনের নাম আমি না ক'রে পারছি না। বেকার, বেস্ট, বার্টন, ক্যাম্বেল, ডানবার, ফাইফ-ককসন, ফরসাইথ, গ্ল্যাসফার্ড, গর্ডন, কামিং, জিম করবেট, লাইডেকার, কুতব ইয়ার জঙ্গ, স্যাণ্ডারসন, শেকসপীয়ার, শার্টলওয়ার্থ, স্টুয়ার্ট, স্টেরনডেল এবং টেলর।

আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে যাঁরা পারঙ্গম—যাঁদের মধ্যে আছেন জেরাল্ড বুরার্ড, জ্যাক ও'কনর, জুলিয়ান এস্ হ্যাচার এবং ডব্লু এইচ. বি. স্মিথ—তাঁদের সবাইকে শ্রদ্ধা না জানালে সেটা হবে আমার পক্ষে অকৃতজ্ঞতা। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের নিহিত শক্তি আর রহস্য সম্পর্কে তাঁরা পুরো এক পুরুষ ধ'রে তালিম দেবার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁদের লেখায় তাঁরা যে বিচারশক্তি আর পাণ্ডিত্য ধ'রে দিয়েছেন, তা আজীবন অনুশীলনযোগ্য। তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলি বিন্যাসের দিক থেকে যেমন যুগান্তকারী; বিস্তারের দিক থেকে তেমনি বিস্ময়কর; মানুষ পুরুষানুক্রমে চালনাস্ত্র আর ক্ষেপণাস্ত্র সম্পর্কে যা কিছু জ্ঞান আহরণ করেছে, সমস্তই তাঁরা বইতে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি শুধু তাঁদের নৈবেদ্যের থালা থেকে কণিকামাত্র প্রসাদ নিতে পেরেছি এবং তাঁর জন্যেও নিজেকে আমি কৃতার্থ ব'লে মনে করছি।

পরিশেষে, আমি জোর দিয়েই বলতে চাই, গ্রামের সেইসব অশিক্ষিত অজ্ঞ মানুষজনদের কাছে আমি ঋণী, হাতুড়ে হলেও যাঁরা গভীর জ্ঞানের অধিকারী—জঙ্গলবিদ্যা সংক্রান্ত সমস্ত পুঁথিপাঁজি একত্র করলেও তাঁদের কাছ থেকে যা শিখেছি, তার তুলনা মেলে না। অশিক্ষিত হয়েও জ্ঞানবৃদ্ধ গিয়াসু, নিরক্ষর হয়েও মহানুভব ভুরা, কপর্দকহীন হয়েও সাচ্চা মানুষ মোহর সিং, গাইঞা হয়েও মার্জিতরুচি ডুলিয়া, পাণ্ডুর রক্তশূন্য হয়েও অকুতোভয় গজ্জু ইত্যাদি—এরা ছিল একেকজন মহারথী শিকারী; এরা এদের হাতেকলমের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাকে ওয়াকিবহাল করেছে, বন্য প্রাণী আর বনজঙ্গল সম্বন্ধে আমার মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করেছে।

পরে আরও অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে এবং ক্রীড়াকৌতুকের এই ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে মূল্যবান অনেক কিছু আমি জেনেছি। কিন্তু নগিনা'র উদারপ্রাণ নিরভিমান মামু (আবদুস সালাম সিদ্দিক) আর পিয়ারে মিঞার মত মানুষ আমি আর দেখি নি। দুজনেই সেকেলে আদবকায়দার প্রতিমূর্তি, বনজঙ্গল আর বন্য প্রাণীর প্রতি ভালবাসায় দুজনেই টইটম্বুর। মামু মনেপ্রাণে উদার; জানোয়ারের চোখকে ফাঁকি দেওয়া আর মাচা বাঁধার বিদ্যায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী; আর পিয়ারে মিঞা, ভয় কাকে বলে না জানাটা যাঁর একটা দোষ বটে, জঙ্গল-বিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানে তিনি অদ্বিতীয়। আমি ওঁদের থেকে বহু কিছু জেনেছি এবং তাঁদের কাছ থেকে অনুগ্রহ আর স্নেহ পেয়ে আমি ধন্য।

আমার বন্ধুভাজন শ্রী এ. জলিল, ডক্টর এস. এন. প্রসাদ, শ্রীরাম রাও এবং আমার পুত্র এস. জঙ্গ—এঁরা অবিরাম আমাকে না খোঁচালে এবং সাহায্য না করলে আমার এ বই লেখা কখনই হয়ে উঠত না।

এ বই লিখতে গিয়ে সুদূর অতীতের স্মরণীয় দিনগুলোতে কী সুখেই না আমি নতুন ক'রে আবার বিচরণ করেছি। পাঠকদেরও এ বই প'ড়ে যদি ভালো লাগে, যদি কিছু জ্ঞাতব্য জানা হয়ে যায়—নিজের কথা এবং গবেষণায় ব্যয়িত সময়ের কথা মনে ক'রে আমি দ্বিগুণ আনন্দ পাব।

—শের জঙ্গ

# ভূমিকা

লোকে নিয়মিত অভিসারে যায় শুনি। আমার অভিসার বাঘের সঙ্গে। কথাটা আরও সঠিক হয়, যদি বলি—আমার এই অভিসার আমার জন্মসূত্রে ঠিক হয়েই ছিল। যেমন আমার কোনো হাত ছিল না আমি ছেলে হয়ে জন্মাব, না মেয়ে হয়ে জন্মাব—সেটা ঠিক হওয়ার ব্যাপারে।

কথাটা একটু গালভরা শোনাল। কিন্তু সে ভেবে আমি বলি নি। কেননা বাঘশিকার জিনিসটা আমার রক্তে; আমাদেব বংশে অনেকদিন থেকেই এর রেওয়াজ—তা প্রায় বেশ কয়েক পুরুষ ধরে তো বটেই।

আমার পূর্বপুরুষদের বাঘশিকারের যে কি রকম বাতিক ছিল, তা বোঝা যাবে তাঁদের রেখে-যাওয়া নিদর্শনগুলো দেখলে—সেকালের সেই ঘোড়া-আটকানোর ব্যবস্থা ওয়ালা গাদা বন্দুক থেকে শুরু করে ফ্লিন্ট-লক, ক্যাপ-লক পর্বের ভেতর দিয়ে ব্রীচ-লোডিং খরবেগসম্পন্ন কর্ডাইট রাইফেল পর্যন্ত—কিছু বাদ নেই। বাঘকে ধাওয়া করার এই নেশা, এ আমি তাঁদের কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি—বিশেষ করে, আমার বাবার কাছ থেকে। আমার বাবা ছিলেন মস্ত শিকারী। শিকারী বলতে, প্রাণীহন্তা নয়। বাবা ছিলেন বন্য জীবজন্তু সংরক্ষণের একজন বড় পাণ্ডা—এমন একটা যুগে, যখন জন্তুর চামড়া টাঙানো আর মাথার খুলি গোনা, এ দুইয়েরই খুব চল ছিল।

ছিল গরুর গাড়ি, আর আজ দেখুন জেট প্লেন। আদি ও অকৃত্রিম অরণ্য থেকে জগৎ আজ কত দূরে সরে এসেছে। এখন সেখানে ষোড়শোপচারে কলকারখানা আর যন্ত্রকুশলতার কত প্রসার হয়েছে। আজ সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। এ থেকেই বোঝা যায়, বড় বড় জানোয়ার শিকার বলতে আমরা যা বুঝি, তার দিন গত হয়েছে।

আজ কোনো অস্তিত্ব থাকছে না আর—না বন্য জীবজানোয়ারের, না বনের। গৃহস্থের গরুছাগলে গাছপালা ঘাসদুর্বো এমনভাবে মুড়িয়ে মুড়িয়ে খেয়ে চলেছে যে, ওপরকার ভূমিস্তর খোয়াইতে গ্রাস করে ফেলছে। পরিবেশের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে মানুষ অপারগ হওয়ায় জলহাওয়াকে জলহাওয়াই পালটে যাচ্ছে। যে জায়গায় বন ছিল, আমরা সে জায়গায় বন উজাড় করে দিচ্ছি—সেইসঙ্গে বনের জীবজানোয়ারদেরও জাহান্নামে পাঠাচ্ছি। মানুষ গত পঞ্চাশ বছরে স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীর আটত্রিশটি—আমি আবার বলছি, আটত্রিশটি—প্রজাতিকে এবং প্রায় ঐ একই সংখ্যক পাখিকে মেরে মেরে শেষ করে ফেলেছে। আরও অনেক পশুপাখি দুনিয়ায় লোপ পেতে বসেছে। বনের পশুপাখি আর বন উজাড় করার ব্যাপারে আমরাও এদেশে কম যাই না। এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই আমাদের হাতে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দশটি এবং পাখিদেরও দশ দশটি প্রজাতিকে আমরা লুপ্ত অথবা লুপ্তপ্রায় করে ছেড়েছি। পঞ্চাশ বছর আগে এদেশে যেখানে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার বাঘ ছিল, আজ সেখানে বাঘের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সর্বসাকুল্যে চার হাজারের বেশি নয়। হিমালয়ের তরাইয়ের জঙ্গল আর পূর্বঘাট-পশ্চিমঘাটের অরণ্য—এইসব বৃক্ষবহুল বনজঙ্গল মাত্র বছর কুড়ির মধ্যে আমাদের একপুরুষেই একেবারে ঢালাওভাবে উজাড় করা হয়েছে—যা ফুরিয়ে ফেলতে আমাদের পূর্বপুরুষদের দু শতাব্দী লেগে যেত। প্রকৃতির জীব-উদ্ভিদের যে উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছিলাম তার একটা বড় অংশ আমরা ফুঁকে দিয়েছি।

এর একটা বিহিত করা দরকার। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা ভেবে, আসুন আমরা ইতিমধ্যেই হ্রাস-পাওয়া বনের প্রাণিকুল আর গাছপালা রক্ষা করি। নইলে আমাদের সেই অনাগত বংশধরদের বেড়াবার মত বনজঙ্গল কিংবা দেখে চেনবার মত জানোয়ার—দুটো থেকেই আমরা তাদের বঞ্চিত করব।

ধ্বংসের এই তাণ্ডবলীলা সত্ত্বেও এখনও এদেশে প্রচুর বনজঙ্গল আর জন্তুজানোয়ার আছে। সবসুদ্ধ আছে স্তন্যপায়ীদের পাঁচশো, পক্ষিকুলের তিন হাজার আর কীটপতঙ্গদের জানা তিন সহস্রাধিক প্রজাতি। আসুন এদের আমরা অভয় দিই, বনজঙ্গল রক্ষা করি। এটা দরকার শুধু বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্যেই নয়, মানুষেরও এতে বাঁচাব উপায় হবে।

শিকারে আনন্দ মেলে—যদি তা আমাদের ভেতরকার পশুত্বের রক্ত-পিপাসা মেটাবার উদ্দেশ্যে না হয়। প্রথমত, যদি জীবজন্তুর স্বভাব-চরিত্র আর আস্তানা সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ হয়; দ্বিতীয়ত, যদি বুনো জানোয়ারদের ভেতরকার মারাত্মক অংশটাকে নিকেশ করার জন্যে হয়—তবেই শিকারে গিয়ে আনন্দ। এটা সব সময়েই করতে হবে কাটা-ছাঁটার বিচক্ষণ মনোভাব নিয়ে—মত্ত হাতির মারমুখো মনোভাব নিয়ে নয়। শিকারীর বন্দুক হল অস্ত্রোপচারকের ছুরির মত—যাতে যথাসম্ভব কম ক্ষয়ক্ষতি করে ফালতু অংশটাকে বাদ দেওয়া যায়। বন্দুক যেন দুর্বৃত্তের বেপরোয়া হাতের অস্ত্র না হয়। কে কোন্ ধাতুতে গড়া, কে কত চৌকস—তা জঙ্গলে গেলে ধরা পড়বে। জঙ্গী অভিযান আর পাইকারী খুনের জন্যে নয় —বন রয়েছে ব্যক্তির বুকেব পাটা দেখাবার জন্যে। যার যে জায়গা, তাকে সেখানেই জঙ্গলবিদ্যার কৌশলে কাত করা—সেখানেই শিকারের মজা। আপন-বাঁচাকে মুখ্য না করে যে গৌণ কববে—বলা যাবে আত্মরক্ষার গুপ্তবিদ্যায় সে পারঙ্গম হয়েছে। শুধু শিকারে নয়, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই নীতি সব সময়ই আমার কাছে খুব লাভের হয়েছে।

আমি যে ধরনের শিকার পছন্দ করি, তাতে দরকার জন্তুজানোয়ারদের চালচলন আর স্বভাবচরিত্র জানা এবং বনবিদ্যা আয়ত্ত করা। এ কথা মনে রেখে, এই বইয়ের জন্যে আমি শুধু এমন সব গল্পই বেছেছি যাতে বনবিদ্যা অথবা জন্তুজানোয়ারদের চালচলন ও স্বভাবচরিত্রের ব্যাপারটা অল্পবিস্তর ফুটে উঠেছে। এটা করতে গিয়ে জায়গায় জায়গায় কোনো কোনো কথা খোলসা করার জন্য আমি হয়ত একটু বাগ্‌বিস্তার করে ফেলেছি, কোথাও কোথাও মাঝখানে হঠাৎ গল্প থামিয়ে জন্তুজানোয়ারের ব্যবহারের কোনো একটা দিক সম্বন্ধে আমার মতামত ব্যক্ত করেছি। আমার মতামত কোথাও কোথাও পণ্ডিতম্মন্য শোনাবে, জায়গায় জায়গায় বিতর্কেরও সৃষ্টি করতে পারে এবং এইভাবে লেখার ফলে কোথাও কোথাও গল্পের

তাল কেটে গিয়ে থাকতে পারে। তবে যে ভাব নিয়ে আমি অনুপ্রাণিত হয়ে এই বই লিখেছি—এ সমস্তই তার সঙ্গে খাপ খায়। আমি চাই ক্রীড়াকৌশলের এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে পাঠকদের আমার অর্জিত সমস্ত অভিজ্ঞতার ভাগীদার করতে। আমার অভিজ্ঞতা ত্রিশ বছরেরও বেশি দিনের। শিকারে আমার সঙ্গে থেকেছে আমার ছেলে আর তার সমবয়সীরা।

আমি নিজের কথা বলতে পারি। জঙ্গলে যে আনন্দ, তার বিনিময়ে তুনিয়ায় রাজার হালে থাকার লোভও আমি স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিতে রাজী। আমাকে যখন স্বর্গে পাঠানো হবে আমি চাইব একটা রাইফেল আর একজোড়া হান্টিং বুট—অপ্সরা-অপ্সরী থাকল না-থাকল, তাতে আমার ভারি বয়েই গেছে।

## প্রথম পর্ব

# ডোরাকাটা

# বাঘ

বাঘ। 'বাঘ' বললেই একেক জনের মনে একেক রকমের ছবি ফুটে ওঠে। বাঘের মধ্যে কেউ মাত্রা চড়িয়ে দেখেন চরম হিংস্রতা, কেউ বা অবিমিশ্র সৌন্দর্য। আমার মনে পড়ে যায় ছেলেবেলাকার এক অপরূপ স্মৃতি—বন্য প্রকৃতির কোলে জীবনে যেদিন সেই প্রথম আমি এই রাজকীয় প্রাণীটিকে দেখি।

দিনটা ছিল শীতের। তকতকে ঝকঝকে আকাশ। ছুরির ফলার মত ধারালো দমকা হাওয়া। লোহ্গর-খোল উপত্যকার ক্রমসূক্ষ্ম ভূখণ্ডে তখন দিনের আলো সবে নিভে আসছে। শিবলিক পর্বত-মালার পাদদেশের এই জায়গাটাতে কুখ্যাত এক গোহন্তা বাঘের সন্ধানে এসে বাবা আড্ডা গেড়েছেন। আমি তাঁর সঙ্গ নিয়েছি ফূর্তিতে তোফা মাঠেঘাটে ঘুরব বলে—একঘেয়ে স্কুলে যেতে ভালো-না-লাগাটাও হয়ত তার কারণ ছিল।

আনকোরা নতুন সিঙ্গ্‌ল্-শট রাইফেলটা একবার পরখ করে দেখবার জন্যে একে আমার হাত নিশপিশ করছিল, তার ওপর দু পা যেতে পারলেই বনমোরগের দেখা পাই। সুতরাং রাইফেলটা নিয়ে এক ফাঁকে আমি তো বেরিয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গে মহাউৎসাহে গুটি গুটি চলল আমার ছায়াসহচর প্রিয়সখা ডিউক। আমার এই ফক্সটেরিয়ার কুকুরটি ছুটে গিয়ে শিকার কুড়িয়ে আনার ব্যাপারে খুব তুখোড়।

আমাদের তাঁবুর কাছের উপত্যকা ক্রমশ সরু হয়ে গিয়ে পড়েছে কূপীমতন দেখতে নদীর খাতে। খাত বরাবর নুড়ির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পুরো একশো হাতও যাই নি, একটা বাঁকের মুখে এসে পড়লাম। দেখি একটা গর্তে টলটল করছে কাঁচের মত স্বচ্ছ জল। নদীর খাতকেই বলে 'খোল'। খোলটা ষাট হাতের বেশি

চওড়া নয়। প্রায় পুরো জায়গাটাই আগাগোড়া সমান, সেখানে দৃষ্টি আড়াল করবার মতন কিছু নেই। জায়গাটার দু পাশে একটানা ক্ষয়া-থর্বুটে পাহাড়; শুধু বাঁ-পাড়ে খানিকটা ফাঁক।

আমি ডানদিকের পাড়ে উঠে গর্তটার হাত বিশেক দূরে একটা করঞ্জা ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে থাকলাম। ডিউক আমার পাশে মাটিতে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে কানদুটো খাড়া করে রইল—কেননা বনমোরগের দল কঁকর কঁকর করতে করতে, একটু যেন পা-টিপে পা-টিপে জলের জায়গাটাতে আসছিল। কোনো একটা ব্যাপারে বন থেকে বেরিয়ে আসতে তাদের বাধো বাধো ঠেকছিল। ডিউকের দেখাদেখি আমিও একেবারে নিঃসাড়ে নিজের জায়গায় বসে।

হঠাৎ বনমোরগদের মধ্যে একটা তুমুল কলরব পড়ে গেল—হৈচৈ করে পাখা ঝাপ্টাতে ঝাপ্টাতে তারা পাহাড়টা টপ্কে চলে গেল! আমার তখন কী মন খারাপ! আমি খুব মুষড়ে পড়েছি, এমন সময় দেখি ডিউক আমার গায়ে গা ঘষছে। আমি ওর মধ্যে ভীষণ একটা ছটফটে ভাব, কেমন একটা অস্থিরতা লক্ষ্য করলাম—যা এ ধরনের সুশিক্ষিত কুকুরের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। আমি ডিউকের পিঠে হাত রাখলাম—আশ্চর্য, ডিউকের সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। ডিউককে নিয়ে আমি মহা চিন্তায় পড়লাম। ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, না কেঁপে ও থাকতে পারছে না আর আতঙ্কে চোখদুটো গোল-গোল করে একদৃষ্টে খোলের ওপারে চেয়ে আছে! আমি ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখি নালার মুখে দুটো পাহাড়ের মাঝখানের ফাঁকটাতে অস্তোন্মুখ সূর্যের পাণ্ডুর আলোয় সামনের দিকে খাটো হয়ে আমাদের একেবারে মুখোমুখি একটা প্রকাণ্ড মূর্তি লম্বা বিশাল বপু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—আমার কুকুরের ভড়কানোর সেই হল কারণ। তাকে দেখে মনে হল, আবছায়া গোধূলির কঠিন দেয়ালে আমার সামনে কেউ যেন আলোছায়ায় বড় করে একটা ভারি সুন্দর প্রাচীরচিত্র এঁকে রেখেছে।

গোধূলির সোনায় কালোয় নিজের গায়ের সোনা-কালো রং

ফেলে মূর্তিটা কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ; তারপর মাথাটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে, শরীরটাকে ধনুকের মত বেঁকিয়ে খোলের ভেতর সাঁ করে ছুটে গেল। এক মুহূর্ত লাগল ওটা কার মূর্তি সেটা বুঝতে ; ওর চলনের সুঠাম ছন্দ আর দেহের মসৃণ রেখা ছাড়া আর কিছুই তখন আমি অনুধাবন করি নি। মূর্তিটা যখন খোলের মাঝ বরাবর এসেছে, একমাত্র তখনই আমার মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল— ওটা বাঘ!

সোজা হেঁটে আমাদের কাছাকাছি জলের জায়গায় এল, কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াল, চারদিক দেখল, তারপর আস্তে আস্তে, যেন রোদ-চিকচিক মেঘের মত, সে যে কী সুন্দরভাবে তার দেহটা নুইয়ে শান্তনিথর জলে গোঁফসুদ্ধ মুখটা ডুবিয়ে দিল বলবার নয়। আমাকে ঘিরে বাঁকানো ধনুকের মত টান-টান হয়ে আছে ঘনায়মান সন্ধ্যা ; আর আমি যেন টান-দেওয়া ছিলার ওপর থামলানো তীরের মত ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসে আসন্ন ওড়ার আবেগে কাঁপছি।

বাঘটা অনেকক্ষণ ধরে চকচক করে পেট ভরে জল খেল আর আমি প্রাণভরে দেখলাম পৃথিবীতে কোটিকে গোটিক সেই দৃশ্য। আর তারপরই, সটান উঠে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড মাথাটাকে ঝাঁকালো, তারপর নিচেকার ঠোঁট বেয়ে ঝুরঝুর করে জল পড়তে পড়তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সে মিলিয়ে গেল— তাকে আমার মনে হল স্বপ্ন।

আমার মনে প্রাণে আনন্দের সে কী পুলক। আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে আমি অনুভব করেছিলাম কী অনির্বচনীয় উন্মাদনা। কটা দিন বাঘের কথা ছাড়া আর কিছুই আমার মনে স্থান পায় নি। আর এদেশের বনের সেই রাজার সম্মোহন আজও আমি কাটিয়ে উঠতে পারি নি।

দুনিয়ায় বাঘের মত আর কোনো প্রাণীই মানুষের কল্পনারাজ্যকে এভাবে অধিকার করে থাকে নি। এদেশে বাঘ এমনভাবে আমাদের মন জুড়ে রয়েছে যে শুধু ছেলে-ভুলানো ছড়া আর লোককথাতেই নয়—আমাদের চিরায়ত সাহিত্যেও বাঘের নাম পাওয়া যাবে।

আমাদের দেশে 'শের' আর 'সিং' দিয়ে আছে আকছার নাম ; মন্দিরে মন্দিরে মা-কালীর যে মূর্তি, সেখানেও বাহন বাঘ।

বাঘের সৌন্দর্যে আর বলবত্তায় কবিরাই শুধু মুগ্ধ হন নি। আমাদের প্রাচীন যুগের আলঙ্কারিকেরাও বাঘের সন্তর্পণে স্বচ্ছন্দ রমণীয় পদচারণার প্রশস্তিতে একটি ছন্দের নাম দিয়েছেন: শার্দূলছন্দ।

## আস্তানা

ককেশাস থেকে শুরু করে উত্তর পারস্য, ভারত, বর্মা আর মালয় উপদ্বীপ হয়ে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন, মাঞ্চুরিয়া, আমুরভূমি আর কোরিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়ে বাঘের বসবাস।

এদেশে জঙ্গলের রাজাধিরাজ বলতে বাঘ। অনেকের বিশ্বাস, এদেশে এসে বাঘ আস্তানা গেড়েছে অনেক পরে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের ধারণায়, শেষ তুষার যুগের পর উত্তর এশিয়া থেকে এদেশে বাঘের পত্তন হয়েছে। তাঁরা বলেন, চীনের ভেতর দিয়ে হিমালয় পর্বতমালার পূর্ব-প্রান্ত হয়ে তারা উত্তরপূর্ব ভারতে এসে ঢুকেছে। মধ্যে সমুদ্র পড়ায় তারা সিংহলে যেতে পারে নি। মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার আগে সিংহল এককালে ভারতের সঙ্গে যুক্ত ছিল, ভূতত্ত্বের দিক থেকে তার প্রমাণ আছে। সুতরাং সিংহল দ্বীপ গড়ে ওঠবার পরে বাঘ এদেশে এসেছে।

এদেশ আজ বাঘের প্রধান বাসভূমি। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বড় বড় অরণ্যে আর আগাছার জঙ্গলে তারা কোথাও কম আবার কোথাও বা ভিড় করে আছে।

হিমালয় অঞ্চলে সাগরাঙ্ক থেকে সাত-আট হাজার ফুট উঁচুতেও বাঘের হদিস মেলে। কিন্তু আফগানিস্থান আর বেলুচিস্থানে বাঘের কথা শোনা যায় না।

এদেশের ভূ-প্রকৃতিতে দুধরনের বাঘ দেখা যায়: পাহাড়ী এলাকার গোলগাল মোটাসোটা বাঘ আর সমতলভূমির ঘাসজঙ্গলের দীর্ঘদেহী, কিছুটা সিড়িঙ্গে ধরনের বাঘ।

শেষের ধরনটাকে ভুলভাবে রয়াল বেঙ্গল টাইগার বলা হয়। নেপাল আর উত্তর প্রদেশের তরাইতে, আসামের দক্ষিণখণ্ডের পাহাড়গুলোতে, সুন্দরবনে, বর্মায় এই বাঘ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রায় হাজার দেড়েক মাইল জোড়া ঘাসজমি আর শালবনে ঘেরা এই বিশাল ভূখণ্ডটি পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো শিকারের জায়গা। বাঘেরও এটাই সবচেয়ে জুতসই আস্তানা।

তরাইয়ের পরেই বাঘের জন্যে মধ্য ভারতের বনজঙ্গলের খ্যাতি। উত্তরে রেওয়া, দক্ষিণে চণ্ডা আর দণ্ডকারণ্য (বস্তার) এবং পুবে উড়িষ্যা আর ছোটনাগপুর থেকে পশ্চিমে গোয়ালিয়র আর হোসাঙ্গাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত শালসেগুনের এই বনাঞ্চল।

তারপর আসে মহীশূর, কোঙ্কন, মালাবার, নীলগিরি আর পশ্চিমঘাট জুড়ে দক্ষিণ ভারতের বনজঙ্গল। এসব বনে, বিশেষ করে মহীশূর আর মালাবারের জঙ্গলে, খুব বেশি রকম বাঘের পদার্পণ ঘটে।

পূর্বঘাটের জঙ্গলেও বাঘ দেখা যায়; তবে সংখ্যায় খুব কম এবং আকারে আর রঙে তেমন দর্শনীয় নয়।

গুজরাটে বাঘ যা আছে তা বলবার মত নয়। সামান্য যা আছে তাও আকারে ছোটখাটো। গুজরাটের গির অরণ্যে অবশ্য সিংহ আছে—যা এখন এদেশে আর কোথাও নেই। সেখানে বাঘের চেয়ে সিংহের খাতিরই বেশি।

লাগাও এলাকা রাজস্থানে আজও প্রচুরসংখ্যক বাঘ দেখা যায়। সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও উদয়পুর, জয়পুর আর আলওয়ারে প্রায়ই বাঘ দেখতে পাওয়া যায়। দৈর্ঘ্যে কম হলেও এখানকার বাঘগুলো ভারী বহরের এবং মাথায় কিছুটা বড়।

এক সময় যেসব জায়গায় ছিল বাঘের অপ্রতিহত প্রতাপ, সে সব জায়গায়ও এই অতি সুন্দর দামী জানোয়ারটির টেঁকা ক্রমশ দুষ্কর হয়ে পড়ছে। খেতখামারের প্রসার, বন আর বনের বাসিন্দাদের সম্বন্ধে রাষ্ট্রের বেদরদী মনোভাব এবং এদেশের লোকজনদের উপেক্ষার ভাব—এই সব কিছুর ফলে বনের পশুদের জীবনে সর্বনাশ নেমে এসেছে। যেমন ধরুন, ব্রহ্মপুত্রের যে চরগুলোতে আগে বন্যজন্তুর ছড়াছড়ি ছিল—এখন সে সব জায়গা ফাঁকা। মেরে মেরে বাঘ উজাড় করা হয়েছে। স্যার স্যামুয়েল ডব্লু. বেকার লিখেছেন,

গত শতাব্দীর শেষে ধুবড়ির কাছারিতে কিছুদিন অন্তর অন্তর আট: আনায় বাঘের চামড়া বিক্রি হত।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের কড়চা থেকে জানা যায়, সেকালে কাংড়া শিবলিক অঞ্চলের জঙ্গলগুলো এত ঘন ছিল যে, তার ভেতর পাখিরা ডানা মেলতে পারত না। মানুষ সেই জঙ্গল কেটে কেটে সাফ করে ফেলেছে। আজ সেই পাহাড়ী জায়গা বেবাক ন্যাড়া; এখানে সেখানে কিছু ঘাসের চাপড়া আর কাঁটাঝোপ কোনোরকমে টিকে আছে। তেমনি হাড়ির হাল হয়েছে আজ বহির্হিমালয় অঞ্চলেরও।

'জার্নাল অব দি বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি' (২৭ তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৩, ১৯২০) পত্রিকায় শ্রী এন. বি. কিন্নেয়ার তখন কোথায় কত সিংহ ছিল সে সম্বন্ধে একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখছেন, '···সিন্ধু, বাহাওয়ালপুর আর পাঞ্জাবে সিংহ মেলে···।' পূর্বাঞ্চলের দিকে '১৮১৪ সালে বিহারের পালামৌ জেলায় একজন নিহত হওয়ার সংবাদ আছে।···১৮৩২ সালে একজন মারা পড়ে বরোদায়।·· আমেদাবাদের আশপাশে সিংহ প্রায়ই দেখা যেত। মধ্য ভারত ছিল সিংহের একটা মস্ত আস্তানা।···মিউটিনির সময় জর্জ অক্ল্যাণ্ড স্মিথ তিন শতাধিক ভারতীয় সিংহ হত্যা করেন এবং তার মধ্যে পঞ্চাশটা মারেন দিল্লী জেলায়।···সে সময় এদেশে কত সিংহ ছিল এ থেকে খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়।'

১৮৮৫ সালের ৩০শে জুনের 'এশিয়া' পত্রিকায় কর্নেল মার্টিনের এক লেখায় জানা যায়, তিনি এবং জেনারেল ট্রাভার্স্ ১৮৬০ সালে গোয়ালিয়রের গুনার পশ্চিমে এক পাহাড়ে দুটি সিংহ মারেন এবং দুবছর পরে তিনি এবং কর্নেল বিডন্ গুনার উত্তর-পশ্চিমে সত্তর মাইল দূরে পাটুলঘরে কমপক্ষে আটটি সিংহ মেরেছেন।

আজ সেখানে ভারতে সিংহের মোট সংখ্যা এসে ঠেকেছে মাত্র তিনশোতে। তাও এখন তাদের পাওয়া যায় শুধু গুজরাটের কাথিয়াবাড় অঞ্চলের গির অরণ্যে। পূর্বাঞ্চলের হিমালয়ের পাহাড়তলিতে গণ্ডার মিলবে পুরো দুশোও হয়ত নয়।

এদেশের আরও নানা পশুপাখি দ্রুত লোপ পেয়ে যাচ্ছে—যেমন: সানগাই ( থামিন ), কস্তুরী-মৃগ, কৃষ্ণসার, হাঙ্গল ( কাশ্মীরী হরিণ ), ঘোড়খাড় ( ভারতীয় জংলী গাধা, ) তুষার-চিতা ( আউন্ট ), পিগমী বা বামন-শুয়োর, ঘোড়ার (ভারতীয় বাস্টার্ড), গোলাপীমাথা হাঁস ইত্যাদি।

করুণা আর মৈত্রীর জন্যে যে দেশের এত গর্ব, সে দেশের মানুষ আর সরকারের পক্ষে এটা লজ্জার কথা। আমাদের শাস্ত্রপুরাণে পশুপাখি সসম্মানে স্থান পেয়েছে। গরুকে ভগবতী আর হনুমানকে মহাবীর জ্ঞানে আমরা পুজো করি। কিন্তু আজ বনের জীবকে যেভাবে আমরা হতশ্রদ্ধা করছি, তাকে নির্মম পরিহাস বলতে হবে।

সমসাময়িক কালের যে বর্ণনা কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্রে' ( খৃষ্টপূর্ব ৩২১-২৯৬ ) দিয়েছেন, তাতে জানা যায় এদেশে বন আর বনের বাসিন্দাদের রক্ষার জন্যে রীতিমত আইনের দণ্ডবিধি ছিল। তা থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি:

"যেসব মৃগ, পশু, পক্ষী ও মৎস্য রাজাদেশে অভয়লাভের পাত্র বলে ঘোষিত হয়েছে, যারা রাজকীয় সর্বাতিথিবনে বাস করে—কেউ তাদের ফাঁদে ফেললে, মারলে এবং পীড়ন করলে তাকে উত্তমসাহস-দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

"গৃহস্থেরা অভয়বনে অনধিকার প্রবেশ করলে তাদের মধ্যমসাহস-দণ্ড দেওয়া হবে।···

"জ্যান্ত পশুপাখির একষষ্ঠাংশ অভয়বনে ও সর্বাতিথিবনে ছেড়ে দেওয়া হবে।···

"হাতি, ঘোড়া, মানুষ, বৃষ ও গর্দভের আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণী, পুকুর, সরোবর, খাল আর নদীর মাছ; তাছাড়া ক্রৌঞ্চ, উৎক্রোশক, কোকিল হাঁস, চক্রবাক, জীবঞ্জীবক, ভৃঙ্গরাজ, চকোর, ময়ূর, শুক আর মদনসারিকা আর সেই সঙ্গে অন্যান্য মঙ্গল্য প্রাণী—তা সে পশুই হোক আর পাখিই হোক—এদের মারণপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

"কেউ এই রক্ষাকর্মের বিরুদ্ধাচরণ করলে তাকে প্রথমসাহসদণ্ড দেওয়া হবে।···"

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মাছ, পশু, পাখি আর বনজঙ্গল সুরক্ষিত করার উপদেশ দিয়ে অশোকের পঞ্চম অনুশাসন লেখা হয়েছে। আমরা যারা অশোকচক্র আর ত্রিসিংহ মূর্তি দিয়ে পতাকা বানিয়েছি, দুঃস্থ বনের জীব আর অরণ্য সম্পর্কেও আমরা চরম অবজ্ঞা দেখিয়ে এসেছি।

আজ বাঘেরও অভয় দরকার। বন আর বনের জীবদের রক্ষা করতে পারলে তবেই তাদের আমরা বাঁচাতে পারব। যদি আমরা তা না করি, তাহলে এমন সুন্দর প্রাণীরও লুপ্তপ্রায় সিংহের দশা হবে।

## গড়ন আর গায়ের রং

যাকে বলে মাংসাশী, বাঘ সেই জাতের প্রাণী। প্রাণহননের ক্ষমতা তাদের যেমন প্রচণ্ড, তার উপায়টা তেমনি সাদামাঠা। দাঁত-টাত হজমটজমের অতসব ভজকট নেই। স্রেফ গোটাকয়েক কাঁচির মত দাঁত আর বাঘা বাঘা শ্বদন্ত—শ্বদন্তটা শিকার ধরা আর তারপর দাঁত বসিয়ে দফা নিকেশ করার জন্যে—সেই সঙ্গে কোঁৎ করে গেলা যায় এমনিভাবে মাংস টুকরো টুকরো করে কাটার জন্যে কাঁচির মত দাঁত। বাঘের পাকস্থলী বলতে নিছক একটা থলি—তাতে আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠ নেই ; অন্ত্র ছোট্ট—শরীরের মাপের চেয়ে খুব বেশি হলে তিনগুণ দীর্ঘ।

বাঘ তার চোয়াল আড়াআড়িভাবে নাড়তে পারে না। নিচের চোয়ালের গোলগাল অস্থাস্থি এত বেশি চ্যাটালো এবং কোটরের সঙ্গে এমনভাবে লাগসই যে, উপর-নিচে কাঁচির মত ভঙ্গীতে ছাড়া অন্য কোনো দিকে নাড়ানো যায় না।

বিড়ালগোষ্ঠীর প্রাণীদের আরেকটি বিশেষত্ব হল তাদের নখ ঢেকে রাখার ক্ষমতা। শিকার পাকড়াবার দিক থেকে বাঘের পক্ষে দাঁতের মতই জরুরী তার নখ। নখ যেন সব সময় ধারালো থাকে, যেন চোট খেয়ে ভোঁতা না হয়। বাঘের মাংসপেশীগুলোর সন্নিবেশ এমন যে, মাটিতে নখাগ্র না ঠেকিয়ে বাঘ তার নরম থাবা মেলে নিঃশব্দে হেঁটে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, ছুটে গিয়ে শিকার ধরতে হয় না বলে বাঘের পক্ষে ভালো করে মাটি আঁকড়ে চলবার জন্যে নখের সাহায্য লাগে না। বাঘ চুপিসাড়ে গিয়ে শিকার ধরে, তার জন্যে গতিবেগের চেয়েও তাকে বেশি নির্ভর করতে হয় নিঃশব্দে পা টিপে চলার ওপর। বাঘের শিকারপদ্ধতিতে পায়ের আঙুলের চেয়ে ঢের বেশি প্রাধান্য পায় থাবার মাংসল অংশ।

যেসব জানোয়ার ওত পেতে শিকার করে, হঠাৎ চম্‌কে না উঠলে অথবা ঠিক লাফিয়ে পড়বার মুহূর্তে ছাড়া, তাদের নখ কখনও মাটিতে ঠেকে না—সেইজন্যে রাস্তায় কখনও তাদের নখের দাগ দেখা যায় না।

প্রকৃতির কোলে যে বাঘ, তার সঙ্গে চিড়িয়াখানা বা সার্কাসের বাঘের কোনো তুলনাই হয় না। রাতবিরেতে দূর পাল্লায় সমানে দৌড়ঝাঁপ করে আর শিকারের সঙ্গে মরণপণ লড়াইয়ের ধস্তাধস্তিতে তার মাংসপেশীগুলো ফুলে বেঢপ হয়ে দাঁড়ায়। পেট পুরে খেতে পাওয়া বাঘের গড়ন মোটেই ছিপছিপে নয়; বরং একটু বেশি রকম কেঁদো; ইয়া চওড়া কাঁধ, পিঠ আর পাছা; সেই সঙ্গে অসম্ভব মোটাসোটা হাত-পা, বিশেষ করে কনুই থেকে কাঁধ আর কব্জি। পেশীগুলো যেমনি কড়া তেমনি নিরেট; আর সেই সঙ্গে অস্থি-কঙ্কালের কাঠামোর সঙ্গে অসংলগ্ন ভোজালি আকারের অদ্ভুত দুটি ছোট্ট হাড় আছে, যার নাম 'লাকি বোন'। দুদিকের কাঁধের গায়ে যে থলথলে মাংস আছে, সেখানে এই হাড় দুটোর অবস্থান; দেখে মনে হয়, এতে বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে একটা এককাট্টা ভাব আসে, যার ফলে থাবা মারার সময় এবং ধস্তাধস্তির পর্বে বাড়তি জোর পাওয়া যায়।

বাঘের পেশীতে অসম্ভব শক্তি। তার যে কী রকম গায়ের জোর, তার প্রমাণ পাওয়া যায়—যখন বুনো মোষ মেরে টানতে টানতে সে অক্লেশে দূরের রাস্তা পাড়ি দেয়। একসঙ্গে পঁচিশ তিরিশ জন লোকও কিন্তু এতটা ভার বইতে গিয়ে হিমশিম খাবে।

একটা সুস্থ জোয়ান বাঘ অবলীলাক্রমে তিরিশ ফুটেরও বেশি লাফিয়ে পার হতে পারে। কোচ বেলীতে একবার একদল বন্ধুর সঙ্গে বনমোরগের খোঁজে জঙ্গল চুঁড়তে গিয়ে বাঘের এই আশ্চর্য লাফ দেখেছিলাম। সেদিন ছিল শান্ত সকাল; মোরগগুলো ঝটপট পালাচ্ছে আর আমরা তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বন্দুকে গুলি ভরছি। গুলির আগুন সশব্দে ঝলসাচ্ছে। জঙ্গল-খেদার গোলমালে ভয়ে তাবৎ প্রাণীর বন

ছেড়ে পালাবার কথা। হঠাৎ দেখি বীট বন্ধ হয়ে গেছে, পাখিরাও উড়ে পালাচ্ছে না।

বীট থেমে যাওয়ায় মনে মনে চটেছিলাম। যারা জঙ্গল খেদাচ্ছিল খানিক বাদে তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি ভয়-পাওয়া এক পাল বাঁদরের মত তারা সব গাছের ওপর উঠে বসে আছে। আমাকে দেখতে পেয়ে বলল, হঠাৎ তারা একটা বাঘের সামনে গিয়ে পড়েছিল। গোলমাল শুনে ভড়কে গিয়ে বাঘটা উল্টোদিকে সট্‌কে পড়েছে। আঙুল দিয়ে তারা আমাকে দেখিয়ে দিল বাঘ কোন্ দিকে গেছে। আমি হেঁটে গিয়ে একটা নালা দেখতে পেলাম—বাঘ যে নালাটা এক লাফে পেরিয়েছে।

নালার এপারে যে জায়গাটা থেকে লাফিয়ে বাঘ ওপারের যে জায়গায় পড়েছিল—দু জায়গাতেই বাঘের পায়ের গভীর স্পষ্ট ছাপ দেখতে পেলাম। জঙ্গল-খেদার দলের একজনের মাথার পাগড়ি চেয়ে নিয়ে দুটো দাগের দূরত্ব মেপে নিয়ে দেখলাম বাঘটা সটান তেত্রিশ ফুটের ওপর টপকেছে। এমন কি লম্বা লাফানোর আর হাড্‌ল্ পার হওয়ার তালিম-পাওয়া দুরন্ত ঘোড়ার কথা ধরলেও—খুব কম ঘোড়ারই এমন আশ্চর্য লাফ দেবার ক্ষমতা আছে।

বড়সড় জোয়ানমদ্দ বাঘ ওজনে কোন্ না দশমনী হবে। সাধারণত বাঘের ওজন হয় পাঁচ মন থেকে সওয়া ছয় মনের ভেতর। ১৮৬১ সালের অযোধ্যায় নুতিয়ারায় কর্নেল বয়লিন একটা বাঘ মেরেছিলেন—তার দৈর্ঘ্য বারো ফুটের ওপর ছিল। এর চেয়ে লম্বা বাঘের কথা আমাদের জানা নেই। তবে এখন কোনো বাঘের লেজের ডগা থেকে নাকের ডগা পর্যন্ত মাপ দশ ফুট হলেই তাকে বলা যাবে বিশাল জানোয়ার। বুড়ো বয়সে খেতে না পেয়ে বাঘ বেজায় কাহিল হয়, তার পেট খালি থলির মত চুপ্‌সে গিয়ে ঝুলে পড়ে।

বাঘ হল এক বিশাল গুরুভার দেহের বিড়াল; গায়ে জ্বলজ্বলে পাটকিলে রঙের ওপর এইটুকু এইটুকু ঘন লোম। গায়ের রঙের ইতরবিশেষ আছে—ফিকে হলদে, গিরিমাটি থেকে শুরু করে গাঢ়

স্বর্ণাভ লাল এবং পোড়ামাটির রকমারি ছাঁদের রং। বয়েস, শরীরের অবস্থা, জলহাওয়া আর বাসস্থান অনুযায়ী এই পটভূমির রঙে একের সঙ্গে অন্যের তফাত দেখা যায়। পেট, মাথার তলার দিক এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভেতর দিক সাদা বললেই হয়। কানের পিঠ কালো, তাতে লক্ষণীয় সাদা ফোঁটা। গা আর পিছনের পায় আড়াআড়ি ডোরা কাটা—প্রায়ই অনিয়মিত ধরনের ডবল লাইন—কখনও একক টানা দাগ, কখনও গ্রন্থি ধরনের, আবার কখনও চ্যাটালো পটির মত। সামনের ঠ্যাঙের বাইরের দিকে ডোরাকাটা দাগের কোনো চিহ্ন দেখা যাবে না, অন্যদিকে মাথার আশপাশে এই দাগ সবচেয়ে ঘনবদ্ধ। লেজে চক্কর কাটা, ডগার দিকটা কালো এবং তাতে চুলের গুছি। মানুষের হাতের রেখায় যত বৈচিত্র্য, বাঘের গায়ের ডোরাকাটা দাগেও তেমনি বিস্তর বৈচিত্র্য দেখা যায়। দাগের মাত্রার দিক থেকে বাঘে বাঘে তারতম্য তো আছেই, উপরন্তু একই বাঘের শরীরের দু পাশের দাগ কখনই অবিকল একই ধাঁচের হয় না। মদ্দা বাঘের গালে আকর্ণ লোমের গুছি থাকে, লোকে তাকেই বাঘের গোঁফ বললেও—ঠোঁটের উপরকার কুচিগুলোই বাঘের আসল গোঁফ। সাদা বাঘ আর কালো বাঘ দেখা যায় বটে, তবে পৃথিবীতে খুবই বিরল, বিশেষ করে কালো বাঘ। শরীরের রঙ্গকক্রিয়ার দোষেই এ রকমটা হয়ে থাকে।

বাঘের ডোরাকাটা দাগের সঙ্গে শুকনো ডালপালা, ঘাসের হলুদবর্ণ স্তবক আর পোড়া গাছের গোড়ার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। বাঘ বেশির ভাগ সময় এই পরিমণ্ডলের মধ্যে থাকে। এর মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে সে এগোতে বা পিটটান দিতে পারে—মাত্র কয়েক হাত দূরে থেকেও সে এইভাবে মানুষের চোখে ধুলো দিতে পারে।

অনেকদিন ধরে এই রকমের একটা ধারণা ছিল যে, শালবনে বা ঘাসের বনে আলোছায়ার লম্বালম্বি দাগের সঙ্গে মিল রাখার

তাগিদে বাঘের গায়ে এই রকমের ডোরাকাটা দাগ ফুটে উঠেছে। কিন্তু সাইবেরিয়ার বাঘ? তার গায়েও তো একই রকমের ডোরা। অথচ সে দেশের প্রকৃতি তো একেবারেই ভিন্ন জাতের।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমরবিজ্ঞানীরা শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে রঙের ক্রিয়া নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছিলেন। গবেষণা করে তারা জানতে পারলেন, মোটামুটিভাবে কয়েকটা নিয়ম মেনে চললে শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায়—হয় দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়ে, নয় পশ্চাদ্‌ভূমিতে বর্ণসমন্বয়ের বৈচিত্র্য ফুটিয়ে। এর প্রধান প্রধান কয়েকটা নিয়ম হল এই :

১। যে বস্তু গোপন করতে হবে, তার রূপরেখা ভাঙাচোরা করতে হবে।

২। রঙের জন্যে কোনো বস্তু ঘন দেখালে রংটা মারতে হবে।

৩। ছায়া পড়লে হয় উঠিয়ে ফেলতে হবে, নয় ঢাকতে হবে।

৪। রঙে রঙে মিলিয়ে দিতে হবে।

আমরা যদি প্রাকৃতিক পরিবেশে বাঘকে দেখি, তাহলে তার আত্মগোপনের ক্ষমতার মধ্যে এর কোনো না কোনো নিয়মের খেলা দেখতে পাব।

ডোরাকাটা দাগ, ফোঁটা আর এখানে সেখানে অনিয়মিত রঙের ছোপ এবং তার ঠিক পাশেই বাঘের গাত্রবর্ণের সাধারণ জমি থাকায় একটা জোরালো প্রতিরূপের সৃষ্টি হয়—তার ফলে বাঘের স্বাভাবিক রূপরেখা ঢাকা পড়ে। এই সব দাগ আর ছোপগুলো দর্শকের চোখে পড়ে মন বিক্ষিপ্ত করে এবং দর্শক যা নয় তাই ভেবে বসে। যেমন ধরুন, বড় চিতাবাঘের গায়ে ফুটাক ফুটকি দাগ আর রঙের নকশা। কিপলিঙের ভাষায়, 'তুমি (চিতাবাঘ) বাইরে ফাঁকা জমিতে শুয়ে থাকলে তোমাকে দেখতে হবে ডাঁই-করা নুড়ির মত। ন্যাড়া পাহাড়ের খোলা জায়গায় পড়ে থাকলে তোমাকে দেখাবে যেন একখণ্ড গোল পাথর। গাছের ঝাঁকড়া ডালে শুয়ে থাকলে তোমাকে দেখে মনে হবে পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে;

রাস্তার মধ্যিখানেও যদি তুমি পড়ে থাকো, লোকে তোমাকে দেখেও দেখবে না।' জীবতাত্ত্বিকেরা একেই বলেন 'বর্ণবিক্ষেপ' এবং লড়াইতে যখন এর ব্যবহার হয় তখন এর নাম 'চোখ-ধাঁধানো বর্ণচুরি'। স্পষ্টতই এ এক ধরনের দৃষ্টিবিভ্রম।

স্বাভাবিক রঙের ছাঁদটিকে 'পাল্টা রঙের ছাঁদে'র কৌশলে মারতে হবে। একরঙা কোনো জিনিস—ধরুন, পাটকিলে রঙের একটা পুতুল—যদি খোলা জায়গায় রোদের মধ্যে ধরেন, তাহলে দেখবেন তার পিঠের দিকটাতে আলো পড়ে পাঁশুটে দেখাচ্ছে, তার তলার দিকটা দেখাচ্ছে কালো আর দু-পাশটা না ঠিক পাঁশুটে, না ঠিক কালো—মোটামুটি পাটকিলে রঙের। পাটকিলে রঙের জন্তু-জানোয়ারের পিঠের দিকটা একটু ঘোর বর্ণের হয়। তলার দিকটা ফ্যাকাসে হরিদ্রাভ আর সাদা হয় এবং দু পাশ ঘোর-ঘোর থেকে ক্রমশ ফ্যাকাসে হরিদ্রাভ হয়ে সাদার মধ্যে মিলিয়ে যায়। ফলে, তার রং ঢালাওভাবে পাটকিলে দেখায়; ত্রিমাত্রিক না দেখিয়ে দেখায় দ্বিমাত্রিক। এও আবার এক চোখের ভুল। পটভূমিও একই রঙের হওয়ায় জানোয়ারটি চোখেই পড়ে না।

জানোয়ারটি জমির সঙ্গে এমনভাবে সেঁটে থাকে এবং এমন একটা জায়গা বেছে নেয়, যার ফলে ছায়ার জায়গাটা ঢাকা পড়ে।

একদিকে সেই জানোয়ার আর অন্যদিকে তার চারপাশের গাছপালা, পাথর বা জমিজায়গা—এই দুয়ের রং ঢং ছায়া নিখুঁতভাবে মিলে যাওয়ার দরুন বর্ণের সমন্বয় ঘটে।

প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকা বাঘের মধ্যে এই সব গুণ এত বেশি যে, তার গা ঢাকা দেবার ক্ষমতায় তাক লাগে। বিশেষ করে ভাঙা ভাঙা রেখায় রকমারি গাত্রবর্ণ, রঙে রঙে মেশামেশি এবং ছড়ানো ছিটানো অনিয়মিত দাগ থাকায়, যখন সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে শিকার খুঁজতে বেরোয় বাঘকে তখন আদৌ ঠাহর করা যায় না।

বাঘ হয়ত হাত কয়েক দূরে আছে আর আপনি চলে যাচ্ছেন, কিংবা বাঘের আস্তানা থেকে চার হাত দূরে হয়ত আপনি বসে

আছেন, অত বড় জানোয়ারটার উপস্থিতি আপনি টেরও পাবেন না। তার কারণ, অদ্ভুত ছু-পেয়ে প্রাণীটা চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে চুপটি করে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকবে।

লুকিয়ে থাকার এই অদ্ভুত ঝোঁকের ব্যাপারটা বছর কয়েক আগে উত্তর প্রদেশের তরাইয়ের জঙ্গলে একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে আমি জানতে পারি।

সেখানে কালুশহীদ ব্লকের নাঙ্গাকাটা সোঁতায় একদিন সকালে যেতে যেতে আমরা একটা টানাহেঁচড়ানোর দাগ আর তার পাশে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। আমরা সেই দাগ দেখে দেখে এগোতে লাগলাম। আধ মাইল রাস্তা ঠেঙাবার পর আমরা দেখলাম সোঁতার পাড়ে ঘাসঝোপের মধ্যে একটা প্রমাণ সাইজের মরা মোষের দেহ লুকানো রয়েছে। ঠিক করলাম সন্ধের ঝোঁকে টোপটাতে এসে আমরা বসব।

বিকেল তিনটে নাগাদ নালাটার কাছে ফিরে এসে তো আমাদের চক্ষুস্থির। মোষটা যে জায়গায় আমরা দেখে গিয়েছিলাম, সেখানে নেই। মোষটাকে পাওয়া গেল সোঁতার ঠিক মাঝখানে— এমন জায়গায় শিকার ফেলে রাখাটা বাঘের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। জায়গাটা একে খোলামেলা, তার ওপর ঘাসে ঢাকাও নয়—এখানে শেয়াল শকুন ঠেকাবার কোনো উপায় নেই। আসলে বাঘ ওটাকে টেনে নিয়ে যাবার সময় আমাদের সাড়া পায়। তখন তাড়াতাড়ি সোঁতার মধ্যে মোষটাকে ফেলে রেখে চম্পট দেয়।

একটা গাছ ঠিক করে আমার সঙ্গের লোকদের মাচা বাঁধার ব্যবস্থা করতে বলে আমি সোঁতার পাড়ে চলে গিয়ে বালির ওপর বসলাম। লোকজনেরা মাচার জন্যে আশপাশের গাছ থেকে হুড়দাড়িয়ে গাছের ডাল কাটতে লেগে গেল। গাছের ডাল কাটতে তুলতে কমপক্ষে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। এই সময়ের মধ্যে আমরা সারাক্ষণ কথা বলেছি, সিগারেট টেনেছি এবং আর যাই করি না কেন, চুপচাপ থাকি নি।

আমি দিব্যি পা ছড়িয়ে বসে দুটোর পর তৃতীয় সিগারেটটা ধরিয়ে মৌজ করে টানছি, হঠাৎ আমার মাথার ওপর ঘাসের ঝোপটা নড়তে দেখলাম। ঝোপের ঠিক মাঝখানটা। নড়েছিল খুব সামান্য। তাতে ঘাসের ডগাগুলো তিরতির করে কাঁপছিল। বনে বাতাস ছিল না, গাছের উঁচু ডালের পাতাগুলোও সব তখন নিথর।

কী ব্যাপার দেখবার জন্যে উঠে পড়লাম। রাইফেলটা যেখানে ছিল রেখে পাড় বেয়ে ওপরে উঠলাম। বড় ঘাসের একটা ঘন ঝোপ, আট ফুটের মত তার বেড়, লম্বা হয়ে সোঁতার পাড় বরাবর চলে গেছে। বার কয়েক ঝোপটা পাক দিলাম; উঁকি দিয়ে দেখার চেস্টা করলাম। কিন্তু কিছুই ঠাহর হল না। ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে দেখলাম ঝোপের মাঝখানে ঘাসের ডগাগুলো আবার তিরতির করে কাঁপছে।

ঝোপটার মধ্যিখানে চিতল হরিণের একটা ছানা শিং ডুবিয়ে বসে মাঝে মাঝে কান নাড়াচ্ছে আর তাইতেই যে ঘাসের ডগাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে, এ বিষয়ে আমার আর কোনো সন্দেহ রইল না। আমার খুব ইচ্ছে হল হরিণছানাটাকে দেখবার আর সম্ভব হলে তার ফটো তুলবার। পাড় বেয়ে নেমে গিয়ে আমার লাইকা ক্যামেরাটা নিয়ে এলাম। রাইফেলের ঠিক পাশেই ক্যামেরাটা হ্যাভারস্যাকের মধ্যে রাখা ছিল। ঝোপের ধারে এসে সোঁতা যেদিকে সেইদিক থেকে সাবধানে হাত দিয়ে ঘাসগুলো সরিয়ে সরিয়ে পা টিপে টিপে আমি ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করলাম। দু পা এগিয়েছি কি এগোই নি, হঠাৎ ঝোপটা কাঁপিয়ে একটা ক্রুদ্ধ আওয়াজ কানে এল— 'অওফ্'! আর তৎক্ষণাৎ ঝোপের ও-প্রান্তে একটা বাঘের মূর্তি ঝিলিক দিয়ে উঠে গোটাকয়েক লাফ দিয়ে কাছাকাছি জঙ্গলের আড়ালে গিয়ে উধাও হয়ে গেল।

অনায়াসে আমাকে মেরে ফেলতে পারত। বাঘটা মহাশয় ছিল বলতে হবে। অবশ্য বেশির ভাগ বাঘই মহাশয়। আর তাছাড়া

আমাতে তার অভিরুচি ছিল না। আমরা যে রকম হৈচৈ করে কথা বলছিলাম আর হুড়দাড়িয়ে গাছ কাটছিলাম, তাতে বাঘের নিঃসন্দেহে এই ধারণা হয়েছিল যে, আমরা নেহাতই নিরীহ দেহাতী লোক। স্বাভাবিক পরিবেশে একটা স্বাভাবিক বাঘ—সে শুধু আমাদের চলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। আমরা চলে গেলেই সে তার অসমাপ্ত আহারে মন দেবে।

সামনে থেকেও চোখকে ফাঁকি দেবার এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। আমি ছিলাম একেবারেই তার সান্নিধ্যে। চারদিকে ছিল দিনদুপুরের আলো। অথচ আমি ধরতেই পারি নি। আমার চোখ তার ওপর পড়েছিল, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই—তবু তাকে আমার চোখে পড়ে নি। চোখে ধাঁধা লাগার ব্যাপারটা এমন নিখুঁতভাবে ঘটেছিল যে, মনোযোগ দিয়ে দেখা সত্ত্বেও আমি তাকে চিনে উঠতে পারি নি।

# ব্যাঘ্রমিথুন আর ব্যাঘ্রশাবক

বাঘ-বাঘিনীতে জোড় বাঁধে তিন বছরে একবার। এই সময়ের মধ্যে ব্যাঘ্রশাবক তার মা-র কাছে থাকতে পায়। ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস বাঘিনীদের ঋতুকাল, দিন দশেক তারা এই অবস্থায় থাকে। বছরের শুধু এই সময়টা বাঘবাঘিনী সাধারণত একত্রে কাটায়। তাও একটানা একসঙ্গে নয়; এইটুকু সময়ের মধ্যেও পালাক্রমে তাদের বিচ্ছেদ আর পুনর্মিলন ঘটে। এই সময়ে তারা জোড় বেঁধে শিকার করে। বাঘিনীর নেকনজর পাবার জন্যে বাঘ মাঝে মাঝে অবিশ্বাস্য রকমের বাহাদুরি আর তাকত দেখায়।

বাঘিনীর এই জোড় বাঁধার সময়টাতে বাঘ আর বাঘিনীর বিশেষ রকমের একটা ডাক আছে; সেইভাবে ডেকে ডেকে তারা পরস্পরকে খোঁজে। এই সময় খিদেতেষ্টা তাদের মাথায় ওঠে। সাক্ষাৎ চোখাচোখি আর জোড় বাঁধার আগে পর্যন্ত দিনের পর দিন তারা পরস্পরকে ডেকে বেড়ায় আর ভাবে বিভোর হয়ে থাকে। যখন তাদের এই অবস্থা হয়, আমি জানি বাঘকে কিছুতেই টোপে গাঁথা যাবে না। সারা রাত বাঘ যদি টোপের কাছে বসেও থাকে, টোপ কিছুতেই সে মুখে নেবে না।

বছর কয়েক আগে একদল বন্ধুর সঙ্গে আমি একবার নেপাল সীমান্তে সোনারিপুর জঙ্গলে শিকারে গিয়েছিলাম। বাঘের এই আশ্চর্য স্বভাব আমি সেই সময় লক্ষ্য করি।

জায়গাটার ঘাঁৎঘোঁৎ বুঝতেই আমাদের দিন দুয়েক লেগে গেল। বাঘ যেখানে নিয়মিত আনাগোনা করে, সেই জায়গাটা শেষপর্যন্ত আমরা খুঁজে বার করলাম। বাঘ নয়, আসলে সেটা ছিল বাঘিনী। পায়ের দাগ দেখে ধরা গেল, বাঘিনীর সঙ্গে আছে তার বছর তিনেকের এক বড়সড় বাচ্চা। বাঘিনীটি সম্পর্কে

আমাদের খুব আগ্রহ ছিল না। ঐ এলাকায় এক গোখাদক বাঘ, শুধু তাকেই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। সেই সুবাদেই রোজ সকালে একবার করে ঐ জায়গাটাও আমরা দেখে আসতাম। বাঘের বাচ্চা আর তার মা-র আগের রাত্রের সদ্য সদ্য পায়ের ছাপ সকালবেলায় দেখা যেত।

সপ্তাহখানেক পরে একদিন দেখি দুটির বদলে কেবল একটিরই পায়ের ছাপ। শুধু বাচ্চাটির।

সে রাত্রে সারা বনে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল.বাঘিনার গর্জন। সে যেন জানিয়ে দিতে চাইছিল—'বসন্ত আসে পাত্র যে কেউ হোক'। দু রাত আর দু দিন ধরে পাগলের মত সে গাঁক-গাঁক করে বেড়াল। তার আনাগোনার রাস্তাতেই মোষ বেঁধে রাখা হয়েছিল—এই দু দিনে কমপক্ষে ছ'বার সে তার পাশ দিয়ে গেছে কিছু বলে নি।

তারপর এক সাঙাৎ খুঁজে পেয়ে বাঘিনীর গর্জন থামল একটা ডোবার ধারে মোষ বেঁধে তার সামনে দিব্যি একটা গাছের ওপর মাচা করে সে রাত্রে আমি বসেছিলাম। আমার ডান দিকে আর পেছনে পুকুরটাকে বেড় দিয়ে একটা ঘন ঝোপ বনের রাস্তায় একেবারে যেন ঘাড়ে গিয়ে পড়েছে।

দিনটা ছিল মেঘলা। শুরু হল ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। একে কৃষ্ণপক্ষের রাত্তির, তার ওপর বৃষ্টির মুষলধারায় অন্ধকার আরও ঘন কালো দেখাচ্ছিল। মেঘের গুরুগুরু আওয়াজে থেকে থেকে অন্ধকার কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

ঠিক ছিল রাত আটটা অবধি বসে থাকব। কিন্তু এই বৃষ্টিতে যাই কী করে! যে রেস্ট হাউসে আমরা উঠেছি, এখান থেকে তা দু মাইলের ওপর। ভেবেছিলাম বৃষ্টি ছেড়ে যাবে, কিন্তু বহুক্ষণ পরেও যখন তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, মনে মনে তখন ঠিক করলাম দুর্যোগ মাথায় নিয়েই রেস্ট হাউসের দিকে পাড়ি দেব। এমন সময় একটা গরর্ গরর্ আওয়াজ—যেদিকে মোষ বাঁধা ছিল

সেইদিক থেকে। চোখে আমার কিছুই ঠাহর হচ্ছিল না—আমার নিজের হাত, এমন কি আমার মুখের ওপর আর খালি মাথায় ঝমঝম করে পড়া জলের ধারাও আমার দৃষ্টির আর গোচরে নয়।

বাঘ আর বাঘিনী তখন কামকেলির উদ্যোগপর্ব হিসেবে ফষ্টিনষ্টিতে ব্যস্ত। এমন ছুটোপাটি লাগিয়েছিল যে দেখে মনে হচ্ছিল যেন প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার ব্যাপার। ওদের দাপাদাপিতে আমার চারপাশে তিরিশ গজ ব্যাসার্ধ জুড়ে ঝোপঝাড়গুলো মাটিতে কুপোকাত হয়ে পড়েছিল।

একদিকে বৃষ্টির আর অন্যদিকে বাঘের এই হৈ-হুল্লোড় আরও ঘণ্টা দুই ধরে চলেছিল। এমন সময় হঠাৎ একটা মোটরগাড়ি এসে পড়ায় জানোয়ারদুটো ভারি বিরক্ত হল। আমার বন্ধুপুত্র আলিম আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়িটা এনেছিল।

তিরিশ চল্লিশ হাত গাড়ি চালিয়ে যেতেই হঠাৎ হেডলাইটের আলোয় রাস্তার একেবারে মধ্যিখানে বাঘ-বাঘিনীকে আমরা পেয়ে গেলাম! ওরা তখন গাড়ির আলো, ইঞ্জিনের শব্দ—এসব বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সুরতক্রিয়ায় মত্ত। ছোকরা আলিম গাড়ি থামিয়ে হর্ন বাজাতে লাগল। কিন্তু যতক্ষণ ইঞ্জিনটা পুরোদমে চালিয়ে সেইসঙ্গে হর্নের শব্দ করে রীতিমত একটা হট্টগোল সৃষ্টি করা না হল, ততক্ষণ ওরা নড়ল না। শেষকালে খুব বেজার হয়ে বাঘিনীকে ছেড়ে বাঘ মাটিতে চার পা হল এবং বেরসিক গাড়িটার দিকে চেয়ে দাঁত খিঁচোতে খিঁচোতে দুটিতে রাস্তা ছেড়ে ঝোপের মধ্যে চলে গেল।

বাঘিনীর ঋতুকালের এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে পালে পালে বাঘ একজায়গায় হতে দেখা যায়। বাঘিনীর ঋতুকালের সূত্রপাত থেকে শুরু করে যে পর্যন্ত না বাঘেরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেয় যে কে তার যোগ্য প্রাণী হবে—সেই পর্যন্তই বাঘের এই জমায়েত দেখতে পাওয়া যায়।

১৯৬১ সালের মে মাসে হালদোয়ানির কাছে নানধৌর ফরেস্ট ব্লকে আমি একবার এই রকমের জমায়েত দেখেছিলাম। এক

বাঘিনীর ঋতুকাল দেখা দেওয়ায় আমাদের কোনো টোপে তাকে টানা যাচ্ছিল না। এক সন্ধেয় আমার ছেলে একটা চিতাবাঘ মেরেছিল। একটা নালার মুখে লাশটা আমরা ফেলে রেখে আসি। বাঘিনী তার প্রার্থীদের নিয়ে ঐ পথ দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেয়ে তার ওপর হামলে পড়ে। পরদিন সকালে গিয়ে দেখি আধ-খাওয়া লাশটা একটা নিরাপদ জায়গায় সরানো। আমার বন্ধু জলিলসাহেব তুখোড় শিকারী; উঁচু জায়গায় লক্ষ্যভেদে শটগানে তাঁর হাতে ভেল্‌কি খেলে। কাছেই একটা গাছের ওপর তিনি বসলেন। সন্ধে হওয়ার একটু আগে আওয়াজ শুনে বুঝলেন কয়েকটা জানোয়ার আসছে। লাশটার দিকে মুখ করে জলিলসাহেব বসে ছিলেন; একটা সুতোলি নদীর খাতের মধ্যে লাশটা রাখা ছিল। তাঁর পেছনদিক থেকে জানোয়ারগুলোর গুটি-গুটি এগিয়ে আসার শব্দ হচ্ছিল। শব্দটা ক্ষীণ হয়ে যেতে তিনি পেছন ফিরলেন। পেছন ফিরেই দেখলেন একটা বাঘের ল্যাজ এবং আরেকটা বাঘের সম্মুখভাগ নালার বাঁকের আড়ালে মিলিয়ে যাচ্ছে।

নিজের ভাগ্যকে দুষবার সময়টুকুও জলিলসাহেব পেলেন না; তাঁর মাচার ঠিক নিচেয় তখন জোরে জোরে কার যেন নিশ্বাস পড়ছিল। নিচে তাকিয়ে দেখলেন আরেকটা বাঘ ঠিক একটা কুকুরের মত উবু হয়ে বসে জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে।

ডবল রাইফেলটা নিচু করে জলিলসাহেব বাঘটার ঘাড়ের ঠিক নিচে বুলেটটা বিঁধলেন। বাঘটা গড়িয়ে পড়ল। ঠিক সেই সময় তিনি টের পেলেন তাঁর পেছনে নালার মধ্যে আরও একটা বাঘ নড়াচড়া করছে। পেছন ফিরে তিনি দেখতে পেলেন—একটা কোথায়? দু দুটো বাঘ হাত বিশেক দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

একটার বেশি বাঘ মারবার তাঁর অনুমতি ছিল না। বাঘদুটো যাতে ভয় পেয়ে পালায় তার জন্যে তিনি গলা ফাটিয়ে চেঁচালেন। কিন্তু বাঘদুটো কোনোই আমল দিল না। সমানে দাঁড়িয়ে থেকে

তাঁর দিকে তাকিয়ে তারা অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। জলিলসাহেব তখন ফাঁকা আওয়াজ করলেন। তাতে ফল হল। ছুটো বাঘের একটাকেও আর দেখা গেল না।

জলিলসাহেবের গুলিতে মারা পড়েছিল একটা মদ্দা বাঘ। গোঁয়ারগোবিন্দ বাঘিনীটা তার প্রার্থীদের একটাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঘাতকতায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। পরদিন সকালে পায়ের ছাপ দেখে আমরা ধরলাম—কুল্লে পাঁচটা বাঘ এসেছিল; সব কটাই জোয়ানমদ্দ—তারা এসে জুটেছিল বাঘিনীর স্বয়ংবরসভায় বরমাল্যের আশায়।

প্রয়োজনের সময় সঙ্গী না জুটলে বাঘিনীর মেজাজ তিরিক্ষে হয়। আবার সঙ্গীর যন্ত্রণাদায়ক (নিশ্চয় অনিচ্ছাকৃত) ব্যবহারের দরুন জোড় বাঁধার সময়টাতে এবং তার পরে বাঘিনার মেজাজ আরেক কাঠি চড়ে থাকে। বাঘ আর বাঘিনীতে সত্যিকার লড়াই কদাচিৎ হয়—তাও হয় বাচ্চার বিপদ-আপদের আশঙ্কা দেখা দিলে কিংবা সন্তানধারণের বয়স পেরিয়ে গেলে।

গর্ভে ধারণ করার মেয়াদ চোদ্দ-পনেরো সপ্তাহের মত। পেট থেকে পড়ার সময় বাঘের বাচ্চা আকারে হয় গৃহপালিত বেড়ালের চেয়ে সামান্য ছোট। গায়ে ভারি সুন্দর নরম নরম লোম। তবে ঢের বলিষ্ঠ গড়ন। কান আর সামনের থাবাদুটো বেশ বড় বড়। বাঘিনী মা'র অনভিজ্ঞতার দরুন সাধারণত প্রথমবারের বাচ্চাগুলো পরিত্যক্ত হওয়ায় না খেতে পেয়ে মরে কিংবা মদ্দা বাঘেরা এবং অনেক সময় স্বয়ং বাঘিনীরাও বাচ্চা মেরে ফেলে এবং খেয়েও ফেলে।

কখনও কখনও একেকবারে বড়জোর সাতটা করে বাচ্চা হয়। কিন্তু বাঘ যে বাঘ, প্রকৃতি তাকেও ছেড়ে কথা বলে না। শেষপর্যন্ত উস্তন-খুস্তন হয়ে শুধু সেই কটা বাচ্চাকেই বাঘিনা মা নিজের কাছে রাখে যারা তুলনায় সবচেয়ে শক্তসমর্থ।

রোগব্যাধি, লড়াই, গোলাগুলি এবং জীবনের অন্যান্য ঝড়ঝাপ্টা

পেরিয়ে যদি বাঁচে, তাহলে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বাঘের পরমায়ু। বুড়ো বয়সের স্বাভাবিক পরিণাম মৃত্যু; বুড়ো বাঘ তাই শিকার করে পেট চালাতে অপারগ হয়ে অজ্ঞাতবাসে চলে গিয়ে, শান্তভাবে মৃত্যুর জন্মে অপেক্ষা করে।

মৃত্যুর আগে বুড়ো বাঘের হৃতশক্তি আর ক্রমবর্ধমান বয়সের নানা লক্ষণ প্রকাশ পাবে। বুড়ো হয়ে হয়ত গরু-বাছুর মেরে বেড়াবে এবং পরে মানুষখেকো হবে। গায়ে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন থাকা ছাড়াও বাঘের চেহারায় চামড়ার সে চাকচিক্য আর থাকবে না। বাঘের সুন্দর লাল রঙের অনেকখানিই ক্ষয়ে গিয়ে নিছক ম্যাড়-ম্যাড় করবে। বাঘের মুখের চুলগুলো দস্তুরমত কিছু কিছু সাদাও দেখাতে পারে। বাঘের নখগুলোর ধার কমে গিয়ে এদিক ওদিকে খোঁচা খোঁচা হয়ে থাকতে দেখা যাবে। বুড়ো বাঘের অনেক দাঁতই হয় আধভাঙা হয়ে থাকে, নয় একেবারে থাকেই না। বুড়ো বাঘের পায়ের ছাপ ছেতরে পড়বে এবং বর্ষার ভিজে মাটিতে অনেক চিড় খাওয়া আর ভাঁজ পড়ার দাগ দেখতে পাওয়া যাবে।

# কী খায়

মারতে পারলে কিংবা মরা জিনিস পেলে কোনো মাংসেই বাঘের অরুচি নেই। ভ্যাদভেদে পচা মরা জন্তু, তার গায়ে পোকা কিলবিল করলেও—বাঘ সে মাংস খাবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরো জন্তুটার আপাদমস্তক বিলকুল খেয়ে ফেলবে—গায়ের চামড়া বা কুচো কুচো হাড় অবধি ফেলবে না। ভাল্লুক, চিতা, এমন কি স্বজাতি মেরে খাওয়ার কথাও বাঘ সম্পর্কে শোনা গেছে। তরাই এলাকার সালটা জঙ্গলমহালের একটা ঘটনার কথা তো আমি নিজেই জানি। একবার একটা মরা বুনো শুয়োরের দখল নিয়ে ধাড়ি আর বাচ্চা দুই বাঘের লড়াইতে বাচ্চা বাঘ মারা পড়ে; ধাড়ি বাঘটা তখন মরা শুয়োর ফেলে বাচ্চা বাঘের মাংস খায়। এটা ঘটেছিল ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে; আমি সেবার আমার বন্ধু ডক্টর প্রসাদের সঙ্গে গিয়েছিলাম শিকারে। তরাই জঙ্গলেরই আরো একটা ঘটনার কথা আমি জানি; দুটো বাঘের মারামারিতে জেতা বাঘ হারা বাঘের মৃতদেহটা চর্বাচোষ্য করে খেয়েছিল। অবশ্য এসব ঘটনা খুবই বিরল।

আমাদের খেতখামারের একটা অংশে আমাদের নিজস্ব কিছু জন্তুজানোয়ার সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। কাঁটাঝোপে ভর্তি সেই প্রকাণ্ড জায়গাটা গিয়ে পড়েছে একটা পাহাড়ী ঝোরার উঁচু পাড়ে। একটা কাঁটাগাছের ঘন জঙ্গল থাকায় ছোট ছোট জানোয়ার ছাড়াও সেটা ছিল চিতা, কুটরা আর বুনো শুয়োরের থাকবার খুব ভাল জায়গা।

এই জায়গাটাতে একবার একটা চিতা একটা গরু মেরেছিল। আমার ভাই জগদীপ সেই মরা গরুর টোপে শিকারে বসেছিল। তার তখন বছর ষোল বয়েস। আমার বোন বিদ্যা ছিল জগদীপের

চেয়ে বছর কয়েকের বড়। দিদিগিরি ফলিয়ে বিন্ধ্যা জগদীপকে বাধ্য করে শিকারে বিন্ধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। এও ঠিক হয় যে, প্রথম গুলিটা বিন্ধ্যাকেই ছুঁড়তে দেওয়া হবে। একটা ঝোপের আড়ালে ওরা ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকে। লোক দুজন, কিন্তু বন্দুক একটাই—বারো বোরের একনলা।

অন্ধকার হয়ে আসতে টোপের প্রায় হাত তিরিশেক দূরে জগদীপ সাদা সাদা কী একটা দেখতে পেল। সাদা দাগটা আগে সেখানে ছিল না। কিছুক্ষণ ঠায় তাকিয়ে থেকে জগদীপ বুঝতে পারল সাদা দাগটা নড়ছে। আসলে ওটা ছিল চিতাবাঘ। কুকুরের মত উবু হয়ে বসে ছিল। তার বুকের সাদা ছোপটাতে টিপ করে জগদীপ গুলি করতেই বাঘটা ঢলে পড়ল।

পরদিন সকালে মরা চিতার খোঁজে গিয়ে দেখল চিতাবাঘটা যেখানে ছিল সেখানেই আছে, কিন্তু মরা গরুটা নিখোঁজ হয়েছে জগদীপ খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, অন্য একটা চিতা এসে গরুটাকে প্রায় একশো হাত দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের ছোট একটা গর্তের খাঁজের ওপর খেয়ে রেখেছে।

সেদিন সন্ধেবেলায় জগদীপ মরা গরুটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে নৈশভোজনের ঠিক আগে দ্বিতীয় চিতাবাঘটাকে মেরে ফিরে এল।

পরদিন সকালে লোকলস্কর সঙ্গে নিয়ে চিতাটাকে বাড়ি আনতে গিয়ে দেখে···রাম বলো, চিতা কোথায়? আশেপাশে মরা চিতাটার চিহ্নমাত্র নেই। মাটিতে টানাহেঁচড়ানোর দাগ লক্ষ্য করে জগদীপ এগোতে লাগল। দাগ বরাবর এগোতে এগোতে হাত চল্লিশেক দূরে জগদীপ একটা ঝোপের কাছে সেই মরা চিতাবাঘটাকে পড়ে থাকতে দেখতে পেল। তৃতীয় একটা চিতাবাঘে তার খানিকটা মাংস খুবলে খেয়েছে।

জগদীপ এবার এক আজব টোপ সামনে নিয়ে আবার শিকারে বসে গেল। সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই স্বগোত্রভুক সেই

চিতাবাঘটাকে সে মারল। পর পর তিন সন্ধ্যায় একই জায়গায় বসে জগদীপ প্রায় একই টোপে তিন তিনটে চিতাবাঘ গাঁথল। সচরাচর এমন হয়ত ঘটে না এবং শিকারীর পক্ষে এটা যে একটা দুর্লভ ভাগ্য, তাতে সন্দেহ নেই।

লোকের বিশ্বাস, বাঘ নাকি শিকারকে মারবার পর নখ দিয়ে তার গলা ফুটো করে রক্ত পান করে। এটা যে আদৌ সত্যি নয়, যাঁরা বাঘকে জন্তুজানোয়ার মারতে দেখেছেন, অথবা বাঘের হাতে মরা টোপ যাঁরা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখেছেন—তাঁরাই স্বীকার করবেন।

আমার মতে, দৃষ্টিবিভ্রমের জন্যেই এই রকম ভুল ধারণা গড়ে উঠেছে। কেননা বাঘেরা সাধারণত জীবজন্তুর ঘাড়ে দাঁত বসিয়ে দিয়ে মারে। তারপর শিকারটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলবার পরেও ঘাড়টা কামড়ে ধরে থাকে যতক্ষণ জানোয়ারটা একদম না মরে।

বাঘ কেন যে সব সময় তার শিকারের পেছন দিক থেকে খেতে শুরু করে, তার কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। তবে খাওয়া শুরু করবার আগে শিকারের পেট চিরে অন্ত্র বার করে ফেলবে—প্রথম চোটে খাবে সাধারণত হৃদ্‌যন্ত্র, ফুসফুস, যকৃৎ আর নাড়িভুঁড়ি। খুব কচিৎ কদাচিৎ বড় বড় চিতাদের ঠিক বাঘেরই মতন শিকারের পেছনের অংশ থেকে খাওয়া শুরু করতে দেখা গেছে।

বাঘেরা খুব শব্দ করে খায়। তাদের জিভে জল টানার একটা বিশ্রী হুসহাস আওয়াজ অনেক দূর থেকে শোনা যায়। সন্তর্পণে নিঃশব্দে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়াই তাদের নিয়ম। তবে মুশকিলে পড়লে শিকারকে ভয়ে তটস্থ করার জন্যে কখনও কখনও গাঁক গাঁক করে প্রচণ্ড আওয়াজ করে।

বাঘ সব সময়ই গর্জে উঠে আক্রমণ করে এবং আত্মরক্ষার জন্যে লড়ে। অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। বাইরের কেউ এলে, নৃশংস বাঘ কখনও কখনও ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে এবং অতর্কিতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

# চালচলন আর হাবভাব

বাঘেরও ঠিক মানুষের মতই হাবভাবে আর চালচলনে যে যেমন সে তেমন ভাব। শুনতে অদ্ভুত ঠেকলেও ঘটনার দিক থেকে এটা সত্যি যে, প্রত্যেকটা বাঘেরই আলাদা আলাদা ধাত। আশপাশের গাঁয়ের লোকে এটা জানে। কেউ বেজায় ডানপিটে আর কাঠগোঁয়ার; কেউ ভারি চালাক, কিছুতেই তাকে সহজে ফাঁদে ফেলা যাবে না; কেউ দারুণ নৃশংস, সব সময় মুখ হাঁড়ি করে থাকে; কেউ আবার শান্ত গোবেচারী।

বাঘদের খামখেয়ালিপনাও দেখা যায়। চোখে পড়ে একেকটা বাঘের একেক রকমের স্বভাব। কিছু কিছু বাঘ, বিশেষ করে যারা বুড়ো— মানুষের সামনাসামনি হলে গর্‌র্ গর্‌র্ আওয়াজ করে রাস্তা আটকাবে; কেউ কেউ আছে, এমন কি বীরত্ব প্রকাশ করে খানিকটা লম্ফঝম্ফও করবে, তবে তাদের বেশির ভাগই মানুষ দেখলে পিট্‌টান দেবে।

খাদ্যাভ্যাসের দিক থেকেও বাঘে বাঘে বিস্তর তফাত; তারা কেউ কেউ জঙ্গলে শিকার করে পেট চালায়, অন্যেরা গৃহস্থদের হাঁস-মুর্গি গরু-ছাগল মেরে ধরে খায়। কিছু বাঘ মানুষখেকো হয়ে যায়। এরা স্বভাবতই হিংস্র প্রকৃতির হয়, এবং যারা একবার মানুষ মেরেছে, একবার নরমাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে—মানুষ খাওয়া তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কেউ পঙ্গু কিংবা জখম হওয়ার পর মানুষখেকো হয়। তবে প্রায়ই ফন্দিবাজ বুড়ো বাঘবাঘিনীরাই হয় মানুষখেকো—গাঁয়ের আশেপাশে শিকার ঢুঁড়তে গিয়ে হয়ত জঙ্গলে কোনো পোড়াকপালী কাঠকুড়ুনী বা ঘেসুড়ে মেয়েকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেছে—হয়ত দেখেছে জঙ্গলে দুষ্প্রাপ্য জন্তুজানোয়ার শিকার করার চেয়ে মানুষ মারা ঢের সহজ কাজ।

পাকাপোক্ত মানুষখেকোরা জানোয়ারদের মধ্যে সবচেয়ে ধূর্ত শয়তানী বুদ্ধি আর সদাসতর্কতার জন্যে এদের মারা বেশ শক্ত হয়।

## ঘাসবনের বাঘ

যেসব বাঘের বাস গাছের জঙ্গলে, তাদের চেয়ে ঢের বিপজ্জনক প্রাণী ঘাসবনে-থাকা বাঘ। তার কারণও খুব পরিষ্কার; ঘাসবনে-থাকা বাঘ নিজেও যেমন দেখতে পায় না, তেমনি অন্যেরাও তাকে দেখতে পায় না—কেউ প্রায় ঘাড়ে এসে পড়লে তবে দুপক্ষে দেখা হয়। তখন আর তার ভাবনাচিন্তা করবার সময় থাকে না; তখন তাকে ঝোঁকের মাথায় কিছু একটা করে বসতে হয়—আত্মরক্ষার জন্যে হয় ঝাঁপিয়ে পড়া, নয় পালিয়ে যাওয়া। সেই একই বাঘ যদি কোনো খোলামেলা জঙ্গলে থাকত, তাহলে কেউ তার দিকে এলে আগেভাগে সে দেখতে পেত কিংবা আসন্ন বিপদের আওয়াজ পেত এবং আগে থেকে সজাগ হতে পারলে পালাবে কিনা ঠিক করবার সময় পেত।

কিন্তু কেউই যখন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, তখন উভয়পক্ষকেই ভারি গোলমেলে অবস্থায় পড়তে হয়। চারপেয়ে প্রাণীকে এতটা দুরবস্থায় পড়তে হয় না, কেননা তাদের বেশির ভাগেরই ঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল—বাঘের গায়ের এতটুকু গন্ধ পেলে হয়, অমনি তারা ছুটে নাগালের বাইরে পালিয়ে যাবে। কিন্তু চারপেয়ে না হয়ে যদি দু-পেয়ে প্রাণী হয় তাহলে তার না থাকবে তেমন ঘ্রাণশক্তি—না থাকবে তেমন শ্রবণশক্তি। সেক্ষেত্রে হয়ত দুপক্ষেরই লড়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

এই রকম বিপদে একবার আমাকে পড়তে হয়েছিল। কাজ নেই আমার আর তেমন অভিজ্ঞতায়। জায়গাটা ছিল বড়হাপুর ফরেস্ট রেঞ্জের চোলখণ্ড সোতা; সেখানে হঠাৎ একটা বাঘের মুখে পড়ে আমার তো প্রাণ খাঁচাছাড়া হওয়ার দাখিল। সূর্যোদয়ের আগে বেশ ভোর-ভোর থাকতেই নদীর ধার বরাবর জায়গাটা ঘুরে দেখবার জন্যে আমি হেঁটে হেঁটে চলেছি। চোলখণ্ড সোঁতা বেশ চওড়া নদী, জায়গায় জায়গায় একশো হাত প্রশস্ত—বর্ষায় ছাড়া বছরের বারোমাসই শুকনো এবং আগাগোড়া বালির চড়া পড়ে থাকে। নদীর দুপাড়েই লম্বা লম্বা তীক্ষ্ণধার ঘাসের জঙ্গল। আমি বাঘের থাবা আর

পায়ের দাগ খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, সবক্ষণ আমার মন পড়ে থাকছিল সেইদিকে। এমন সময় নদীর এপারের ঘাসের মধ্যে হঠাৎ কিসের যেন একটা আওয়াজ পেলাম।

কৌতূহলী হয়ে পাড় বেয়ে আমি ওপরে উঠলাম। উঠে দেখি চোখের দৃষ্টি আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘনবদ্ধ ঘাসের দেয়াল—অতি লম্বা হাতিরও সাধ্যি নেই মুখ বাড়িয়ে দেখে সেই দেয়ালের ওপারে কী আছে না আছে। তার ভেতর নিজেকে চালিয়ে দিয়ে যথাসম্ভব নিঃশব্দে গুটিসুটি মেরে আমি এগোতে লাগলাম। ঘাসগুলো চারদিক থেকে এসে আমাকে ছেঁকে ধরছিল এবং ডুবন্ত মানুষকে জল যেভাবে ঠেসে ধরে তেমনিভাবে আমাকে ঠেসে ধরছিল। আমি তা সত্ত্বেও ঠেলেঠুলে এগিয়ে একটা ফাঁকা জায়গার মধ্যে এসে পড়লাম। জায়গাটা ছিল দৈর্ঘ্যে বিশ ফুট আর প্রস্থে পনেরো ফুট। দম নিক্‌লে গিয়ে আমার এদিকে ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। জায়গাটার একধারে দাঁড়িয়ে আমি ঠাহর করার চেষ্টা করলাম আওয়াজটা ঠিক কোনদিক থেকে আসছে। মনে হল, আওয়াজটা যেন এই ফাঁকা জায়গাটার দিকেই এগিয়ে আসছে। আমার হাতে '৪৭০ ডবল রাইফেল; সেফটি ক্যাচ খুলে রেখেছি, যাতে যে-কোনো মুহূর্তে রাইফেলের ঘোড়া টিপতে পারি।

হঠাৎ আওয়াজটা থেমে গেল। প্রায় হাত দুয়েক তফাতে ঘাসগুলো ফাঁক হয়ে হয়ে আমার সামনে বেরিয়ে এল একটা গোলাকার ব্যাঘ্রমুণ্ড। বাঘ আর আমি, আমাদের চার চোখের মিলন হল। পলকের দেখায় আমরা দুপক্ষই আচমকা ভয় পেলাম! হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বাঘটা তার কানদুটো চিতিয়ে দিচ্ছে। তার সামনের পা দুটো ততক্ষণে প্রায় নুইয়ে ফেলেছে—এরপরই লাফিয়ে পড়বে। তখন আর টিপ করে বন্দুক ছোঁড়ার প্রশ্নই ওঠে না; বন্দুকের কুঁদোটা ঘাড়ের ওপর ঝট্‌কা মেরে তুলবারও সময় নেই—কেননা ততক্ষণে বাঘ নির্ঘাত আমার ওপর ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়বে। আমার কোমরের কাছটাতে রাইফেলটা তুলে মাত্র কয়েক ফুট দূর

থেকে আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপলাম। আমার কপাল ভালো, তাই গুলিটা গিয়ে ঢুকে গেল বাঘের চোখে। একে ৫০০-গ্রেন '৪৪০ ক্যালিবার বুলেট, তায় অত কাছ থেকে ছুঁড়েছি—গুলি খেয়ে বাঘটা কমপক্ষে চার হাত দূরে ঘাসের মধ্যে ছিটকে পড়ল; দু একবার আছড়াআছড়ি করে তারপর একেবারে স্থির হয়ে গেল।

ঝোপের মধ্যে বাঘটা যখন নেচেকুঁদে বেড়াচ্ছিল, তখনই সে ঘাসের ভেতর হাঁটাচলার আওয়াজ পায়। খোঁজখবর নেবার জন্যে বাঘটা তখন সটান আমার দিকে নিঃসাড়ে এগিয়ে আসে। তার মতলব ছিল আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার। ভাগ্যিস, ঝোপের ভেতর একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তার ফলে, ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার আগে বাঘ পরিষ্কার দেখতে পেল—তার সামনে দাঁড়িয়ে চতুষ্পদ কোথায়, এক দ্বিপদ প্রাণী। এরকমটা সে আশাই করে নি। আর তার এই আচমকা ভাবের সুযোগ নিয়ে আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপতে পেরেছিলাম বলেই সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলাম।

যূথবদ্ধ হয়ে থাকা বাঘের স্বভাব নয়। বাঘ একা একা ঘুরে বেড়ায় এবং কখনই তাকে দল বেঁধে থাকতে দেখা যায় না। কারো কারো মুখে শোনা যায়, একত্রে দু-পাঁচটি বাঘের ঘুরে বেড়ানোর কথা; আসলে তারা একই প'রবারের—যে যার আলাদা হয়ে যাওয়ার আগে কচি বাচ্চারা যখন মায়ের কা ছ থাকে, সেই সময়কার দল।

গ্রীষ্মের কড়া রোদে প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া বাঘের স্বভাবের একটা বড় দিক। গরমকালটা বাঘের খুবই কষ্টে কাটে। এমনিতেই বাঘের শরীরে তেষ্টা একটু বেশি। রোদ্দুরে একটুতেই সে হাঁপিয়ে পড়ে। মাটি তেতে থাকায় তার প ংের নরম অংশে ছ্যাঁকা লাগে। জল ছাড়া চলে না বলে গরমকালে বাঘের গতিবিধি খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে—জঙ্গলে তখন জলের জায়গা খুব বেশি থাকে না, বার বার জল খাওয়ার প্রয়োজনে বাঘকে তাই জলের জায়গা বেছে তার কাছেপিঠে থাকতে হয়।

বাঘ বিড়ালগোষ্ঠীর জীব হলেও, বিড়ালের সঙ্গে একটা ব্যাপারে তার মিল নেই—কম জলে লুটোপুটি খেতে বাঘ বেজায় আনন্দ পায়। সাঁতারে রীতিমত দড়। বাঘ তার নৈশবিহারে বড় বড় নদী হেলায় পারাপার করে। এটা দেখা গেছে, বাঘ যখন নদী পার হয়—ওপারের একটা বিশেষ জায়গা তার লক্ষ্যস্থল হিসেবে থাকে। স্রোতের টানে ভেসে যাওয়ায় বা অন্য কোনো কারণে যদি সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তাহলে স্বস্থানে ফিরে এসে নতুন করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুবার চেষ্টা করবে সেও ভালো—তবু সাঁতার কেটে ওপারের যত্র-তত্র উঠবে না।

একটা জুতসই এলাকা বেছে নিয়ে সেখানে আস্তানা গাড়া—এটাও বাঘের একটা বিশিষ্ট স্বভাব। সেইসঙ্গে বিশেষ বিশেষ জায়গা বেছে খাবার জমিয়ে রেখে কয়েকদিন অন্তর অন্তর সেইসব নিরাপদ ডেরায় ঠিক সে ফিরে আসবে।

বাঘটি যদি মারা পড়ে, কিছুদিনের মধ্যেই একটি নতুন বাঘ এসে তার জায়গা নেবে। দেখা যাবে, পরের বাঘটিও হুবহু আগের বাঘটির ধাত পেয়েছে। সে আর এ কস্মিনকালেও হয়ত একত্রে থাকে নি, এ বাঘটিকে এর আগে হয়ত কখনও দেখাই যায় নি—তা সত্ত্বেও দেখা যাবে, এও ঠিক তারই মত একই জায়গায় হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে, একই জায়গা থেকে জল খাচ্ছে।

## লম্বা চক্কর

একসঙ্গে একদিন বা ছুদিনের বেশি কোনো ছোট জায়গায় থেকে যাওয়া বাঘের পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ, বাঘ যখনই কোথাও গিয়ে হাজির হবে, সঙ্গে সঙ্গে সে জায়গা ছেড়ে তার শিকারের দল চলে যেতে থাকবে। বাঘের গায়ে এমন একটা মার্কামারা বোট্‌কা গন্ধ আছে যে জন্তু-জানোয়ারেরা অনেক দূর থেকেই তার উপস্থিতি অনায়াসে টের পায়। তাছাড়া বাঘ যখন শিকার ধরে তখন গোলমালও কম হয় না—যেমন, বুনো শুয়োরের চিলচিৎকার—ফলে সবাই আগে থাকতে হুঁশিয়ার হয়ে যায়।

এই কারণে, নিজস্ব শিকারের এলাকার মধ্যে বাঘদের অনবরত চরকির মত পাক খেয়ে বেড়াতে হয়। এদের পক্ষে এক রাতে দশ থেকে পনেরো মাইল চক্কর দেওয়া প্রায় রোজকার ব্যাপার।

বাঘদের গতিবিধি—বিশেষ করে, যে সব বাঘ গরুখেকো বা মানুষখেকো—যদি বেশ কয়েকমাস ধরে ছকে ফেলা যায়, তাতে বিশেষ কতকগুলো ধরনধারণ চোখে পড়বে। সবচেয়ে বেশি দেখা যাবে মোটামুটি একটা ত্রিকোণের মত ছাঁদ—সাধারণত ছয় থেকে দশ মাইলের ব্যবধানে মিলবে তিনটি বিন্দু। ত্রিকোণের একটি বিন্দুতে শিকার জোটানোর পর সব খাবার খেয়ে শেষ করা অবধি বাঘ দুই থেকে তিন রাত সেখানে থেকে যেতে পারে। তারপর সে দ্বিতীয় বিন্দুতে চলে গিয়ে সেখানে দুতিন রাত কাটাবে। তারপর তৃতীয় বিন্দুতে কিছু সময় থেকে আবার তার আরম্ভের জায়গায় ধারেকাছে ফিরে আসবে।

কখনও কখনও বাঘ তার নিত্যনৈমিত্তিক শিকারের এলাকা ছেড়ে দূর পাল্লায় পাড়ি দেয়—মাসের পর মাস তার আর কোনো পাত্তা পাওয়া যায় না। অনেক সময় আর ফিরেও আসে না। তবে তেমন ঘটনা খুবই কম ঘটে।

## লড়াই

বাঘ একবার কোনো এলাকা যদি নিজের করে নেয়, তাহলে তার জমিদারিতে আর কোনো বাঘ শিকারে দন্তস্ফুট করতে এলে প্রাণপণে সে বাধা দেবে। যখন এ ধরনের ব্যাপার ঘটে, তখন বিবাদী রাজ্যে কে থাকবে তাই নিয়ে দুই বাঘের সাধারণত লড়াই বাধে। আমার ধারণা, বাঘিনী নিয়ে মারপিট বাদ দিলে এই হল একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে বাঘে বাঘে লড়াই হয়।

শুধু বাঘ কেন, অন্য বন্য জানোয়াররাও মারামারি করে বটে—তবে তারা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে খুবই কম। এক প্রজাতির

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জানোয়ারে যখনই লড়াই হয়, সাধারণত কেউ না কেউ লড়াইতে হার মানে—তখন আর কোনোরকম সাজা না দিয়ে তাকে সেই রণক্ষেত্র থেকে চলে যেতে দেওয়া হয়।

আমি একাধিকবার বাঘে বাঘে লড়াই দেখেছি। অন্য জন্তুজানোয়ার, যেমন শম্বর, চিতল, শুয়োর, হাতি আর সাপের লড়াই কত যে দেখেছি তার হিসেব নেই—প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বিজিতের প্রতি বিজয়ীর এইরকম বীরোচিত ব্যবহার দেখেছি।

কোটৃরি দক্ষিণ ব্লকে একবার দুটো বাঘকে আমি লড়তে দেখেছিলাম। আমি বসেছিলাম একটা 'মড়ি'র ( কিল্ ) ওপর নজর রেখে। আগের দিন সন্ধেবেলা এক গরিব চাষীর একটা মোষ বাঘের হাতে খুন হয়। মাটিতে থাবার দাগ দেখে বুঝেছিলাম বাঘটার বয়স বেশি নয়। অন্ধকার হওয়ার আগেই বাঘমশাই দেখা দিলেন। এ দেখি রীতিমত কেঁদোবাঘ—মড়ির কাছে পায়ের যে দাগ দেখেছিলাম, এ বাঘ তার চেয়ে ধাড়ি। গুলি ছুঁড়তে যাচ্ছি, এমন সময় নজর পড়ল বাঘের কোল বরাবর দুটো বাঘের বাচ্চাও ছুটছে। গুলি ছোঁড়ার মতলব ত্যাগ করে আমি ওদের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলাম। ভোজের পাতে নিঃসন্দেহে ওরা ছিল একেবারেই রেয়োভাট—হঠাৎ এসে পড়ে দেখে সামনে এলাহী খাবার। ওরা তো মহাউৎসাহে হুমহাম করে খেতে শুরু করে দিল।

সবে ওদের আধ-খাওয়া হয়েছে, এমন সময় হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে এসে একটা ক্রুদ্ধ বাঘ সগর্জনে ওদের আহারে ব্যাঘাত ঘটাল। বাঘিনীও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে নবাগত বাঘের মুখোমুখি হল। এক মুহূর্ত তারা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ভয়ঙ্করভাবে ফুঁসতে ফুঁসতে কার কত মুরোদ পরখ করে নিল। তারপরই এ ওর দিকে তেড়ে গেল। সংঘর্ষের পর নিজেদের তারা ছাড়িয়ে নিল। তারপর মাথাদুটো তেরচা করে গজরাতে গজরাতে আর ফোঁসফাঁস করতে করতে আবার তারা পরস্পরের মহড়া নিল। কখনও পিছিয়ে গিয়ে, কখনও পাশে সরে গিয়ে, চোখে চোখ রেখে আর থাবা ছুঁড়ে

ছুঁড়ে তারা এ ওকে কাটান দিচ্ছিল। আর তারপর বাঘিনীটি বিদ্যুদ্‌বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল।

মোষের মৃতদেহে কতকটা আড়াল পড়ে যাওয়ায়, এরপর কী ঘটেছিল আমি স্পষ্টাস্পষ্টি দেখতে পাই নি। খানিক পরে বাঘিনীটি যখন উঠে দাঁড়াল, তখন দেখলাম তার নিচে পরাজিত বাঘ থাবা উব্‌দো করে মাটিতে পিঠ দিয়ে চিৎপটাং হয়ে পড়ে রয়েছে। দুজনে দু মিনিটেরও বেশি ঠায় ঐ অবস্থায় ছিল। এই ছোটখাটো মল্লযুদ্ধে যবনিকা পড়বার পর বাঘিনী শেষবারের মত একবার ফুঁসে উঠে একপাশে সরে দাঁড়াল; আর পরাস্ত বাঘটি তখন অরণ্যের ঘনায়মান ছায়ান্ধকারে তাড়াতাড়ি গা-ঢাকা দিল।

যদি কোনো বাঘিনী, বিশেষ করে সঙ্গে কচি বাচ্চা নিয়ে, কোনো বাঘের রাজত্বে এসে পড়ে—বাঘ তেমন আপত্তি করে বলে মনে হয় না; তবে বাঘিনীকে সে তার সঙ্গিনী করবে না, নিজের মারা শিকারে ভাগ বসাতেও দেবে না—যে যার আলাদাভাবে থাকুক, এটাই সে চাইবে।

## বাঘের ডাক

বাঘেরা মুখে হরেক রকমের আওয়াজ করতে পারে। ফস্‌ফাস্‌ আর ফোঁস্‌ফাঁস্‌ থেকে শুরু করে পুরোদমে গাঁকগাঁক। বাঘেরা ঘোঁত-ঘোঁত করে। থক-থকানোর মত করে গজরায় এবং নানাভাবে দাঁত-খিঁচানোর শব্দ করে। আচমকা কেউ সামনে এসে গেলে 'উফ্‌' শব্দে হুঙ্কার ছেড়ে বাঘ লাফিয়ে ওঠে; রেগে গেলে গাঁকগাঁক আওয়াজ করে। একেবারে আলাদা ধরনের একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ হয় বাঘ যখন তেড়ে যায়—তার এই চকিত ক্ষিপ্ত আক্রমণের মুখে এই আওয়াজ হয় দুবার কি তিনবার।

বাঘেরা কখনও কখনও আস্তে টেনে গোঙানোর মত আওয়াজ করে। মাঝে মাঝে চাপা গলায় তাদের অসন্তোষের ভাব ফুটে ওঠে। শম্বর ধরতে না পেরে একটা বাচ্চা বাঘকে একবার এই

রকমের আওয়াজ করতে শুনেছিলাম। বাঘের গন্ধ পেয়ে শম্বরটি চোঁ-চাঁ দৌড় দেওয়ায় এই বাটি তার কাছে এসে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে পারে নি। বাঘ বেচারা তখন রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে এই রকম অস্ফুট আওয়াজ করেছিল।

বাঘের যখন খোশমেজাজ, তার পেট যখন ভর্তি—চলতে চলতে সে তখন হাঁক ছাড়ে। এক পর্দায় চড়া দরাজ গলায় তার এই হুঙ্কার তিন চার মিনিট অন্তর অন্তর শোনা যায়। বাঘ যখন বাঘিনীকে খোঁজে, বাঘিনী যখন তার হারানো বাচ্চাকে খোঁজে—ডেকে ডেকে ফেরা তাদের সেই তখনকার গর্জন ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। কেননা সে যে কী উচ্চগ্রামে তখন তাদের গলা ওঠে, তাদের প্রচণ্ড স্পর্ধার সঙ্গে মিশে থাকে কী যে খেদ, মারমূর্তির সঙ্গে কী যে একটা মহিমান্বিত ভাব!

বাড়ির বেড়ালদের মত ওরাও গরর গরর্ শব্দ করে, তবে ওদের আওয়াজটা আরও কর্কশ। নিজের বাচ্চাদের সঙ্গে বসে খেলা করবার সময় একটা বাঘিনীকে আমি একবার এইরকম শব্দ করতে শুনেছিলাম। আরেকবার বাঘ-বাঘিনীর জোড় বাঁধবার সময়ও আমি এই একই শব্দ শুনেছিলাম। বনে তখন নিকষ কালো অন্ধকার থাকায় আমি সেই প্রেমিকযুগলকে দেখতে পাই নি।

মাঝে মাঝে বাঘের গলায় আরেক রকমের অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যায়। ভয় পেয়ে শম্বর ঠিক যেভাবে ডাকে—'পু-উ-উ-ক'—অবিকল ঠিক সেইরকম কাটা কাটা, চাপা, তীক্ষ্ণ স্বর। এক পাখিকে অন্য পাখির ডাক নকল করতে আমি শুনেছি। কিন্তু নিজের কানে এবং একাধিকবার না শুনলে আমি বিশ্বাসই করতাম না যে, বাঘ তার অভিপ্রেত শিকারের ত্রাহি ত্রাহি রব নকল করে। তার শিকার কোথায় আছে জানবার জন্যে সে এটা করে থাকে। কারণ, এই বিপদ্জ্ঞাপক ধ্বনি শুনে ধারেকাছে যত জন্তু লুকিয়ে আছে—শম্বর, চিতল আর কাকর—সবাই একের পর এক নিজের নিজের ডাক ডেকে একে অন্যকে জানিয়ে দেবে। এইভাবে বাঘের জানা হয়ে যাবে তারা কে কোথায় আছে না আছে।

## বাঘ স্বভাবভীরু

প্রকৃতির কোলে যে বাঘ স্বাভাবিক পরিবেশে থাকে, বেশির ভাগ বিড়াল জাতীয় প্রাণীর তুলনায় সে স্বভাবতই কিছুটা ভীরু। অথচ লোকের চোখে বাঘ হল হিংস্রতা, নির্মম বন্যতা আর নিষ্করুণ নিষ্ঠুরতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। এ ছবি সত্যি নয়।

কখনও কখনও ভারবাহী পশু এবং মাঝেমধ্যে মানুষজন তারা শিকার করে বটে, তবে বাঘের এই বিপথগামিতার জন্যে মানুষই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। বনে জন্তুজানোয়ার দুষ্প্রাপ্য হয়েছে মানুষেরই দোষে। স্বাভাবিক শিকার থেকে বঞ্চিত করে বাঘকে মানুষ বাধ্য করেছে অন্যত্র খাবারের খোঁজে যেতে। বনেজঙ্গলে যারা কাজ করে, যারা রাখালি করে এবং প্রায় দৈনন্দিন যারা বাঘের সংস্পর্শে আসে—বাঘের এই ভীরুতার কথা তারা বিলক্ষণ জানে। ঘরে বসে বাঘের ডাক শুনতে পায় যেসব জংলী আদিবাসীরা, যারা মাঝেমধ্যে বাঘের গরু মুখে করে নিয়ে যাবার দৃশ্য দেখে, বনের ডোরাকাটা রাজাধিরাজ শরীরে কতটা শক্তি রাখে যারা জানে—স্বাভাবিক বাঘ তাদের ওপর না হোক হামলা করবে, এ ভয় তারা করে না।

শিকারীমাত্রই এ কথা জানে যে, মনেপ্রাণে সমস্ত বুনো জানোয়ারই মানুষকে শতহস্ত দূরে রেখে চলতে চায়। যে বনে শিকারের ছড়াছড়ি, সেখানে কেউ হয়ত সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঠেঙিয়ে বেড়ালেও শিকারের তেমন টিকি দেখতে পাবে না। কোনো জঙ্গলে বাঘের বাস আছে জানবার পরেও বাঘের সঙ্গে দেখা হওয়াটা নিতান্তই ভাগ্যের কথা—যদি না রীতিমতভাবে তার সন্ধান করা যায়। যদি দৈবাৎ বাঘে মানুষে দেখা হয়ে যায়, মানুষ দেখলেই সাধারণত বাঘ হাওয়া হয়ে যাবে—বিশেষ করে, দিনের বেলায়।

আমি অনেকবার বাঘের সামনাসামনি গিয়ে পড়েছি, প্রত্যেক-বারই বাঘ আমাকে দেখে সটকান দিয়েছে। একবার এক বাঘ যখন মড়ির ওপর বসেছিল, আমি আলটপকা গিয়ে পড়েছিলাম তাও আবার কি, খালি হাতে একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায়।

ঘটনাটা ঘটেছিল বছর কয়েক আগে। হিমাচল প্রদেশে আমাদের গাঁয়ের কাছে। আমাদের গাঁ থেকে মাইল চারেক দূরে ঝিল। একটা ছোট্ট গ্রাম। সেখানকার এক রোগা লিকলিকে লোক, সুন্দর সিং তার নাম—আমাকে এসে খবর দিল আগের দিন রাত্রে বাঘ তার ঘোড়া মেরেছে। তাদের ও জায়গা থেকে মাইলখানেক দূরে জলের সোঁতার ধারে সেই যে বিশাল এক ভালাবান গাছ আছে, বাঘ ঘোড়ার মড়িটা সেখানে ফেলে রেখে গেছে।

তখন বেলা দশটা এবং গরমকালে দিন বড হয়। আমি আমার শিকারী পরিচারক মাংতাকে আমার বন্দুকটা দিয়ে আগে আগে পাঠিয়ে দিলাম। ঘোড়ার পিঠে আমি নিজে রওনা হলাম ঘণ্টাখানেক বাদে। রাস্তায় যেতে যেতে মাংতার সঙ্গে দেখা হল; ওকে বললাম মোড়লের বাড়িতে আমি থাকব, ও যেন সেখানে আসে। মোড়লের ভারি মিষ্টি এক মেয়ে ছিল, ও অঞ্চলের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে সুন্দর দেখতে। মোড়লের বাড়িতে অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর শেষকালে অধৈর্য হয়ে ঘোড়া রেখে আমি একাই পায়ে হেঁটে 'মড়ি' দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। যাবার সময় মোড়লের মেয়েকে বলে গেলাম সে যেন মাংতা এলেই তাকে পাঠিয়ে দেয়।

আমি যখন তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, তখন দুপুর দুটো বেজে গেছে। 'মড়ি'টা পড়ে ছিল আধ মাইলটাক দূরে, একটা সোঁতার মধ্যে। আমি সেই জলস্রোতের আঁকাবাঁকা ধার বরাবর উজানমুখো হাঁটতে হাঁটতে একটা জায়গায় এসে পড়লাম—সেখানে দেখি একপাল কাক আর শকুন গাছের ওপর বসে আছে। এই মড়াখেকোদের দেখে বুঝলাম 'মড়ি'টা কাছেপিঠে কোথাও আছে।

দিনের বেলায় তখন এমন একটা সময়, যখন 'মড়ি'র কাছে বাঘ থাকার সম্ভাবনার কথা কোনো পাকা শিকারীরও মাথায় আসবে না। শকুনদের হাবভাবে কী প্রকাশ পাচ্ছিল না পাচ্ছিল, আমি অত লক্ষ্য করে দেখি নি—আমি ওদের দিকে তাকিয়েছিলাম শুধু জায়গাটা চেনবার জন্যে। 'মড়ি'র খোঁজে আমি সম্পূর্ণ খালি হাতে এগিয়ে গেলাম।

জঙ্গলে নিঃশব্দে হাঁটা এখন আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। খাত বরাবর প্রথম বাঁকটা পেরিয়ে দ্বিতীয় বাঁকটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম—ওপারে গাছে গাছে সার দিয়ে বসে আছে কাক আর শকুন।

শেষ বাঁকটা পেরোতেই একটা ঘাসজমির ধারে এসে পড়লাম; আর আমার ঠিক হাত ছয়েক দূরেই দেখি মড়ির ওপর বসে প্রকাণ্ড এক বাঘ। আমরা পরস্পরকে যুগপৎ দেখে সমান স্তম্ভিত হয়েছিলাম। মাটিতে আমার পা দুটো যেন জমে গিয়েছিল, সোনালী আর কালো সেই ডোরাকাটার সবুজ, অকরুণ অথচ মনোমোহিনী চোখের দিকে আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। পিছু হটবার কথা আমার মনে উদয় হওয়ার আগেই বীরপুঙ্গব বাঘ ঘাসের ওপর লাফ দিয়ে নেমে সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল। আমি যেন দেখলাম এক ঝলকে মিলিয়ে গেল এক গুচ্ছ রং।

আমি আগেই বলেছি, বাঘেরা এমনিতে ভীরু; তারা সচরাচর মানুষের ওপর হামলা করে না। সেই কারণে গাঁয়ের লোকেরা তো বারোমাসই অরক্ষিত অবস্থায় জঙ্গলে আনাগোনা করে—তার মধ্যে ক'টা লোক বাঘে হাতে মরে? দেখবেন বাঘের হাতে খুনজখমের হার খুবই নগণ্য। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। এমন বাঘের সঙ্গেও কারো দেখা হয়ে যেতে পারে, যার মেজাজ বেজায় তিরিক্ষি—মানুষখেকো না হয়েও সে নিরীহ গ্রামবাসীদের মোক্ষম মার মারতে পারে। সে কিন্তু সেক্ষেত্রে মানুষের মাংস খাবে না এবং মড়ার কাছে পরে ফিরেও আসবে না।

## এক বদ্‌রাগী বাঘ

আমার তিরিশ বছরের শিকারী জীবনে তেমন বাঘ মাত্র একবারই আমার চোখে পড়েছে। তাও এমন এক জায়গায়, যেখানে বলবার মত বনজঙ্গল নেই এবং ধূসর রঙের তিতির আর এখানে সেখানে দুচারটে নীলগাই ছাড়া কোনো বন্য জীবজানোয়ারও নেই।

দিল্লী থেকে মাইল কুড়ি দূরে একটা গ্রাম আছে। নাম দমদমা। দিল্লী-আলওয়ার পুবমুখো সড়ক ছেড়ে তিন মাইল ভেতরে। কয়েকটা পর্ণকুটির আর ইতস্তত কয়েকটা আখাম্বা মেটে ঘর নিয়ে ছোট গ্রাম; খোয়াই অঞ্চল বলে কয়েকটা ক্ষয়াখর্বুটে বাবলা আর ছড়ানো ছিটানো কাঁটাঝোপ ছাড়া অন্য কোনো গাছ নেই।

ওটা আমার তিতির শিকারের মনোমত জায়গা ছিল বলে এলাকাটা ছিল আমার নখদর্পণে। অমন মরুভূমিগোছের জায়গায়, অন্য প্রাণীর কথা ছেড়েই দিলাম, কখনও কোনো বাঘ আসতে পারে —এটা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

অথচ এক বন্ধুর কাছে শুনলাম বাঘের হাতে ঐ গ্রামেই এক স্ত্রীলোক নাকি মারা পড়েছে। দিন দুই পরে আমার আরেক বন্ধু এসে জানাল খবরটা সত্যি এবং বলল, ঐ ঘটনার পর আরও পাঁচজন লোক মারা পড়েছে, তাছাড়া আরও চারজন লোক মুমূর্ষু অবস্থায় বরগাঁও হাসপাতালে আছে।

পত্রপাঠ আমি সেই গ্রামে রওনা হয়ে গেলাম। গ্রামের চৌকিদারের সঙ্গে আমার দেখা হল; বাঘটার যে কী মেজাজ তা সে নিজেই হাড়ে হাড়ে জানে। বাঘটা তার পিঠে গোটাকয়েক নখের আঁচড় বসাবার পর প্রাণ নিয়ে কোনোরকমে সে পালাতে পেরেছিল! সেই চৌকিদারের মুখে আমি প্রত্যক্ষদর্শীর খবর পেলাম।

গ্রামের এক বুড়িকে মারার পর থেকে বাঘটা এইরকম বেয়াড়া ধরনের কাণ্ডকারখানা শুরু করে দেয়। বুড়ির গরু মেরে বাঘটা যখন খাচ্ছিল, বুড়ি তখন সেখানে গিয়ে পড়ে। বাঘটা নিশ্চয় খুবই ক্ষুধার্ত ছিল; নইলে প্রকাশ্য দিবালোকে গরু ধরতেই বা যাবে কেন—বাঘ গরুটাকে যেখান থেকে ধরে, বুড়ি তার অল্প কিছু দূরে মাঠে কাজ করছিল। মাঠের এককোণে একটা ঝোপ ছিল; বুড়ি হঠাৎ শুনতে পায় সেই ঝোপের আড়াল থেকে তার গরুটা পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। বুড়ি হেঁটে গিয়ে দেখে মরা গরুর কাছে বাঘটা দাঁড়িয়ে। ঝোপে যাবার একমাত্র খোলা দিকটা দিয়ে বুড়ি এসেছিল। বাঘ

তখন বুড়ির ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে কাঁধের ওপর দাঁত বসিয়ে বুক পিঠ ঝাঁঝরা করে দিয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে।

ও এলাকা থেকে মাইল ছয়েক দূরে জেলার সদর গুরগাঁও। খবরটা যথাসময়ে সেখানে জানিয়ে দেওয়া হয়। বাঘ মারবার জন্যে গাঁয়ে একদল পুলিশ পাঠানো হয়। পথে রাজপুতদের একটা গ্রাম পড়ে। তার নাম ভুঁড়সি। প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত এ গাঁয়ের বীরযোদ্ধাদের নামে একটা স্মৃতিস্তম্ভ আছে। পুলিশরা যাবার পথে এ গ্রাম থেকে জনদশেক লোককে সঙ্গে নেয়।

পুলিশের এই দলবল বেলাবেলি দমদমায় পৌঁছেই বাঘতল্লাসি শুরু করে দেয়। গাঁয়ের একটি লোক পুলিশের দলকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে একটি ঝোপের কাছে বাঘের পায়ের ছাপ দেখায়। ঝোপটা খুব কিছু বড় নয়, দৈর্ঘ্যে তিরিশ হাত আর প্রস্থে চব্বিশ হাত হবে—তবে খুব ঘন আর উঁচু এবং তার আড়ালে বেশ চওড়া একটি গর্ত। ঝোপে ঢুকবার একটা সুড়ঙ্গ ধরনের প্রবেশপথ ছিল; বাঘ যে সেই পথ দিয়েই ঝোপের ভেতর ঢুকেছে, মাটিতে সদ্য তার স্পষ্ট পায়ের ছাপ।

বাঘকে ঝোপের বাইরে আনবার জন্যে পুলিশের দল যত রকমে পারে হৈ-হট্টগোল করল। হাঁকডাক করল, ঝোপের মধ্যে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে মারল, এমন কি বার দুই গুলিও ছুঁড়ল। কিন্তু ঝোপ থেকে কিছুই বের হয়ে এল না। বাঘ ঝোপের মধ্যে নেই, এটাই সবাই সাব্যস্ত করল।

ওরা তখন ঝোপের ওপাশে দৌড়ে দেখতে লাগল ঠিক কোন্‌দিকে বাঘ বেরিয়ে গেছে। জমিতে বালি থাকলেও ঝোপের ওপাশে বাঘের পায়ের কোনো চিহ্ন নেই। ভুঁড়সি থেকে রাজপুতদের একজন ঝোপের প্রবেশপথে ফিরে এসে ঝোপের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করল। তার সঙ্গে বন্দুক ছিল। যাতে ভালোভাবে দেখতে পায় তার জন্যে গুড়ি মেরে শরীরের অর্ধেকটা সে সুড়ঙ্গপথের ভেতর চালিয়ে দিয়েছিল। তার পা দুটো তখনও ছিল বাইরে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড হুঙ্কার ; সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে ছিল, পুলিশবাহিনী-সুদ্ধ, প্রাণভয়ে পালাতে লাগল। লম্বা দৌড় দেবার পর চাষের ক্ষেতে এসে পুলিশ বীরপুঙ্গবেরা ফিরে দাঁড়িয়ে তাদের সার্ভিস রাইফেল বাগিয়ে ধরে দমাদ্দম দমাদ্দম গুলি ছুঁড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ পর ভুঁড়সির দেহাতীরা তাদের গাঁয়ের লোকটিকে দেখতে না পেয়ে মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল। তারা পুলিশদের ধরল লোকটিকে খুঁজে আনবার জন্যে তাদের সঙ্গে যেতে। কিন্তু তাদের অনুরোধে পুলিশ কান দিল না। পুলিশের কাছ থেকে তারা তখন একটা বন্দুক ধার চাইল। পুলিশ তাতেও যখন রাজী হল না, তখন তারা খালি হাতেই সেই জায়গাটায় চলে গেল—যেখানে তারা সঙ্গের লোকটিকে ঝোপের মধ্যে শরীরের অর্ধাংশ ঢুকিয়ে দিয়ে মাটিতে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে থাকতে দেখেছিল।

ওরা গিয়ে দেখল লোকটা মাটিতে একভাবে সাষ্টাঙ্গেই শুয়ে আছে। পা দুটো তার তখনও বাইরে ; কিন্তু শরীরের বাকি অংশ ঝোপের সুড়ঙ্গপথে গোঁজা রয়েছে। লোকটার ধড়ে প্রাণ ছিল না : তার পিঠের ওপর একদলা রক্ত ; আর মাথাটা কেউ যেন হাতুড়ি দিয়ে ছেঁচে রেখেছে।

তারা যখন মৃতদেহটা ওঠাবার চেষ্টা করছে, ঝোপটা ফুঁড়ে বাঘ ছিট্‌কে বেরিয়ে এসে প্রচণ্ড হিংস্রতায় তাদের ধরাশায়ী করে ফের সেই কাঁটাঝোপের ভেতর গা ঢাকা দিল। আট জনের মধ্যে ওরা পাঁচ জন লোকই মৃত্যুযন্ত্রণায় মাটিতে আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে লাগল। বাঘ তাদের গায়ে দাঁত বসিয়ে লম্বা নখ দিয়ে ফালা ফালা করে কেটেছে। দুজন অকুস্থলেই মারা গেল, একজন মারা গেল হাসপাতালে। দুজন শেষপর্যন্ত প্রাণে বাঁচলেও তাদের বুক আর পিঠের মাংসে বাঘের দস্তখত গভীরভাবে খোদাই হয়ে থাকল।

এই বাঘ মানুষ মেরেছে বটে, কিন্তু নরমাংস কখনও খায় নি। সেই মাসে বাঘটি ঐ এলাকার আরও দুটি লোকের প্রাণ হরণ করে। তারপর তাকে ঢিট করা হয়।

বাঘের মত এমন হুঁশিয়ার প্রাণী খুব কম আছে ; যেখানে কোনোরকম বিপদের ঝুঁকি আছে, সেখানে বাঘ সহজে মাথা গলায় না ! মড়ির কাছাকাছি এসে বাঘ আগে চারদিক তন্ন-তন্ন করে দেখে নেবে, তারপর খেতে আরম্ভ করবে। এমন কি নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশ্বস্ত হওয়ার পরেও, মড়ি যেখানে পড়ে আছে সেখানে বসে কদাচিৎ খাবে—মড়ির টুঁটি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাবে, অনেক সময় অনেক দূরে !

বাঘ ঠিক ছায়ার মত এই আছে এই নেই। খানিকটা মাটি ঘেঁষে ঘাড় নুইয়ে চলা তার স্বভাব ; চলন্ত প্রাণী বা মানুষের হাঁটার ক্ষীণতম শব্দও সে বহু দূর থেকে শুনতে পায়। বাঘের কানের ভেতরকার শ্রবণযন্ত্র তার সমান সাইজের অন্য সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বৃহত্তম—বাঘের শ্রবণশক্তি সেইজন্যে সবচেয়ে প্রখর। ( এই সূত্রে বলে রাখি, শ্রবণযন্ত্র ক্ষুদ্রতম হওয়ায় ভাল্লুকেরা কানে প্রায় শোনে না বললেই হয়। )

মজার ব্যাপার এই যে, বাঘের শ্রবণযন্ত্র মানুষের কানের চেয়েও সম্ভবত আরও নিচু পর্দায় বাঁধা থাকে। মানুষের কানে ধরা পড়ে ধ্বনির মাত্র সপ্তস্বর—তার দৌড় মিনিটে তিরিশ থেকে তিরিশ হাজার পর্যন্ত কম্পন। বাঘের কানে ধরা পড়ে সপ্তস্বরের চেয়েও বেশি। বাঘের শ্রবণযন্ত্রে খুব চড়া শব্দ খুব সম্ভবত ধরা পড়বে না, কিন্তু যেসব নিম্নস্বর মানুষ কানে শুনতে পায় না—বাঘ কিন্তু মানুষের অশ্রুত সেসব শব্দ আশ্চর্য নিখুঁতভাবে শুনতে পায়। যেমন ধরুন, হুইসেলে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ আওয়াজ করলে বাঘের কোনোরকম ভাবান্তর দেখতে পাবেন না—কিন্তু পায়ের আঙুল দিয়ে ভেতর থেকে জুতোর চামড়ায় একটু মোচড় দিলেই দেখবেন সেদিকে বাঘের ঠিক চোখ পড়েছে।

বাঘের সহজাত ধূর্ততা এত বেশি যে, সেটা প্রায় যুক্তিসিদ্ধির স্তরে উঠে যায়। পাতা ফাঁদ সম্পর্কে বাঘের চেয়ে বেশি সন্দিহান

আর কোনো প্রাণীই নয়। সত্যি বলতে কি, বাঘের এই অতিসতর্কতা প্রায় ভীরুতার সমপর্যায়ে পড়ে।

কুমায়ুন জেলার হাতিকুণ্ড ফরেস্ট ব্লকে বাঘের এই দিকটা একবার আমার নজরে এসেছিল। বাঘ সেবার দিনের পর দিন এমনভাবে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছিল যে, তার কাছে আমি একেবারে বেকুব বনে গিয়েছিলাম।

আমি যখন এক বন্ধুর সঙ্গে ঐ ব্লকে ছিলাম, তখন সেখানকার বনে দুটো জানা বাঘ ছিল। একটা ছিল জখম হওয়া বাঘ; মোটা-শাল-সোঁতায় এক মারকৈলাস বন্দুকধারী এসে বাঘটির ঐ হাল করে রেখে গিয়েছিল। অন্য বাঘটি ছিল, রেঞ্জ অফিসার শ্রীভূখণ্ডীর ভাষায়, 'এক বিলাইতী শিকারী পার্টির নাকপঁচাশির দৌলতে বহুৎ এলেমদার আদমী।'

বাঘ আর বাঘশিকার সম্পর্কে সাগরপারের এই শিকারী পার্টির নিজস্ব ধারণাগুলো ছিল একটু কেমন যেন। তাঁরা মনে করতেন, বাঘের পেছনে ছুটে এবং সুযোগের অপেক্ষায় থেকে বাঘকে ধরাশায়ী করা তাঁদের কাজ নয়—বরং তাঁরা যখন যেখানে চাইবেন সেইমত হাজির হয়ে গুলি খাওয়ার জন্যে বাঘই বুক পেতে দেবে।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা মনে করলেন, বাঘের সন্ধানে জঙ্গলের ভেতর ঢুকলে তাঁদের মান খোয়া যাবে (নাকি তাতে বিপদের ভয় ছিল?)। অতএব তাঁরা চাইলেন বাঘ বেরিয়ে আসুক বনের বাঁধা সড়কে—সেখানে জমি থেকে চল্লিশ ফুট উঁচুতে এক শালগাছের মগডালে নিজেদের জন্যে তাঁরা মাচা বেঁধে রেখেছিলেন।

তাঁরা মাচার কাছাকাছি টোপ হিসেবে একটা মোষ বেঁধে রেখেছিলেন পয়লা দিনেই। বাঘ বেটার এমনি আস্পর্ধা যে, মোষটাকে সে কিনা জঙ্গলে টেনে নিয়ে গেল। পরদিন ঐ একই জায়গায় আবার একটা টোপ বাঁধা হল—মোষটাকে এবার একটা শক্ত দড়ি দিয়ে কষে বাঁধার ব্যবস্থা হল। বাঘ বেটা আবার সেই মোষটাকে মেরে শক্ত দড়িটা ছিঁড়ে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল।

বাঘের এই ধার্ষ্টামো দেখে শিকারীদের আত্মসম্মানে ঘা লাগল। তবু এবারেও তাঁরা ঐ একই জায়গায় আবার একটা টোপ বাঁধলেন—তবে এবার আর দড়ি দিয়ে নয়, লোহার মোটা তার দিয়ে। বাঘ এসে মোষটাকে মেরে, তারের দড়ি দাঁত দিয়ে কেটে—এতদূর আস্পর্ধা, মোষটাকে কিনা টেনে নিয়ে চলে গেল।

কিছুদিন এইরকম চলল। শেষ পর্যন্ত অনেক মাথা ঘামিয়ে শিকারী মশাইরা একটা উপায় বার করলেন। একটা জোরদার ডিজেল ইঞ্জিনের চোট সামলাতে পারে, এইরকম একটা শক্ত তারের দড়ি তাঁরা অর্ডার দিয়ে আনালেন। সেই দড়ি দিয়ে এবার তাঁরা মোষ বাঁধলেন। কিন্তু বাঘ বেটা মোষটাকে মেরে দঁড়ি থেকে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল; দড়ির শেষ প্রান্তে শুধু ঝুলে রইল মোষের একটা ঠ্যাং।

ওদের পক্ষে এরপর আর তিষ্ঠনো সম্ভব হয় নি। বিদেশাগত শিকারীরা চলে যাবার ঠিক ৭ মাস পরে আমি সেই ব্লকে যাই এবং ঠিক একই জায়গায় টোপ বাঁধি। তবে টোপটাকে খালি ফেলে না রেখে আমি তার কাছাকাছি একটা ঝোপের ভেতর আর কারো কোটরে বসে জেগে রইলাম। বাঘ এল বটে, তবে টোপের কাছে ঘেঁষল না। আমার চোখের আড়ালে থেকে চারপাশে একবার ঘোরাফেরা করে শেষপযন্ত হাওয়া হয়ে গেল। পরদিন জ্যান্ত টোপ বেঁধে আবার আমি বসে থাকলাম এবং বাঘ আবার এসে কাছেপিঠে না ঘেঁষে চলে গেল। এক সপ্তাহ ধরে সমানে আমি এইরকম করে চললাম আর বাঘও রোজ তার খেলা সমানে চালিয়ে যেতে লাগল।

একদিন আমি আমার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। সে যাতে সোঁতার দ্বিতীয় মুখটা আগলে রাখতে পারে। আগের সপ্তাহে প্রথম যে মুখটাতে বসে আমি নজর রেখেছিলাম, বাঘ সে জায়গাটা ঘুরে দ্বিতীয় মুখটা দিয়ে চলে যেত। সেদিন আমরা একটু আগেই বিকেল তিনটে নাগাদ চলে এসেছিলাম; মোষটাকে আর আমার জিনিসপত্র-

গুলো আমার লুকোবার জায়গার কাছে রেখে আমার বন্ধুটির জন্যে মাচা বাঁধতে চলে গিয়েছিলাম। প্রথম মুখ থেকে দ্বিতীয় মুখের দূরত্ব পুরো দুশো হাতও হবে না। বন্ধুর মাচা বেঁধে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি আমার আশ্রয়স্থলে ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু এসে দেখলাম মোষটা নিখোঁজ।

মোষটাকে আমি একটা চারাগাছের সঙ্গে সরু দড়ি দিয়ে হালকাভাবে বেঁধে রেখে গিয়েছিলাম। আর তার কাছেই যে জায়গায় আমি আমার কম্বল, কোট, হ্যাভারস্যাক আর থার্মোফ্লাস্ক রেখে গিয়েছিলাম, দেখলাম সব যেখানে ছিল সেখানেই আছে। আমি ভাবলাম মোষটা বোধহয় দড়ি খুলে ঝোপের মধ্যে চরতে চলে গেছে। খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই গাঁধাল ঝোপের তলায় ঘুপচির মধ্যে গুঁজে রাখা অবস্থায় মরা মোষটাকে দেখতে পেলাম।

বাঘ কী ভুখোড় জানোয়ার! টোপের কাছে ও নিশ্চয় রোজ আমাকে লুকোতে দেখেছে। বার বার জায়গা বদলে লুকিয়ে থাকা সত্ত্বেও বাঘটা সেইজন্যেই কখনও টোপের কাছে ঘেঁষে নি এবং কখনই সে আমার বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসে নি। কিন্তু ঐ দিন মোষটাকে একা ফেলে রেখে আমাকে চলে যেতে দেখেছিল। আমি যাওয়ামাত্র সে বেরিয়ে এসে টোপটা হস্তগত করেছিল।

## নিষ্ঠুর প্রাণী নয়

নিষ্ঠুর প্রাণী বলে বাঘের যে দুর্নাম, সেটা ঠিক নয়। বাঘের বাচ্চারাই যা একটু আধটু শিকার নিয়ে খেলে, নইলে বাঘ যাদের ওপর চড়াও হয় তাদের অধিকাংশকেই সে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলে। যতক্ষণ তার খাওয়ার মত সংস্থান থাকে, ততক্ষণ নতুন জীব কখনও সে হত্যা করে না। অনর্থক প্রাণহননের ব্যাপারটা ঘটে বিশেষ বিশেষ অবস্থায়। এটা দেখা গেছে যে, ছোকরা বাঘ বিশেষত যখন তার প্রিয়বান্ধবীর সান্নিধ্যে থাকে—তখন মাঝে মাঝে এক রাত্রে

গণ্ডায় গণ্ডায় জানোয়ার মেরে ফেলে ; নিজেকে ঘটা করে জাহির করবার ইচ্ছেয় অথবা নবলব্ধ শক্তিসামর্থ্যের মদমত্ততায় তারা এটা করে থাকে।

কী হচ্ছে বোঝবার আগেই. সম্ভবত প্রায় বিনা যন্ত্রণায়, বাঘের হাতে ঝট্ করে পরিষ্কার মৃত্যু হয়। টিপে টিপে নিষ্ঠুরভাবে মারা বাঘের স্বভাব নয়। লিপিবদ্ধ একটি জবানবন্দীতে আমার কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

মিঃ এ ডব্ল. স্ট্র্যাচান ( যিনি যমের দুয়োর থেকে ফিরে এসে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন ) এক বাঘিনীর কবলে পড়ে তাঁর 'মলড্ বাই এ টাইগার' বইতে লিখেছেন :

'বাঘিনী যখন আমার পায়ের পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছিল, আমার ভয়ও হচ্ছিল না খুব তেমন যন্ত্রণাও হচ্ছিল না ; আমার তখনকার অনুভূতিগুলো যদি বেড়ালের হাতে পড়া ইঁদুরের মত হয়ে থাকে, তাহলে দুর্বলচেতারা একথা জেনে নিরুদ্বিগ্ন হতে পারেন যে, আক্রান্ত ব্যক্তিকে অযথা কষ্ট পেতে হয় না।'

মি স্ট্র্যাচান যা বলেছেন সে সম্বন্ধে তার জ্ঞান টনটনে ; কারণ, একটি আহত মুমূর্ষু বাঘিনীর কবলে দীর্ঘসময় তাঁকে থাকতে হয়েছিল। ডান হাত আর বাঁ পা হারানো সত্ত্বেও এবং বাঘের হাতে প্রায় সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হলেও মিঃ স্ট্র্যাচান বেঁচে গিয়েছিলেন। আশ্চর্য বুকের পাটা তাঁর ; এরপর তিনি শিল্পচর্চা শুরু করেন এবং জন্তু জানোয়ারের. বিশেষ ক'রে বাঘের ছবি আঁকায় সিদ্ধহস্ত হন। হাতির দাঁতের মিনিয়েচারে তাঁর আঁকা বাঘের বিভিন্ন মেজাজ এবং ভঙ্গির ছবি রয়াল অ্যাকাডেমি অব আর্টস্-এ সাদরে গৃহীত হয়েছে।

বাঘ মারতে যাওয়া তারই সাজে, (ক) নিজের হাতিয়ারে যার ভরসা আছে এবং (খ) চলন্ত জিনিসে অভ্রান্তভাবে লক্ষ্যভেদ করার কায়দাকানুন যার আয়ত্তে। এ দুটো গুণ যার নেই, বাঘ শিকার করতে গিয়ে সে যে সম্ভবত নিজেরই বিপদ ডেকে আনবে তাই নয়, সঙ্গীসাথীদেরও সে বিপদে ফেলবে; আর তার জন্যে মুশকিলে পড়বে নিরীহ গ্রামবাসীরা—কারণ, জঙ্গলে সে ফেলে রেখে আসবে চোট-খাওয়া বাঘ, যে বাঘ পরে হয়ত নিদারুণ নরখাদকে পরিণত হবে।

কখনই তাড়াহুড়ো করে গুলি করা উচিত নয়। কেউ যদি তা করে, তাহলে আজ হোক কাল হোক শিকারের আয়ু তার হঠাৎ অকালেই ফুরিয়ে যাবে। এটা সব সময় মনে রাখা ভালো যে, বাঘের সঙ্গে লাগতে যাওয়া মানে দুনিয়ার সবচেয়ে ধূর্ত, সবচেয়ে হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গে পাঞ্জা লড়া—যে লড়াইতে আবেষ্টনী এবং আক্রমণের আর আত্মরক্ষার ক্ষমতার দিক দিয়ে বাঘেরই ষোল আনা সুবিধে।

বাঘকে মারতে এবং ঘায়েল করতে গেলে নিচেকার মোক্ষম জায়গাগুলোতে গুলি করা দরকার।

(ক) গলা
(খ) কণ্ঠা
(গ) কাঁধের ভেতর দিয়ে কলজে
(ঘ) বুকের ভেতর দিয়ে কলজে
(ঙ) দুই চোখের মাঝখান দিয়ে মগজ

বাঘ যদি শিকারীর দিকে তিন-চতুর্থাংশ ফিরে থাকে, তাহলে গুলি করার সবচেয়ে ভালো জায়গা হল কণ্ঠা। বাঘ তাহলে সোজা

ধরাশায়ী হবে—কেননা তাতে গলা থেকে নামা শরীরের শিরাগুলো যেমন ছিঁড়েখুঁড়ে যাবে, তেমনি বুলেটটি স্নায়ুকেন্দ্র ভেঙে কল্‌জে আর ফুস্‌ফুস্‌ ফুঁড়ে চলে যাবে।

বাঘ যদি পাশ ফিরে থাকে, তাহলে কল্‌জেই হবে নিশানা। কিন্তু বাঘকে তৎক্ষণাৎ অসাড় অচল করে দেবার জন্যে গুলিটা চালাতে হবে কাঁধের কেন্দ্রস্থল ভেদ করে। অনেক সময় কল্‌জে ফুঁড়ে গুলি করলেও বাঘকে ধরাশায়ী করা যায় না এবং মৃত্যুর আগের কয়েক সেকেণ্ডে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

বাঘ যদি শিকারীর দিকে মুখ করে একই জমিতে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে গলার ঠিক নিচে বুকের ঠিক মাঝখানটায় গুলি করাই প্রশস্ত। গলা আর ঘাড়ের সন্ধিস্থলে গুলি করলেও সমান ভালো ফল পাওয়া যাবে। মাথায় সামান্য ডাইনে বা বাঁয়ে কাঁধের ভেতর গুলি চালাতে পারলে বাঘকে চূড়ান্ত রকমের ঘা দেওয়া যায়। এতে হয়ত কল্‌জে ফুটো হয়ে যাবে। অথবা সম্ভবত শিরদাঁড়া ভেঙে যাবে। বুলেটটা লম্বালম্বিভাবে ঢুকে পড়ে শরীরটাকে অবশ করে দিতে পারে, অথবা—যেটা সবচেয়ে জরুরী—কাঁধের হাড় ভেঙে দেওয়ার ফলে বাঘ মারাত্মকভাবে আর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না।

যে বাঘ সিধে চলে আসছে, বন্দুকের ঘোড়া টানার আগে তাকে হয় একটু পাশ ফেরার, নয় সামনে একটু সরে যাবার সুযোগ দেওয়া উচিত—কারণ, বাঘদের স্বভাব হল যেদিকে ফিরে আছে—চোট খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—সেইদিকে তেড়ে যাবার। এমনও অনেক অবস্থা আছে, যেক্ষেত্রে বাঘের গায়ে গুলি লাগলেও তার দিক থেকে তেড়ে আসবার কোনো ভয় থাকে না। কিন্তু যে বাঘ আপনাকে দেখে ফেলেছে এবং দেখা সত্ত্বেও যার নড়বার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি, তার সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার হবেন।

মগজে গুলি চালাতে পারলে তৎক্ষণাৎ দফারফা হয়—কিন্তু কাজটা যেমন শক্ত, তেমনি যেটা ভাবা যায় সেটাও নিচের ছুটো

কারণে প্রায়ই শেষপর্যন্ত ঠিক ঘটে ওঠে না। প্রথমত, বাঘের মগজ নিশানা হিসাবে নেহাত ছোট্ট—আকারে একটা আপেলের মত; আরো বেশি ছোট দেখায় তার হাড়সর্বস্ব বিরাট মুণ্ডুটার তুলনায়; চোখের প্রায় তিন-চার ইঞ্চি পেছনে তার মগজের আধার। দ্বিতীয়ত বাঘের কপাল দেখে যে-রকমটি মনে হয় আসলে সে-রকমটি নয়। চোখের ঠিক ওপরে চামড়ার ভাঁজ এবং জায়গাটার রং এমন যে, দেখে মনে হবে আমাদেরই মতো। নাকের ঠিক ওপরে চামড়ার নিচে বুঝি উঁচানো হাড়ের কাঠামো আছে। বাঘের মাথার খুলি খুঁটিয়ে দেখলে আশ্চর্য হবেন—যাকে আমরা কপাল বলি, বাঘের সে জিনিস আদৌ নেই; সে জায়গায় তার একটা হাড় বিষম ঢালু হয়ে পেছনের দিকে নেমে গেছে—শুধু মানুষ কেন, অন্য জানোয়ারদের মতনও তার মাথার খুলিতে সামনের দিকে খাড়া হয়ে কপালের মতো কিছু নেই।

সুতরাং, চোখের ওপর গুলি লাগলে ভেদ করে তো যাবেই না, বরং হাড় ঘেঁষে পিছলে চলে যাবে। একমাত্র চোখের ভেতর দিয়ে কিংবা নাকের ঠিক গোড়ায় তাক করতে পারলে তবেই সেই গুলি বাঘের মগজে পৌঁছুবে।

সেইজন্যেই, আমার মতে, বাঘের মগজ লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়াটা ভুল। তার চেয়ে গলায় গুলি করাটা সহজ এবং তাতে মগজ ফুটো করারই সমান ফল মেলে।

বাঘ যখন পেছন ফিরে চলে যাচ্ছে, শিকারী যখন তার চেয়ে উঁচুতে রয়েছে—তখন ঘাড় আর শিরদাঁড়ার সন্ধিস্থলে গুলি লাগাতে পারলে বাঘ আর নড়তে পারবে না। শিকারী যদি একই জমিতে থাকে, তাহলে নিশানা করতে হবে ল্যাজের ঠিক গোড়ায়। গুলিটা পেছন থেকে বাঘের বুকে গিয়ে ঘা দেবে। তবে এটা একটা কদাকার ব্যাপার, পারতপক্ষে এভাবে গুলি না করাই ভালো।

কোনো মোক্ষম জায়গায় গুলি যদি না লাগে, তাহলে দেখে অবাক হবেন—গুলির পর গুলি খেয়েও বাঘ কি রকম দিব্যি হেঁটে চলে ফিরে বেড়াবে। বার ছয়েক মারাত্মকভাবে গুলি খাওয়ার পরেও

তার দৌড় বড় কম হয় না এবং অতগুলো চোট নিয়েও সে জান দিয়ে লড়ে যাবে।

## চোট-খাওয়া বাঘ

ঘণ্টা কয়েক কেটে না গেলে কখনই চোট-খাওয়া বাঘের পিছু নেওয়া উচিত নয়। বাঘ যদি সাংঘাতিকভাবে আহত হয়, তাহলে একটা রাত্তির একা থাকতে পেলে হয় সে আঘাতের দরুন মরে যাবে, নয় সে এত দুর্বল হয়ে পড়বে যে তখন কতকটা নিরাপদে তাকে সামলানো যাবে। আবার অন্যদিকে, সময় পেয়ে সে এলাকা ছেড়ে সরেও পড়তে পারে। পালাবার মত যদি তার ক্ষমতা থাকে, তাহলে বুঝতে হবে জখম হওয়ার পরে পরেই তাকে ঘাঁটাতে গেলে ফল বিপজ্জনক হতে পারত।

চোট খাক বা না খাক, বাঘ যখন কাউকে আক্রমণ করে, তখন খুব বেশি হলে তার পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ গজ দূর থেকে ছুটে আসে—দূরত্বটা সাধারণত হয় তিরিশ গজ আর ক্বচিৎ কদাচিৎ চল্লিশ গজ। চোট-খাওয়া বাঘ ঐ দূরত্বের মধ্যে তার শিকার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, তারপর দু-একবার কাটা কাটা গর্‌র্ গর্‌র্ আওয়াজ করে প্রচণ্ড বেগে তেড়ে আসবে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন, এই ধাঁ করে ছুটে আসবার সময় তাদের গতিবেগ নাকি ঘণ্টায় ষাট মাইল হয়।

বাঘ যখন ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে জানোয়ার শিকার করে, তখনও নাকি এই দূরত্বটাই বজায় রাখে। অনেক দূর থেকে শিকার লক্ষ্য করে গুটিগুটি এগিয়ে ঠিক তিরিশ থেকে চল্লিশ গজ দূরে এসেই বিদ্যুদ্বেগে গিয়ে ঘাড়ে পড়ে।

## জুতসই মারণাস্ত্র

বড় বড় বিপজ্জনক শিকারের ক্ষেত্রে শিকারীদের এখন অনেক সুবিধে। কারণ, ইদানীং অনেক রকমের মোক্ষম মারণাস্ত্র বেরিয়েছে। শিকারীরা এখন সেইসব বাছা বাছা হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারেন। যাদের খেলোয়াড়ী মনোভাবের অভাব আছে, তাঁরা কিন্তু বড় বড় জানোয়ার শিকারের ক্ষেত্রে আজকাল এই বাড়তি যন্ত্রবলের শাক দিয়ে নিজেদের অক্ষমতার মাছ ঢাকা দিচ্ছেন। এটা খুবই দুঃখের। আমি একাধিক লোককে জানি, শিকারে কৃতকার্য হওয়া বলতে তাঁরা বোঝেন একেবারে হালফ্যাশানের আরো বেশি শক্তিশালী রাইফেল হাতে থাকা।

ভালো অস্ত্র এবং ভালোরকম পড়াশুনো এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই একান্তভাবে দরকার। তবে সেটাই সব নয়। হাতযশের অভাব যদিও বা পূরণ হয়, তাতে ক্রীড়ামোদীর প্রশংসা নৈব নৈব চ।

যার যেমন অভিরুচি সে তেমন অস্ত্র বেছে নেবে। তবে কতকগুলো ব্যাপারে অভিজ্ঞ শিকারীরা একমত।

ক. খাঁটি ওস্তাদ শিকারী বিপজ্জনক শিকারের জন্যে এমন অস্ত্রই বাছবে, যা তার দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে হবে আপেক্ষিকভাবে হাল্‌কা—যাতে সেই হাতিয়ারটাকে সে অনায়াসে যথেচ্ছভাবে ঘোরাতে-ফেরাতে পারে।

খ. 'এক্সপ্রেস' টাইপের হাই-ভেলোসিটি রাইফেল মামুলি শিকারের পক্ষে সবদিক দিয়েই খুব কাজের; অনায়াসে বয়ে বেড়ানো এবং নাড়াচাড়া করা যায়; অভ্যন্তরীণ আঘাত এবং শক্ ধরানো যায়; ঠিক লাগসইভাবে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে চালাও গুলি করা যায়। বড় বড় বিপজ্জনক জন্তু শিকারে পাকা হাতে আরেকটু হেভি বোরের রাইফেল থাকলেই চলে—তাই বলে অতিরিক্ত রকমের জোরদার

রাইফেল নয়। যিনি ব্যবহার করবেন তাঁর গায়ের জোর এবং হাতের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী অস্ত্র ভালো করে দেখে শুনে বেছে নিতে হবে।

এসব নিশ্চয়ই জরুরী ব্যাপার, তবে সবচেয়ে জরুরী হল বন্দুকের পিছনের মানুষটি। বড় জানোয়ার শিকারে সবচেয়ে বেশি দরকার হয় সঠিক টিপ আর ঘা দেবার মোক্ষম জায়গা সম্বন্ধে জ্ঞান; এবং সর্বোপরি শিকারীর অচঞ্চল স্নায়ু।

বন্দুক আর গুলি যতই নিখুঁত আর যতই সরেস হোক, একথা বললে মোটেই অতিশয়োক্তি হবে না যে, অস্ত্রের চেয়ে বেশি যদি নাও হয় অন্তত সমান ফলদায়ক হল চোখ আর হাত। চোখ আর হাত হল ধীরস্থির দক্ষ বিচারের বিশ্বস্ত প্রতিভূ।

বিপজ্জনক শিকারের ক্ষেত্রে একপ্রস্থ বাঁধাধরা নিয়মকানুন মানলেই যে চলে না, এটা যত তাড়াতাড়ি হৃদয়ঙ্গম করা যাবে—ততই নিজের নিরাপত্তা বিধান এবং শিকারে সার্থকতা অর্জন করা যাবে। এখানে এটাও বলে রাখা ভালো যে, বইপড়া বিদ্যের চেয়ে ঢের বেশি মূল্যবান হাতেকলমের সামান্য অভিজ্ঞতা; সুতরাং শিকার মারা পড়বার পর যখন তাকে কাটাকুটি করা হয়, তখন বিশেষভাবে তদন্ত করে দেখা উচিত গুলিটা কোথায় লেগে কোথা দিয়ে যাওয়ায় কোন্ মোক্ষম জায়গায় কী দশা হয়েছে।

বিপজ্জনক শিকারের ক্ষেত্রে যারা নিতান্ত নতুন, তাদের সব সময় উচিত সবচেয়ে জোরদার রাইফেল ব্যবহার করা—এমন রাইফেল যা তারা সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে নাড়াচাড় করতে পারে। চার হাজার ফুট পাউণ্ডের কম মাজ্‌ল্ এনার্জির রাইফেল এবং তিনশো গ্রেনের কম ওজনের প্রোজেক্টাইল—বাঘ শিকারে যে যাবে তার ছোঁয়াই উচিত নয়। বাজার-চলতি অনেকরকম ক্যালিবার মিলবে—'৫৭৭ থেকে '৩৭৫ ম্যাগনাম—তার যে কোনো একটাতে বাঘ শিকার করা চলবে। '৫০০ ব্ল্যাক পাউডার ছাড়াও এদেশে নামকরার মধ্যে '৪৭০ রিগ্‌বি, '৪৬৫ হল্যাণ্ড অ্যাণ্ড হল্যাণ্ড, '৪৫০।৪০০ জেফরি এবং '৩৭৫ হল্যাণ্ড অ্যাণ্ড হল্যাণ্ড ম্যাগনাম।

জানোয়ার হিসেবে বাঘ এমন কিছু বিশাল নয়, এবং তার পায়ের চামড়াও 'নরমে'র কোঠাতেই পড়ে। এক ঝুনো শিকারী বলেছেন— হালআমলের এমন কি কিছুটা কম ক্যালিবারের রাইফেলেও বাঘ মারা যায়, অবশ্যই সে বাঘ যদি গুলির সামনে সুবোধ বালক হয়ে তার কলিজাটাকে সটান নিশানা করতে দেয়। তবে তেমন ঘটনা বড় একটা ঘটে না। তাছাড়া ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হয়ত বন্দুক চালাতে হবে —সেক্ষেত্রে ডালপালার একটু ছোঁয়া লেগে গেলেই বেগবান হালকা বুলেট তার আসল গতিপথ থেকে নিশ্চয়ই বিচ্যুত হবে। এবং একটু বেয়াড়াগোছের কোনো বাঘ যদি উল্টে চড়াও হওয়ার মতলব করে, তাহলে হালকা রাইফেলে তাকে ঠেকাতে পারার ভরসা কম। মগজে গুলি করতে পারলে বাঘ তৎক্ষণাৎ পটল তুলবে তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু এমন কোনো বাপের বেটা নেই যে বুক ঠুকে বলতে পারে যে, তেড়ে-আসা বাঘের ঠিক মগজ টিপ করে সে নির্ঘাত গুলি ছুঁড়তে পারবে।

বাঘ শিকারে সব সময় ভারী বোরের রাইফেল নিয়ে যাওয়া উচিত —শিকারীর পক্ষে যতটা ভার দুর্বহ নয় ততটা—তবে কখনই তা '৩৭৫ ম্যাগনামের চেয়ে হালকা হলে চলবে না। বিপজ্জনক জন্তুর পিছু ধাওয়া করতে গেলে সবচেয়ে প্রশস্ত হল ডবল-ব্যারেল রাইফেল। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। ডবল রাইফেলের ভারসাম্য এত ভালো যে, এতে ঢের তাড়াতাড়ি ঝাঁকি দিয়ে কাঁধে লাগিয়ে গুলি ছোঁড়া যায়। ম্যাগাজিন রাইফেলও অবশ্য অস্ত্র হিসেবে সমান ভালো, কিন্তু তাতে ডবল রাইফেলের মত অতটা সূক্ষ্মভাবে টিপ করা যায় না।

এদেশের জঙ্গলে যেখানে ঘন আগাছার ঝোপ আর মোটা মোটা ঘাস—সেখানে বাঘ শিকারের পক্ষে বিশেষ জুতসই হল যে কোনো রাইফেল, তবে '৪৭০-'৪০০ শ্রেণীর ডবল রাইফেল হলেই ভালো। একেবারে আলাদা জাতের এক রাইফেল হল '৩৭৫ হল্যাণ্ড অ্যাণ্ড হল্যাণ্ড ম্যাগনাম রাইফেল। এটাই আমার সবচেয়ে পছন্দসই ক্যালিবার—অন্য কার্তুজের চেয়ে এই দিয়েই আমি ঢের বেশি জানোয়ার মেরেছি—জানোয়ার বলতে হাতি এবং গয়ালও।

## দ্বিতীয় পর্ব

# অভিসার

# কাঁচাহাতের পয়

আমাদের গ্রাম ছেড়ে মাইল ছয়েক দূরে। অক্টোবরের পড়ন্ত বেলা। টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আমি চলেছি ও-তল্লাটের রূপের ডালি যে—তারই সন্দর্শনে।

আমার তখন চোদ্দ বছর বয়স। কারো হাতধরা না হয়ে শিকারে সেই প্রথম আমার একা একা বার হওয়া। বাঘ আমাদের বনের সবচেয়ে রূপবান প্রাণী—এতদিনে আমি বহু আকাঙ্ক্ষিত তার সেই অভিসারে চলেছি—আমার ধমনীতে বহমান উষ্ণ রক্তধারায় তার দোলা।

আমার বাবা ছিলেন তুখোড় শিকারী। রাইফেল আর বল্লম—দুটোতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। দেশীয় রাজ্যের হোমরাচোমরা পদ থেকে অবসর নিয়ে শিকারীর ভূস্বর্গ এই শিবলিক শৈলশ্রেণীর পাদদেশে এসে পাকাপাকি ভাবে তিনি ডেরা বাঁধেন, যাতে জীবনের বাকি দিনগুলো বড় বড় জানোয়ার শিকার করে কাটাতে পারেন। এটা ছিল তাঁর বরাবরকার শখ।

১৯২০-এর দশক তখন সবে শুরু। গরু-মারা বেজায় শয়তান এক বাঘ সে সময়ে ও-অঞ্চলে বড় দৌরাত্ম্য করছে। দূন উপত্যকার প্রায় ১৫০ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে এই বদ্‌মায়েশ বাঘটি গ্রামের লোকদের তটস্থ করে রেখেছিল। এখন এই এলাকাটি হিমাচল প্রদেশের দক্ষিণাংশ।

এমন অস্বাভাবিক রকমের মারকুটে বাঘ খুব কম দেখা যায়। অন্য বাঘ যেখানে খুন করে শুধু ততটুকুই যতটুকু নিজেদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে দরকার হয় এবং দুটো একটা দিন চর্বি দিয়ে চালিয়ে নেয়, সেখানে এ বাঘ খুন করে নির্বিচারে। একবার আমি হিসেব করে দেখেছিলাম এই বাঘ মাত্র একদিনেই একজায়গায় আটটা এবং আরেক জায়গায় একজোড়া মোষ মেরেছিল।

বাঘটার হাঁটা-চলার একটা বিশিষ্ট ভঙ্গি ছিল। মাটিতে তার সামনের বাঁ-পায়ের ছাপ পড়ত একটু টানা টানা ধরনের এবং কতকটা অস্পষ্ট—এ থেকে অনেকে ধরে নিয়েছিল যে, পাঁচ আঙুলের জায়গায় তার পায়ের আঙুল বোধ হয় ছ'টা, তাই সে একটু পা টেনে টেনে হাঁটত। গাঁয়ের লোকে তার নাম দিয়েছিল 'ল্যাংড়া চ্যাঙ্গা' ( ছ'আঙুলে খোঁড়া )।'

বিরাট ধুম্‌সো আকৃতির হওয়ায় এবং আড়ে-বহরে বেয়াড়া ধরনের মোটা হওয়ার ফলে জঙ্গলে-থাকা চটপটে জানোয়ারদের সে ছুটে গিয়ে ধরতে পারত না। কাজেই বাধ্য হয়ে তাকে গরু-চুরির রাস্তা ধরতে হয়। ও-অঞ্চলে তার এই দৌরাত্ম্য চলে তিন বছরের ওপর। গ্রামের পর গ্রামে চাষী বেচারাদের গরু-ছাগল এই ক'বছরে সে প্রায় মুড়িয়ে খেয়েছিল।

দেবতারা স্বর্গসুখেই মশগুল, মর্ত্যের তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার তাঁদের সময় কোথায়? আর এ এলাকা তখন ছিল দেশীয় রাজ্যের আওতায়—দেশীয় রাজরাজড়ারা তো সব সেই ফুর্তিবাজ দেবতাদেরই একেকটি খুদে সংস্করণ।

কোনো শিকারী যদি কিছু করত, একমাত্র তাহলেই লোকের মুশকিলের কতকটা আশান হত। তাও আবার করতে হত লুকিয়ে চুরিয়ে! কেননা সে আমলে বেশির ভাগ রাজ্যে রাজরাজড়াদের ছাড়া আর কারো বাঘ শিকারের অধিকার ছিল না।

এই উৎপাত বন্ধ করবার জন্যে আমার বাবা চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। মাসের পর মাস, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় রাতের পর রাত তিনি জেগে-বসে থেকেছেন বাঘটাকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে। কিন্তু সব কিছুই ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। যতবারই তিনি বাঘের সঙ্গে মোলাকাতের চেষ্টা করেছেন, ততবারই বাঘ তার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে।

অক্টোবরের পড়ন্ত বেলায় ধোলা-কুন্‌বার জঙ্গলের দিকে ঘোড়া

হাঁকিয়ে আমি ছুটে যাচ্ছিলাম, তার কারণ একজন গাঁয়ের লোক এসে খবর দিয়েছিল যে, তার শেষ বলদটারও ঘাড় মট কেছে রক্ত-লোলুপ চ্যাঙ্গা।

খবরটা শুনে আমার বাবা আমাকে জিগ্যেস করেছিলেন—কিরে, একবার কপাল ঠুকে দেখবি নাকি? আমি তো সঙ্গে সঙ্গে একপায়ে রাজি। বাবা পাছে পরে আবার মত বদ্‌লে ফেলেন, সেইজন্যে পড়ি-মরি করে তক্ষুনি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে আধঘণ্টার মধ্যে ঘোড়া নিয়ে আমি হাওয়া। লোকটা যে গ্রাম থেকে এসেছিল একেবারে সোজা সেই গ্রামের দিকে।

আমার ছিল ভালো জাতের কাথিয়াবাড়ি কম বয়সের ঘোড়া। দেখতেও তেমনি সুন্দর। বন্য শুয়োর-খেদায় রীতিমত তুরন্ত। আমার সঙ্গে তার ছিল হলায়-গলায় ভাব। ছুটতে ছুটতে বর্শার ফলা দিয়ে তাঁবুর খুঁটো তোলা আর বেড়া ডিঙোবার খেলায় অসংখ্যবার ও আমার সঙ্গী হয়েছে আর এর ভেতর দিয়েই আমাদের মন জানাজানি হয়েছিল।

এমন একটা কাজের ভার পড়ায় আমার তখন খুব ডগমগ ভাব; আমার ঘোড়া মোতির মধ্যেও তার ছোঁয়াচ লেগেছিল। আমরা তুজনেই তখন আহ্লাদে আটখানা হয়ে রাস্তার ঝোপঝাড় আর খানাডোবা লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছি। মোতি এক জায়গায় এসে একটা উঁচু কাঁটাঝোপ লম্বা লাফে পার হচ্ছিল। আগে থেকে তৈরি না থাকায় আরেকটু হলেই আমি পড়ে যাচ্ছিলাম। ঘোড়ার জিনটা ধরে ফেলে নিজেকে সামলাতে গিয়ে আমার হাত ফস্‌কে বন্দুকটা পড়ে গেল। শক্ত জমিতে পড়ে খটাশ্‌ করে একটা শব্দ হল।

ঝোপটা পেরিয়ে মোতি সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি নেমে গিয়ে বন্দুকটা কুড়িয়ে নিলাম। বাঁ নলের গুলি ছোঁড়ার কলকব্জার সঙ্গে জোড়া পাতের নিচেকার খাঁজে কোনাকুনিভাবে আটকানো ছোট্ট বাঁটের গায়ে দেখলাম চিড় খেয়েছে। তুঃখে আমার

তখন কান্না পাচ্ছিল—এমন একটা সুযোগ তো হাতছাড়া হলই, উপরন্তু আমার ভয় এরপর বাবা হয়ত আমাকে আর আস্ত রাখবেন না।

হাতে থাকছে আর একটি নল, তাও আবার তার গর্তটা প্লেন ধরনের। আমাকে এক্ষুনি ঠিক করে ফেলতে হবে—ফিরে যাব, না যা থাকে কুলেকপালে বলে বাঘের পিছু নেব। অর্থাৎ, ভাঙা বন্দুক নিয়ে বাঘ, না বাবামশাই—কার সামনে যাব?

মোতির পিঠটা একটু চাপড়ে আমার বন্দুকের বাঁটটা রুমাল দিয়ে বেশ করে বেঁধে নিয়ে জিনের ওপর উঠে বসলাম। ব্যস্, তারপর আমরা সটান জঙ্গলের দিকে ছুট দিলাম।

ছেলেখেলার ভাব আর তখন আমাদের কারো মধ্যে নেই। তার বদলে আমাদের দু-তরফের একমাত্র চিন্তা কিভাবে অনিচ্ছাকৃত ভাবনাগুলো মন থেকে তাড়ানো যায়—মোতির তরফে লাফিয়ে ঝোপ পার হওয়ার ভাবনা আর আমার তরফে বাবার সামনে পড়ার ভাবনা।

আমি যেন আচ্ছন্নের মত জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে লাগলাম আমার সেই বাঘের ঢল ঢল রূপের। বছর দুই আগে দেখা একটি দৃশ্য আমার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল।

চ্যাঙ্গা যেখান থেকে আশপাশের গ্রামগুলোর গরু-ছাগল মেরে মেরে ভুষ্টিনাশ করছিল, আমার বাবা তার কাছেই সদলবলে তাঁবু গেড়েছিলেন। দলের লোকদের খাওয়াবার জন্যে মাংস জোগানোর ভার পড়েছিল আমার ওপর। আমার প্রাণপণ ইচ্ছে কাজটা ভালো-ভাবে করবার। বন্দুকটা কাঁধে উঠিয়ে ভোর ভোর আমি বেরিয়ে পড়লাম টুকটাক শিকারের আশায়।

শালবনের একটু ভেতর দিকে যেতেই হঠাৎ এক ঝাঁক বনমোরগের ভয়ার্ত কঁক্-কঁক্ আওয়াজ কানে এল। জঙ্গলতত্ত্বের ব্যাপারে তখনও আমি নেহাৎ আনাড়ী, বন-জঙ্গলের প্রাণীদের ভাষা বোঝবার ক্ষমতা

তখনও আমার হয় নি। পাখিগুলো বনের সবাইকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে চেঁচিয়ে সজাগ করে দিচ্ছিল ; সেই শুনে আমি তাদের দিকেই পা বাড়ালাম।

যে ঝোপটা থেকে বনমোরগেরা 'কঁকর-কঁকর-কঁক' করে সভয়ে ডাক পাড়ছিল, তার কাছ ঘেঁষে আমি গুটি গুটি এগিয়ে গেলাম। বনমোরগেরা ঝোপের আড়ালে এমনভাবে গা ঢাকা দিয়েছিল যে, মাত্র সাত-আট হাত দূরে দাঁড়িয়েও আমি আদৌ তাদের দেখতে পাচ্ছিলাম না!

চারদিকে আমি একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। শালবনের ছায়া মাটিতে পড়ে কুচকুচে কালো দেখাচ্ছিল। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছের ডালপালার ভেতর দিয়ে ভোরবেলার সূর্যের তেরছা আলো নিচেকার কালো কুচকুচে জমির ওপর এমনভাবে ভাঙা ভাঙা সোনার ঝুরি ছড়িয়ে রেখেছিল যে, তাই দেখে আমার বাবার বৈঠকখানার দেয়ালে আর মেঝের ওপর সাজানো বাঘছালের ছবি বারবার মনে পড়ছিল।

পাখিগুলোর কঁক্ কঁক্ আওয়াজের দিকে কান খাড়া রেখে আমি পা টিপে টিপে ঝোপের দিকে এগোচ্ছিলাম। ঝোপটার ভেতরে গুলি ছুঁড়তে আমার প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিল—ছররাগুলো ছড়িয়ে গিয়ে তাতে অন্তত কিছু মোরগ তো নিশ্চয় ঘায়েল হবে। ভাগ্যিস, তক্ষুনি এক ঝলকে মনে পড়ে গেল অস্ত্রবিদ্যার গোড়ার কথা: 'চোখের ওপর স্পষ্ট দেখতে না পেলে কক্ষনো গুলি ছুঁড়ো না'। তাড়াতাড়ি মনের ইচ্ছেটা দমন করলাম। এবার উল্টোদিক থেকে এক নজরে দেখবার জন্যে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে ছায়ার দিকটা থেকে ঝোপটাকে চক্কর দিলাম।

ঝোপটাকে বেড় দিয়ে এসে যেই না মাথা তোলা—অমনি একেবারে সামনাসামনি প্রকাণ্ডকায় এক বাঘের সঙ্গে চার চোখের মিলন—বাঘটা খুব বেশি হলে বিশ হাত তফাতে।

চারিদিকে রৌদ্রছায়ার খেলায় ভ্যান্ গগের ছবির মত কালো আর সোনার আঁজি দিয়ে কী ঝলমলে নকশা ফুটে উঠেছিল। দেখে

আমি তো স্তম্ভিত—ভয় নয়, সেই আশ্চর্য দৃশ্যের অপার ঐশ্বর্যে। আর তারপরই রঙগুলো নড়ে-চড়ে উঠল আর সেই সঙ্গে আকাশ-কাঁপানো হুঙ্কার—উ-ক্‌! তাতে যত না রাগ, তার চেয়ে বেশি ধমকের সুর। উলুবনে লাফিয়ে পড়ে বাঘ তৎক্ষণাৎ হাওয়া।

চোঁ-চাঁ দৌড়ে বাবার কাছে এসে আমি বাঘ দেখার কথা বললাম। বাবা তৎক্ষণাৎ জঙ্গল পেটানোর ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সারা দিনমান চেষ্টা করেও কেউ বাঘের টিকি দেখতে পেল না।

চ্যাঙ্গার সঙ্গে সেই আমার প্রথম দেখা। তাকে দেখে ভয় পাওয়ার চেয়ে আমার ভালো লেগেছিল বেশি। আর এখন যখন তার হালের উপদ্রুত এলাকার দিকে ছুটে চলেছি, আমার প্রাণে বিন্দুমাত্র ভয় নেই। বরং তার সঙ্গে পুরনো চাক্ষুষ পরিচয়টা ঝালিয়ে নেবার জন্যে আমি তখন বেজায় উৎসুক।

যার বলদ মরেছে তার গ্রামে যখন পৌঁছুলাম, তখন বেলা তিনটে বেজে গেছে। সেখান থেকে মাইল খানেক রাস্তা পায়ে হেঁটে জঙ্গলের খানিকটা ভেতরে ঢুকলে সেই অকুস্থলটি পাওয়া যাবে যেখানে মরা বলদের লাশ পড়ে আছে। গোটা গ্রাম 'শিকারী'র জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। সে জায়গায় আমাকে দেখে তাদের আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল—বাচ্চা বয়েস, খোঁচা খোঁচা চুল, মুখে দুঃখী-দুঃখী ভাব, দেখলে আদৌ ভরসা হয় না।

কুঁড়েঘরের ভেতর বাড়ির বৌ-ঝিরা দরজার আড়ালে থেকে উকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখছিল—তারই মধ্যে একটি হরিণনয়না সুন্দরীকে চোখে পড়ল, সে তার সঙ্গিনীর কানে ফিশফিশ করে কী যেন বলে আমার দিকে একটু হাসি ছুঁড়ে দিল—হয়ত উপহাসেরই হাসি।

হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালাম, যথেষ্ট বেলা হয়ে গেছে—তারপর ভাঙা বন্দুকটার দিকে চোখ পড়ল। মন বেজায় দমে গেল। যদি আমি একা থাকতাম, গাঁয়ের লোকদের সামনে যদি বোকা বনে যাবার ভয় না থাকত, তাহলে ভ্যাঁ করে হয়ত আমি কেঁদেই ফেলতাম।

যাই হোক, কোনোরকমে গলাটা শুকনো করে আমি ভুরা চাচার খোঁজ করলাম। ভুরা চাচা নিরক্ষর বুড়োমানুষ হলেও তাঁর মন যেমন নরম, তেমনি মানুষ হিসেবে খুব ভদ্র। ভুরা চাচাকে আমি ছোট থেকেই চিনি। ভুরা চাচা তখন মাঠে কাজ করছিলেন। গাঁয়ের একটি ছেলে ছুটে গেল আমি এসেছি এই খবরটা দিতে। শুনে ভুরা চাচা দৌড়ে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

গোটা দলের মধ্যে দেখলাম আমার ওপর একা তাঁরই ভরসা আছে। দেখে মনে জোর পেলাম।

ভুরা চাচা হেসে জিগ্যেস করলেন, 'বড্ড বেলা হয়ে গেল না? যাক, আর দেরি করা নয়। দেখা যাক, এ বিষয়ে চ্যাঙ্গা কী বলে।'

মোতির পিঠ চাপ্ড়ে দিয়ে তার খাওয়া-দাওয়া আর রাতে থাকার বন্দোবস্ত করে ভুরা চাচাকে নিয়ে জঙ্গলের দিকে পাড়ি দিলাম।

ঘটনাস্থলে যখন আমরা পৌছুলাম, তখন পাঁচটা বেজে গেছে। বাঘের অপেক্ষায় বসে থাকার তখন আর মানে হয় না। চারটের ঢের আগেই আমার ঘাঁটি গেড়ে বসা উচিত ছিল; তার কারণ বাঘেরা এবং বিশেষ করে চিতাবাঘেরা ঐ সময় নাগাদ ঘুমিয়ে উঠে মড়ির ওপর নজর রাখার জন্যে খানিকটা তফাতে একটা সুবিধেমত জায়গা বেছে নিয়ে বসে থাকে।

মড়িটা পড়ে ছিল ঘন নলবনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায়—তার চারিদিক ঘিরে বড় বড় আকাশছোঁয়া শালগাছ। দেখে আমার বেজায় মন খারাপ হল। কমপক্ষে চারদিন আগে বলদটা খুন হয়েছে, থাকার মধ্যে এখানে-সেখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে শুধু হাড় ক'খানা, তাও শেয়াল, হায়না আর শকুনেরা ঠুকরে কিছু রাখে নি।

ভুরা চাচার দিকে তাকালাম। তাঁকে আমার চেয়েও বেশি মনমরা দেখাল। আমার কাছ ঘেঁষে এসে আমতা-আমতা করে নিচু গলায় বললেন যে, মড়িটা নেহাৎ বাসি, বাঘটা হল শয়তানের জাশু চ্যাঙ্গা, টাটকা টাটকা মারবার পরও যে কখনও মড়ির কাছে ফেরে

না, এবং সবচেয়ে দুঃখের কথা হল, শিকারে বসবার সময় অনেক আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। চাচাকে আমি বললাম—এই অবেলায় হরিণ শিকার করতে কিংবা শুয়োর মারতে যাওয়ারও তো কোনো মানে হয় না, গাঁয়ে ফিরে গিয়ে করব কা? বরং এখানেই কিছুক্ষণ বসে থাকা যাক না—ধরুন, এই রাত দশটা অবধি?

আমার কথা শুনে ভুরা চাচা ফিশ ফিশ করে মুখে আপত্তি করলেন বটে, কিন্তু তাঁর মমতাময় মরমী চোখের কোণে একটা খুশির ঝিলিক খেলে গেল। ব্যস্, তাই দেখে আমার সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল। মনে মনে সানন্দে অনুভব করলাম—আমি বড় হয়েছি।

ব্যাঘ্রপুঙ্গব যে আত্মপ্রকাশ করে আমাদের বাধিত করবেন, তার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই ঢাকা-দেওয়া মাচা বাঁধা বা বেমালুমভাবে গা ঢাকা দেওয়া সংক্রান্ত প্রাথমিক সাবধানতাটুকুও আমি ইচ্ছে করেই অবলম্বন করি নি। যে ফাঁকা জায়গাটাতে মাংস-লেশহীন সাদা ধবধবে হাড়গুলো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল, তার আকার বড়জোর ব্যাডমিন্টন খেলার কোর্টের সমান হবে। চারপাশের শালবনের ছায়া তার ওপর কয়েক পরত পুরু হয়ে এমন ঘন হয়ে পড়েছিল যে, হাত দিয়ে যেন তা ছোঁয়া পর্যন্ত যাচ্ছিল এবং যেন তার ভার পর্যন্ত অনুভব করা যাচ্ছিল।

ফাঁকা জায়গাটার পুবধারে ছিল অনেকদিনের পুরনো প্রায় চার ফুট উঁচু একটা উইঢিবি। বসব বলে সেই জায়গাটাই আমি বাছলাম। ঢিবির মাথাটা চেঁছে সমান করে নিয়ে তার ওপর ভাঁজ করা কম্বল বিছিয়ে আরামে বসবার জায়গা করে নিলাম। কম্বলের ওপর বসে পা দুটো শূন্যে ঝুলিয়ে দিয়ে কোলের ওপর বন্দুকটা আড় করে রাখলাম।

ভুরা চাচাকে আমি হাত নেড়ে বাড়ি চলে যেতে বললাম। কেননা ঢিবির ওপর দুজনের বসবার মত জায়গা ছিল না। বাঘ শিকারের পক্ষে এর চেয়ে খারাপ বসবার জায়গা আর হয় না।

আমি যখন ভুয়া চাচাকে ইশারা করে চলে যেতে বলছি, তখনও ঢিবির খোঁচা খোঁচা ধারগুলো আমার পাছায় ফুটছিল। আমাকে কম করে চারটি ঘণ্টা স্বনির্বাচিত শূলের ওপর ঐভাবে নিজেকে চড়িয়ে রাখতে হল।

বাঘের যে দেখা পাব না, এ বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চয় ছিলাম। তবু বাঘের আশায় এই প্রথম আমার একা বসে থাকা। জঙ্গলে একা রাত কাটানো অবশ্য এই আমার প্রথম নয়। বনজঙ্গল কিংবা রাতের নির্জনতায় আমার কোনো ভয়ডর নেই। ছুটোতেই আমার অভ্যেস ছিল।

আমাদের বাড়িভর্তি ছিল পোষা পশুপাখি। আমি তার মধ্যে মানুষ। ছোট থেকেই পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ আর সেই সঙ্গে রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর হাজারো গল্প শুনেছি। তারই ফলে আমার মন পেয়েছে এই ধরনের একটু রোমান্টিক ধাঁচ।

নিথর নিস্তব্ধ জঙ্গল। একটা কিছু ঘটবে বলে সবাই যেন রুদ্ধ-নিশ্বাসে অপেক্ষা করছে। পোকামাকড়ের একটানা গুনগুন আওয়াজ। থেকে থেকে অসময়ে কাঠঠোকরার কর্কশ ডাক। রঙিন রঙিন স্বপ্নে আমাকে ঘিরে নেমে এসেছে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। আমার বয়ঃসন্ধির অর্ধতন্দ্রালস মানসপটে ফুটে উঠেছে অস্ফুট বাসনার চিত্রমালা—যেখানে হরিণনয়না সেই গ্রাম্যবালা কানামাছি খেলছে।

এরপর হঠাৎ একটা আচমকা আওয়াজ। জঙ্গলের এতক্ষণের ঐকতানের সঙ্গে তার মিল নেই। আওয়াজটা আমাকে ঝাকিয়ে জাগিয়ে দিল। বাঘ কি?

আমার বন্দুকের একটি মাত্র নল কাজের। তার ভেতর সোয়া তিন ইঞ্চির একটি কার্তুজ ভরা রয়েছে। পাঁচ ড্রাম কালো বারুদ আর লোহার বারোটা বাকৃশট গুলি মোম দিয়ে আটকে খোলের ভেতর বাবা নিজে হাতে ঠেসেছেন।

আমার হৃদ্‌যন্ত্র তখন দ্রুত তালে চলতে আরম্ভ করেছে। শক্ত করে বাগিয়ে ধরেছি আমার বন্দুকের ছোট বাঁট আর ফিশপ্লেট।

বিন্দুমাত্র শব্দ না করে আড়চোখে চেয়ে দেখলাম—ও হরি, বাঘ কোথায়। এক পাল শেয়াল।

পালে ছিল সাতটা শেয়াল। গায়ে তাদের নতুন গজিয়ে ওঠা শীতের মরশুমী পশম। শেয়ালগুলো খুবই হুঁশিয়ার; নিজেদের অনধিকার প্রবেশ সম্পর্কে তাদের বেশ টনটনে জ্ঞান। কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর পালা করে তারা একেকজন এদিক ওদিক তাকিয়ে আর গন্ধ শুঁকে শুঁকে পাহারায় মোতায়েন থাকছিল—বাকিরা সেই সময় মড়ির হাড় চিবোতে ব্যস্ত।

হঠাৎ তারা কাছেই ঘাসের জঙ্গলে হুড়মুড় করে ছুটে গিয়ে গা ঢাকা দিল।

খেয়াল না করে ওদের আমি জানান দিয়ে ফেলেছি ভেবে নিজের ওপর আমার ভারি রাগ আর দুঃখ হল।

আমার ডান হাতের দিকে একটু পেছনে একটা ময়ূর খুব কাছ থেকে হঠাৎ আচমকা চিলচিৎকার করে উঠল। সাঁঝরাত্তিরের নিটোল স্তব্ধতা আমার কানের কাছে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল। আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস্ করে উঠল। দেখতে দেখতে বনে যত ময়ূর ছিল সবাই সে ডাকের ধুয়ো ধরে কিছুক্ষণের মত সারা বন চিল-চিৎকারে কাঁপিয়ে তুলল। কাছাকাছি ঝোপঝাড় থেকে একটা শম্বর সেই সঙ্গে গুরুগম্ভীর গলায় 'টাঁক টাঁক' আওয়াজ জুড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে গলা সপ্তমে তুলে চিতলের দল কাঁপা কাঁপা স্বরের মূর্ছনায় শম্বরের আওয়াজ ডুবিয়ে দিল।

প্রায় মিনিট পনেরো ধরে চলল সেই সুর-বিচিত্রা—প্রথমে জলদতালে শুরু হয়ে তারপর ঢিমে তাল, শেষটায় অন্তরায় উঠে নৈসর্গিক সঙ্গীতের নৈঃশব্দ্যে মিলিয়ে যাওয়া।

নিশি-উন্মথিত স্বপ্নের মত সাঁঝরাত্তির থিতিয়ে বসল গুরুগম্ভীর স্তব্ধতা নিয়ে—সারা বন জুড়ে আবার তেমনি বিরাজ করতে থাকল কীটপতঙ্গের স্বাভাবিক গুঞ্জন আর থেকে থেকে পশুপাখির চিৎকার।

বসে আছি টান টান হয়ে। সমস্তক্ষণ একটা কী-হয় কী-হয় ভাব। আপাদমস্তক টনটন করছে। এমন সময় শেয়ালের পাল ভয়ার্ত গলায় থেকে থেকে ডাকতে শুরু ক'রে দিল—'ফে···উ', 'ফে···· উ'। বুঝতে পারলাম বাঘ ধারেকাছেই আছে। কিন্তু কোথায়?

ঠিক তারপরই আমার ডান হাতের দিকে মাড়ানো ঘাসের মধ্যে অত্যন্ত কাছে খুব আস্তে সর সর্ আওয়াজ পেলাম। ঘাড় সোজা রেখে চোখের তারা দুটো ডানপাশের রগের দিকে ঠেলে দিলাম। দিতেই আমার চোখদুটো কোটর থেকে যেন বেরিয়ে আসতে চাইল। চোখে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার মাথা ঘুরে যাবার যোগাড় হল। একটা মুহূর্ত। তার ভেতর আমার মনের মধ্যে যেন ঝড় বয়ে গেল।

স্বপ্ন, না মায়া, না এ আমার মতিভ্রম? সন্ধ্যার ঘনায়মান আবছায়া অন্ধকারে দৈত্যকায় এক বাঘ সামনের থাবা দুটো মুড়ে তার অবিশ্বাস্য রকমের প্রকাণ্ড মাথাটা নুইয়ে নিজের গা চাটছে। তার ধড়টা ঘাসের ওপর ছড়ানো। যেন কোনো কুঁড়ের বাদশা কুকুর পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে আছে। ঘাড় সোজা করে তাকাবার দরুন তার ল্যাজের সবটা আমার নজরে পড়ছিল না।

বাঘটা এল কেমন করে? এলই বা কখন? এসব কিছুই আমার মাথায় ঢুকছিল না। একটা পাতাও নড়ল না, একটা ডালও ভাঙল না, ঘাসের একটা ডগা ছেঁড়ারও শব্দ হল না। বাঘটা এসেছিল একেবারে ছায়ার মতন—ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু সে জানতে দেয় নি।

আমি একেবারে দাঁতে দাঁত দিয়ে নিশ্বাস চেপে নিথর নিঃস্পন্দ হয়ে বসে রইলাম। দৃষ্টি খাড়া। চোখের পলক পর্যন্ত ফেলছি না।

ঐ অবস্থায় বসে থেকে আমার পক্ষে কিচ্ছু করা সম্ভব নয়। যেদিকটায় আমার অসুবিধে বাঘ ঠিক সেই দিকটাতেই বসে, আমার বন্দুকের নলটাও ভুল দিকে ঘোরানো। তার চেয়েও খারাপ,

বন্দুকটা আমার কোলের ওপর শোয়ানো—কাঁধে বসিয়ে টিপ করে মারা তো দূর অস্ত্।

বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে আমার মুঠোটা এত এঁটে বসেছে যে, আঙুলের কড়াগুলো টাটিয়ে উঠেছে। একগাদা চোখ-ধাঁধানো রং হুস্ করে বিরাটভাবে ঝিলিক দিয়ে কোনোরকম শব্দ না করে রঙচঙে ছায়ার মতন যখন সামনে পা বাড়াল, মনে হল উত্তেজনায় এক্ষুনি আমার স্নায়ুগুলো ছিঁড়ে যাবে।

বাঘ সামনের দিকে হাঁটছিল। যেদিকে আমার বন্দুকের নল তার ডানদিক দিয়ে। আমি তার ফুস্ফুসের জায়গায় স্বচ্ছন্দে গুলি বেঁধাতে পারি।

আস্তে আস্তে, খুব আ-স্তে আ-স্তে আমি বন্দুকটা ওঠাতে থাকলাম। যখন আরেকটু হলেই বন্দুকটা আমি কাঁধের ওপর বসাতে পারি, সেই সময় একটিমাত্র উলুঘাসের ডগায় বন্দুকের নলের ঘষা লেগে গেল। তাতে যদি আওয়াজ হয়েও থাকে, কোনো মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়ের এ সাধ্য নেই যে সে আওয়াজ ধরে। যেখানে আমি বসে আছি বাঘ তার আট গজ দূরে। তবু শব্দটা তার ঠিক কানে গেছে। মুখে একটা বীভৎস ভাব এনে অমনি সাঁ করে সে ঘুরে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জবাবে আমার হাতেও বন্দুকের একমাত্র সচল ঘোড়াটি নড়ে উঠল।

আমার বন্দুকের বজ্রনির্ঘোষে বনের নৈঃশব্দ্যই যেন আরও প্রকট হল এবং বাঘ আর আমার মাঝখানে খাড়া করে তুলল পুরু ধোঁয়ার একটি যবনিকা।

ঘাব্ড়ে গিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে আমি জোরজার করে পেছন দিকটা খুলবার চেষ্টা করলাম—যাতে চেম্বারটা খালি করে তাজা কার্তুজ ভরতে পারি। মাথায় যেন আমার বজ্রাঘাত হল, যখন দেখলাম বিকেলে হাত থেকে পড়ে গিয়েও বন্দুকের নষ্ট হওয়ার যেটুকু বাকি ছিল, এখন গুলির ধাক্কায় এবং সেইসঙ্গে উদ্ভ্রান্তের মত আমার ঝাঁকানির চোটে তার দফা একেবারে গয়া হয়ে গেছে। কুঁদোটা

খসে বেরিয়ে এসেছে এবং সম্পূর্ণ দুখানা হওয়া বন্দুকটা এখন আমি হাতের মধ্যে ধরে আছি।

তখনও আমার সামনে ঘন ধোঁয়ার আড়াল। বাঘ আমাকে বা আমি বাঘকে—কেউই কাউকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমি আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছিলাম মাটির ওপর সে আছাড়ি পিছাড়ি করছে। আর তার ক্রুদ্ধ গর্জনে বনের নৈশ নৈঃশব্দ্য ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে।

আর ঠিক তারপরই তার কণ্ঠনালী থেকে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘায়িত আর্তস্বর। আ-উ-উঁ-উঁ—শব্দটা ক্ষীণ হতে হতে গলাটা বুজে এল—তারপর আর কোথাও কোনো শব্দ নেই।

ধোঁয়া কেটে গেল। দশাসই চ্যাঙ্গা আমার ঠিক সামনেই টান টান হয়ে শুয়ে। চিরনিদ্রার মধ্যেও রাজার মত তাকে কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে।

আমার ঘড়িতে তখন ছ'টা বেজে চল্লিশ। আরও মিনিট দশেক অপেক্ষা করে তবে আমি জায়গা ছেড়ে নামলাম। বাঘের গায়ের কাছে গিয়ে তার ল্যাজে হাত দিলাম। দিয়ে মনটা বিশ্রী রকমের খারাপ হয়ে গেল। সেইসঙ্গে আবার মনে মনে একটু গুমরও হল। বাঘের মাথার কাছে বসলাম।

এরপর বনের সেই ঘনায়মান ছায়ার পর্দার আড়াল থেকে দেখা দিলেন ভুরা চাচা। গ্রামে তিনি আদৌ যান নি। কেননা আমাকে তিনি একা জঙ্গলে ফেলে যাবেন এটা ভাবা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। কাছাকাছি একটা গাছে উঠে ডালপালার আড়ালে তিনি ঘাপ্‌টি মেরে বসে ছিলেন। তিনি সব কিছু স্বচক্ষে দেখেছেন এবং স্বকর্ণে শুনেছেন। হুড়মুড় করে গাছ থেকে নেমে এসেই আমার কপালে তিনি চুমো খেলেন। তারপর আমাকে একা রেখে বনের একপাশে চলে গিয়ে কী একটা গাছ থেকে একমুঠো পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এলেন। তারপর সেই পাতা দুহাতে ধরে বনরাজার মৃতদেহে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন।

দুজনেই তারপর ফিরে গেলাম গ্রামে—এক বুড়ো গর্বে আর আনন্দে ডগমগ হয়ে আর তার চেলা এক নওজোয়ান ছোকরা গর্বে আর আনন্দে বুক ফুলিয়ে।

আমার বাঘ মারবার খবর শুনে গোটা গ্রাম এসে আমাকে ছেঁকে ধরল, হরিণনয়না মেয়েটিও ছিল সেই দলে। উত্তেজনায় ঘন ঘন তার নিশ্বাস পড়ছিল এবং এও ঠিক যে, রোম সাম্রাজ্যের পতনে-উত্থানে আমার হৃদয় যত না আন্দোলিত হত, তার চেয়ে ঢের বেশি আন্দোলিত হয়েছিল তার সূচ্যগ্র বক্ষাবরণের পতনে-উত্থানে।

আমার দিনলিপিতে চ্যাঙ্গা প্রসঙ্গে আমি লিখেছিলাম :

২৮।১০।২৪—শেষ অবধি চ্যাঙ্গাকে কাল সন্ধেবেলায় আমার গুলির মুখে প্রাণ দিতে হল। একগোছা লোহার গুলি তার ঘাড়ে লেগে ঘাড়টাকে ভেঙে দেয়। খোলের ভেতর ঠাসা হাবিজাবি জিনিসগুলোও তার ক্ষতস্থানে পাওয়া গেছে।

নাকের ডগা থেকে ল্যাজের ডগা পর্যন্ত মেপে দেখা গেল ১০ ফুট ১১ ইঞ্চি লম্বা। বাবার মতে, অসাধারণ রকমের বড় বাঘ। …এর ঘাড়ের চারপাশে প্রায় সিংহের কেশরের মত অস্বাভাবিক রকমের বড় ঘন চুল।

সামনের বাঁ পা-টা ছিল খোঁড়া ; পায়ের দ্বিতীয় আঙুলের কাছে একটা বাকশট গুলি বিঁধে আঙুলটা দু-ভাগ করে দিয়েছিল। মনে হয় চোটটা বহুদিন আগেকার—দড়কচড়া মেরে জায়গাটাতে কালশিটে দাগ পড়ে গেছে। ··

এই লেখার নিচে বাবার স্বহস্তে লেখা একটা নোট রয়েছে :

শিকার একটা মহৎ খেলা। এই খেলার কোনো নিয়মকানুন তুমি মানো নি। তোমার বরাত ভালো যে, তুমি আস্ত ফিরতে পেরেছ। লাখে একজন মিলবে যে তোমার মত নিয়তিকে এমনভাবে প্রলুব্ধ করার পরও প্রাণ নিয়ে ফিরে

এসেছে এবং পরে সে গল্প করেছে।···ভাগ্যক্রমে তরে গিয়েছ বলে যেন আঙুল ফুলে কলাগাছ না হয়। এটাকে বলতে পারো, কাঁচাহাতের পয়; কিন্তু হায়, এ জিনিস বেশিদিন চলেও না, বার বার ঘটেও না।···

শিকারের সমস্ত আদবকায়দা সব সময় মেনে চলবে; তা করতে গেলে তোমার দরকার প্রথমত যাকে শিকার করছ তার প্রতি এবং দ্বিতীয়ত অস্ত্রের প্রতি মনোযোগ।

সব সময় মনে রাখবে, শিকার মানে শুধু জানোয়ার মারা নয়; হত্যার চেয়ে ঢের বড় জিনিস হল শিকার। শিকারে হত্যার ব্যাপারটা নেহাতই গৌণ।

# হৃত সাহসের বলি

আগে ছিল পল্টনে; ঘোড়সওয়ার সেপাই। বেশ লম্বাচওড়া; জাতে জাঠ। টায়েটুয়ে চলা সংসারের একমাত্র সংস্থান ছোট এক টুকরো জমি; হলে হবে কি, মেজায় দিলদরাজ; বাড়িতে অতিথি এলে খাওয়ানোর ধুম পড়ে যাবে।

সে ছিল এমন এক রসের রসিক, আফিম বলে লোকের কাছে যার অখ্যাতি। নাম তার সদারাম; সই করতে গিয়ে তার এই নামের আগে সব সময়ই সে যোগ করত 'নম্বরদার' (গাঁয়ের মোড়ল) কথাটা।

যমুনা নদীর খাঁড়ি থেকে বড় একটা জলা সৃষ্টি হয়ে যেখানে থিক-থিক করছে নলখাগড়ার বন আর বালিহাঁস আর কুমির, সেখানে সদারামের গ্রাম। আমি একবার তার কাছেই শিকারের জন্যে তাঁবু খাটিয়ে ছিলাম। বেশ কিছুদিন সেবার আমাদের একসঙ্গে খুব আনন্দে কেটেছিল।

সদারাম আমার সঙ্গে বড় একটা শিকারে যেত না। ভোরবেলায় শিশিরে-ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে চললে তার লাল টুকটুকে জুতো আর ধবধবে সাদা পোশাক মাটি হয়ে যাবে এই তার ভয়। কিন্তু আমাদের তাঁবুতে রোজ তার হাজিরা ছিল বাঁধা; লোকটা ছিল মজার। এমন কি যখন ওকে নিয়ে আমরা হাসিঠাট্টা করতাম, তখনও সদারামের মুখে লেগে থাকত একগাল হাসি। তাছাড়া চোখ-জুলজুল-করা সদারামের আফিমের কৌটোটা সব সময় সামনে ধরাই থাকত, যার খুশি সে কৌটো থেকে নিতে পারে।

সে শুধু আমারই বিলক্ষণ বন্ধু ছিল না, যেই তার সংস্পর্শে এসেছে —বেড়াল কুকুর গরু ঘোড়া ইস্তক—সকলের সঙ্গেই তার হলায় গলায় ভাব। তার ওপর সদারাম ছিল একাধারে দার্শনিক, কবিরাজ এবং পথপ্রদর্শক।

এক গ্রাম্য মেলায় সদারামের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। মেলা হয়ে আমরা যাচ্ছিলাম শুয়োর শিকারে। গাঁয়ের বউঝিদের মনহরণের জন্যে দোকানীরা রকমারি মনোহারি জিনিস সাজিয়ে রেখেছিল; তার চারপাশে মেয়ের দল ঘুর ঘুর করছিল আর গাঁয়ের নওজোয়ানরা তৃষিত হৃদয়ে দল বেঁধে এ-দোকান সে-দোকান করছিল —ছেলেদের দিকে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল সেই বুকভরা মধু গাঁয়ের বধূরা।

আমার কাথিয়াবাড়ি নওজোয়ান ঘোড়া মোতি নিজের অপরূপ সৌন্দর্যে ডগমগ হয়ে তুল্‌কি চালে নেচে কুঁদে চলেছে--সে বেশ বুঝে নিয়েছিল উৎসবের আনন্দে সারা গ্রাম মাতোয়ারা।

রোগা ডিগডিগে একটা লোক, তার সন্ত-মাড়-দেওয়া সাদা ধবধবে পাগড়ির গায়ে ঝিকমিক করছে আবীর, ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে আদর-মাখা চোখে আমার ঘোড়াটার দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। ঘোড়া বলতে যে সে অজ্ঞান তা তার দেখবার ধরন থেকেই বোঝা যায়। ঘোড়াটা কোন্ জাতের, সে সম্বন্ধে লোকটা আমাকে কয়েকটা প্রশ্নও করল। আমি নেমে পড়ে ওর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। নাম ওর সদারাম। মোতির সূত্রে আলাপ। সদারাম সেই থেকে আমার চিরদিনের বন্ধু হয়ে গেল।

একবার সদারামকে আমি আমাদের গ্রামে ধরে নিয়ে এসেছিলাম। ঠিক করলাম দুজনে মিলে বড়সড় গাছের জানোয়ার শিকারে যাব। বাঘ বা চিতার মহড়া নেওয়ার প্রস্তাবে দেখলাম সদারামনারাজ। আমাকে দিয়ে সে হলফ করিয়ে নিল যে বাঘ শিকারে আমি যেন কখনই তাকে সঙ্গে না নিই। তার কাছে ভারী গোছের শিকার বলতে হরিণ, শিঙেল এবং খুব বেশি হলে, বনশুয়োর মারা।

শিবলিকের পাহাড়তলীতে সেকালে ছিল এক দেশীয় রাজ্য। তার একাংশে বেলওয়ালী ফরেস্ট। সেখানে বিনা অনুমতিতে বাইরের লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমরা সেই জঙ্গলে শিকার ঢুঁড়ে

বেড়াচ্ছিলাম। পুর্বদিকটাতে জঙ্গলটির তুটি ভাগ। একটা ভাগ সোজা সামনে গিয়ে রোগা রোগা টিলা আর টানা টানা দুন ভিড়ভারাক্রান্ত করে তারপর হঠাৎ ডানদিকে বেঁকে যমুনা নদীর এই দিককার পাড়ে গিয়ে নেমেছে। বনের যে জায়গায় আমরা ছিলাম, তার বিশ মাইল দূর দিয়ে গেছে যমুনা নদী। জঙ্গলের আরেকটা ভাগ পাশের পাহাড় বেয়ে উঠে বেঁকে একফা।ল মালভূমির ওপর দিয়ে ছুটে ওপাশে ছত্রাকার হয়ে নেমে পাহাড়তলার চষা ভুঁইতে গিয়ে পড়েছে।

আমরা তাঁবু ফেলেছিলাম এই মালভূমিতে। বনটা ছি·' সংরক্ষিত; এর মধ্যে গুলি ছোঁড়ার একমাত্র অধিকার মহারাজার এব' তাঁর ইংরেজ লাট-বেলাট অতিথিকুলের। অন্য হেঁজিপেঁজিদের এ বনে ঢোকাও বারণ। অনধিকার প্রবেশের শাস্তিও খুব গুরুতর— অপরাধীর প্রচুর টাকা জরিমানা, প্রচুর দিনের কারাবাস এ:ং অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত হবে।

আমরা শিকার করছিলাম লুকিয়ে চুরিয়ে। নিষিদ্ধ ফল বলে শিকারে মজাটাও তাই ঢের বেশি।

ও জায়গা থেকে বনপুলিশের ফাঁড়ি কম করে মাইল চারেক দূরে। তাছাড়া সশস্ত্র শিকারীকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঘাঁটাতে যে সে যাবে, তাতে কী এমন তার ফায়দা? তলব তাদের এতই যৎসামান্য যে, এক টুকরো রাং কিংবা টাকাটাক দক্ষিণা দিলেই শিকারীর সাত খুন মাপ হয়ে যাবে—এমন কি যদি হাতেনাতে ধরা পড়ে তাহলেও। আমাদের শিকার জি·নসটা যাদের রক্তে, আমরা যারা বনচণ্ডীর উপাসক—জঙ্গলে চুরি করে শিকার করাটা ছিল আমাদের কাছে নিয়মভঙ্গ নয়, নিয়মসিদ্ধ ব্যাপার।

সদারামের আরও বেশি মন খুঁতখুঁত করছিল ব্যাপারটা আপত্তিকর বলে। কিন্তু জায়গাটাতে গিয়ে সে এত রকমের এবং এত অঢেল জংলী জানোয়ার প্রাণ ভরে দেখতে পেল যে, তার মনে আর কোনো ক্ষোভ রইল না।

২

বেলা প'ড়ে আসতে আমি ফিরে এলাম। আমাদের গাঁয়ের ডাকাবুকো যে ছোকরা আমার খিদ্‌মত করত, তার ছিল পেটে পেটে শয়তানি। সে একদিন বেশ রসিয়ে র'সয়ে আমাদের ধনুর্ধরটির মৃগয়াভিযানের বর্ণনা দিচ্ছিল :

"লক্ষ্যবস্তু হল নট্-নড়নচড়ন-নট্-'কচ্ছ এক ধাড়ি হরিণ, তাও—কী বলব—মাত্র হাত কযেক দূরে দাঁড়িয়ে। অত কাছ থেকে টিপ ফস্কানো মোটেই সোজা ব্যাপার নয়। এই নয়কে হয় করতে সদারামের কম কেরামতির দরকার হয় নি। আপনি তো বল্লেন, 'গুলি করে মারো'—ও তাতে বিশ্বাসই করে না। ওর নীতি হল, 'গুলি করে বাঁচাও'।"

আমরা দুজনে হাসছিলাম। সদারামও সে হাসিতে যোগ দিল।

ছোকরা বলে চলল: "সদারামের হাতে রাইফেল—ওঃ, সে এক দেবদুর্লভ দৃশ্য! আফিমের কৌটোটা নিয়ে যেভাবে সে সমস্তক্ষণ খসর মসর করে, রাইফেল হাতে নিয়েও তার হুবহু সেই একই ব্যবহার। তফাত একেবারে নেই তা নয: কৌটোর আফিম মুখে পুরবার পর তবে সদারাম চোখ বুজে বোম হয়, কিন্তু রাইফেলের বেলায় অন্য—ভেতরের জিনিস ন ে র মথ দিয়ে বেরোবার আগে, এমন কি ঘোড়া টেপবারও আগে সদারামের চোখ বন্ধ হয়ে যায়। সদারামের বন্দুকও ফুটল আর হরিণটিও গাযে মৌমাছির হুল-বেঁধা ঘোড়ার মত একলাফে হাওয়া হযে গেল; সঙ্গে সঙ্গে সদারাম ভায়া চোপ্‌সানো বেলুনের মত মাটিতে চিৎ ' ে। হরিণ আর সদারাম—এ ওঠে তো ও পড়ে।"

"বলিস্ কী? হুল বেঁধা ঘোড়ার মত হরিণটা ঠিক্‌রে পড়ল? তাহলে গুলি লেগেছে, বল্।"

"উহু, সে ভয় নেই। হরিণের গায়ে সদারাম কোনোরকম আঁচড় কেটেছে বলতে চান? আজ্ঞে, না—সদারাম অত বোকা নয়। একবার দেওয়ানী আদালতে তার দস্তুরমত শিক্ষা হয়ে গেছে। এক বন্ধক পত্রে তার সই থাকায় মহাজনের কাছে মামলায় সে হেরে যায়। সেই থেকে সদারামের নীতি হল—শতং বদ, মা লিখ। কোন্ আঁচড়ে কখন কী হয় কে বলতে পারে?"

বললাম, "পেজোমি ছাড়্। বল্ তো, মাটিতে দাগ দেখেছিলি?"

"দেখেছি বৈকি! তার ধারে বাতাসে রক্তের ছিটেফোঁটাও ছিল না।" জিভে চুক্ চুক্ শব্দ তুলে ছোকরা বলল, "চোখ বুজে বলা যায়, স্রেফ ফস্কেছে। যেমন চোখ বুজেই বলা যায়, সদারামের পাগড়ির নিচে আছে স্রেফ টাক।"

আমি কিন্তু ঠিক নিঃসন্দেহ হতে পারলাম না। হরিণের ব্যবহার থেকে আঁচ করা যায় যে ওর গায়ে গুলি লেগেছে। গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ারদের সটান ওপরের দিকে লাফিয়ে উঠতে আমি দেখেছি—লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পেটে গুলি লাগলে এই রকমটা হয়ে থাকে।

জানোয়ারদের পঙ্গু করা এবং তিলে তিলে যন্ত্রণাকর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া—এ আমার কখনই ধাতে সয় না। সদারামকে গালাগালি দিয়ে ওকে ওর কৃতকর্মের কথা বললাম। সদারাম কিছুতেই মানতে চাইল না; আমার চাকরটির ঠাট্টাবিদ্রূপে আরও জোর পেয়ে ও আমাকে বোঝাতে চাইলো যে, নেশায় অমন বুঁদ-হয়ে-থাকা অবস্থায় তার পক্ষে হরিণটার গায়ে কোনোরকম আচড় কাটা সম্ভবই নয়।

হয়ত অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে হরিণটার গায়ে ওর গুলি লেগে গেছে—এ কথা হাজার যুক্তি দিয়েও আমি ওকে বোঝাতে পারলাম না। যাই হোক, গাঁইগুঁই করে সদারাম শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে সরজমিন তদন্তে বেরোতে রাজী হল।

অকুস্থল খুব বেশি হলে হাত চল্লিশ দূরে। হরিণ যেখানটাতে

চরছিল সেটা একটি বাধাবন্ধহীন ফাঁকা জায়গা। আমরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মাটিতে দাগ দেখার চেষ্টা করছিলাম। হরিণ যে জায়গাটার পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে থাকবার সময় সদারাম গুলি ছুঁড়েছিল, সেই জায়গাটা আমরা খুঁজে পেলাম। হরিণ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে গুলি খেয়েছে এবং যে ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটে গেছে, কোথাও রক্তের কোনো দাগ নেই। ঘাস আর শুকনো পাতা মাড়িয়ে যে পথ দিয়ে সে পালিয়েছে, সেই পথটি পরিষ্কার চেনা যাচ্ছিল।

সেই পথ ধরে আন্দাজ একশো হাত যাওয়ার পর প্রমাণ হল আমার অনুমান ঠিক—হরিণের পেটে লেগেছে সদারামের গুলি। যে পথ দিয়ে হরিণ গেছে, সেখানে ঘাসের উঁচু ডগার গায়ে লাল্‌চে প্যাচপেচে কি সব লেগে রয়েছে। পেট ফুটো না হয়ে থাকলে ও জিনিস চুইয়ে চুইয়ে বেরোতে পারে না। খুব সম্ভবত হরিণের ফুসফুস নিশানা করে সদারাম গুলি করেছিল, হাত ফস্‌কে গুলিটা আসলে লেগেছে প্রায় চার পাঁচ ইঞ্চি পেছনে। সেকেণ্ডে ১২০০ ফুট গতিবেগসম্পন্ন ১০০ গ্রেনের বুলেট হরিণকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করতে পারে নি—রাস্তার শুধু একটা দিকেই ঘাস প্যাচপেচে হয়ে থাকায় সেটা বোঝা যায়।

আমাদের তাঁবু থেকে আধ মাইলটাক দূরে একটা শুকনো নালা বেয়ে দাগে দাগে এগিয়ে দেখি ঝাকড়া বনকুলের ঝোপে ঢাকা একটা ফোকরের পাশে দাগটা ছেতরে গেছে। বেশ ক্লান্ত লাগছিল, খুব খিদেও পেয়েছে—পাকা পাকা কুল দেখে জিভে আমার জল এসে গিয়েছিল। আমার '৪০১ উইঞ্চেস্টার ম্যাগাজিন রাইফেলটা একটা গাছের গায়ে রেখে টপাটপ কুল পাড়তে লেগে গেলাম। আমি যখন টকটক-মিষ্টিমিষ্টি কুলগুলো উদরস্থ করতে ব্যস্ত, সদারাম সেই ফাঁকে আমার রাইফেলটা হাতে করে মাটিতে দাগ দেখে দেখে খানিকটা রাস্তা এগিয়ে গিয়েছিল (আফিমখোর মাত্রই টক্‌ জিনিসে অনাসক্ত)। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে, তার হাত বিশেক দূরে আরও একটু ঘন ঝোপঝাড়। সদারাম সেখানে গিয়ে একপাশে বসে

পড়েছিল। মাটিতে বসতে না বসতে ঝোপের নিচে ঝটপট শব্দ আর তৎক্ষণাৎ ঝুলন্ত জিভ বের করে ল্যাজ উঁচিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল সেই হরিণ।

কী এমন ব্যাপার, হেসে উড়িয়ে দিলেই হয়। তা নয়, সদারাম হাঁউমাউ করে বলে উঠল—হরিণ না হয়ে বাঘও তো হতে পারত এবং কী দরকার ছিল ওকে এই অজলে অস্থলে আমার টেনে আনবার?

খানিকটা ছুটে ছোট একটা গড়ানে জায়গার ধারে গিয়ে আমি S-আকারের একটা ঢালের মাথায় থমকে দাঁড়ালাম। ওপাশে কিসের একটা গোলমাল। ঘাসের ওপর দিয়ে হুড়মুড় করে নেমে আমি ওপরে ঠেলে উঠলাম। সরু গিরিপথের তলদেশ থেকে তখনও গোলমালের আওয়াজ ভেসে আসছিল। তবে আওয়াজটা তখন আর তত জোরালো নয়। S-আকারের গ্রন্থির কেন্দ্রস্থলটি এমন বিরক্তিকরভাবে দীর্ঘায়িত হয়েছিল যে সামনের দিকে পুরোটাই আমার দৃষ্টির অন্তরালে। ওখানে দাঁড়িয়ে আমি কিছুই ঠাহর করতে পারছিলাম না।

ঠাণ্ডার প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে। আমার পেছনে উঁচু পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবে যাবার পর গোটা তল্লাট জুড়ে লাল-নীলের ছোঁয়াচ-লাগা দীর্ঘসঞ্চরমান ছায়া।

ঢালের গা বরাবর নেমে কাছের উঁচু জায়গাটাতে মোচড় দিয়ে আবার উঠে এলাম।

আলো যত পড়ে আসছে, সান্ধ্য হাওয়ার বেগ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাও তেমনি বাড়ছে। আমি সেই কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘেমে যেন নেয়ে উঠছি। পিঠের সঙ্গে শার্ট সেঁটে গেছে, তার ওপর ভিজে জামাকাপড়ের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকায় আমার অস্বস্তির মাত্রা আরও বেড়ে যাচ্ছে। উত্তেজনায় টান টান হয়ে দীর্ঘ পথ গুড়ি মেরে চলাতে হওয়ায় আমার শরীরে কাঁপুনি ধরেছিল। একটু দম নেবার জন্যে এক জায়গায় বসে আমি এদিক-ওদিকে

তাকিয়ে সদারামের খোঁজ করতে লাগলাম। দেখলাম সদারাম আধশোয়া হয়ে বসে আফিমের কৌটোটা আঙুল দিয়ে খুঁড়ছে। ক্ষোভ, অনুযোগ, ধন্ধ আর হতভম্বের ভাব—একাকারে সব তালগোল পাকিয়ে সদারামকে দেখাচ্ছিল সুররিয়ালিস্ট ছবির মতন।

একটা জায়গা ছিল যেখান থেকে দেখবার সুবিধে হয়। খুব কষ্টে গুড়ি মেরে নিজেকে কোনোরকমে সামলে সুমলে আমি সেখানটাতে গেলাম। কিন্তু আমি ঘাড় নিচু-করা অবস্থায় তখনও আমি ঠাহর করতে পারছিলাম না ঠিক কোথা থেকে শব্দটা ভেসে আসছিল। ছোট একগোছা ঘাস আমার দৃষ্টি আড়াল করে রেখেছিল। হাটুর ওপর ভর দিয়ে মাথা তুলে দেখবার চেষ্টা করলাম, তাতেও ঘাসের আড়াল পড়ল। এবারে আমি চেষ্টা করলাম পায়ে ভর দিয়ে সটান উঠে দাঁড়াতে। একটা শুকনো পাতা মাড়িয়ে ফেলায় মড়মড় করে শব্দ হল। ফলে, এতক্ষণের লুকোচুরি, পা টিপে টিপে সন্তর্পণে হাঁটা—সব মাঠে মারা গেল।

অনধিক ছ'ফুট দূরে ঘাসের যে ঝোপটাতে আমি চোখ রেখেছিলাম, সেখান থেকে বেরিয়ে এল আমি যার পিছু নিয়েছিলাম সেই হরিণ নয়—তাজা রক্ত মাখা ভয়ঙ্কর বিকৃত মুখে এক ক্রুদ্ধ বাঘ। কুকুরের তাড়া খেয়ে বেড়াল যেভাবে ঘাড়ে কান চেপে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে থাকে. বাঘটা সেই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। কখন যে বাঘের বরাবর বন্দুকটা তুলে ঘোড়া টিপেছি আমি নিজেই জানি না। বন্দুকে গুড়ুম করে একটা আওয়াজ তার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ফাটানো মর্মভেদী এক গর্জন আমাকে প্রকম্পিত করে তুলল। ঝট্ করে ফোটা গুলিটা বার করে দিয়ে সে জায়গায় একটা নতুন তাজা কার্তুজ মুহূর্তে আমি ভরে নিলাম। কিন্তু তার আগেই সেই বাঘটা লাফ দিয়ে মাঝখানের ঢালের আড়ালে গা ঢাকা দিল।

আমার গায়ের মধ্যে পাক দিচ্ছিল এবং শরীরও আর বইছিল না। শত চেষ্টা করেও পা দুটো আমি খাড়া রাখতে পারছিলাম না। মাটিতে বসে পড়ে আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

বাঘ বোধহয় সারাটা দিন সরু গিরিপথটাতে ঘাপটি মেরে পড়ে ছিল। ভয় পেয়ে হরিণ বেচারা লাফ দিয়ে ঝুম করে পড়বি তো পড় অজান্তে একেবারে সেই বাঘের মুখে। হরিণ পালাতে চাইছে, ক্ষুধার্ত বাঘই বা ছাড়বে কেন—একটু আগে সেইজন্যেই ওখানে অত ছুড়যুদ্ধ ঝটাপটি।

ভ্যালা মুশকিলে পড়া গেছে। ঘা-খাওয়া বাঘকে এখন খুঁজে বার করতে হবে। একেই আমার তখন নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা, তার ওপর পেটের ভেতর কেন্নলি পাক দিচ্ছে। সন্ধে এদিকে ইতিমধ্যেই বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। ঘনায়মান এই অন্ধকারে আমার কিছুই করবার নেই।

পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়াগুলো থেকেও সূর্যাস্তের শেষ আলোটুকু লম্বা লম্বা আঙুলে মুছে নিয়েছে ঘনকালো ছায়া। সেই ছায়াই আচ্ছন্নতা ভেঙে আমাকে ঠেলে তুলে দিল। হঠাৎ সদারামের কথা আমার মনে পড়ে গেল। কী হল তার? গেল কোথায় সে?

শেষ যে জায়গায় সদারামকে মাটিতে আধশোয়া হয়ে বসে থাকতে দেখেছিলাম সেই জায়গায় এলাম। সদারামের কোনো পাত্তা নেই। মাটিতে পড়ে আছে শুধু ওর পাগড়িটা। মনে মনে খুবই ভয় হল। যত সব অলক্ষুণে চিন্তা মাথার মধ্যে ভিড় করতে লাগল।

গোড়ায় আস্তে তারপর খুব জোরে শিস দিয়ে সদারামকে ডাকতে লাগলাম। কোনো সাড়া নেই। কাছাকাছি জখম-হওয়া বাঘ। এ অবস্থায় নড়েচড়ে শব্দ করে বা ডাক দিয়ে নিজের উপস্থিতি জানিয়ে দেওয়া মানে বিপদ ডেকে আনা—এসব জেনেও শেষটায় নিরুপায় হয়ে সদারামের নাম ধরে আমাকে চেঁচিয়ে ডাকতে হল। বার কয়েক ডাকবার পর দূরে একটা উঁচু গাছের মগডাল থেকে চিঁ চিঁ-করা তার কণ্ঠস্বর কানে এল। গাছের খুব কাছে এসে তবে সদারামকে দেখতে পেলাম। একেবারে মগডালের ওপর খুব বিপজ্জনক অবস্থায় সে বসে। জীবনে এর আগে কদাচ সে গাছে চড়ে নি।

ওকে নিরাপদে বহালতবিয়তে থাকতে দেখে আমারও ধড়ে প্রাণ এল। ওর এই অসামান্য কেরামতির জন্যে তখন আমি বাহবা না দিয়ে পারলাম না। দুঃখের বিষয়, সদারামের কাছে সেটা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে বলে বোধ হল। আমি, শিকারপর্ব, বাঘ, বাঘের পূর্বপুরুষ, বিশেষ করে মাতৃকুল—সবাইকে জড়িয়ে এমন সব বাছাই-করা বিশেষণ সে ছাড়ল যে সেসব ক্ষতি নেই। আর কক্ষনো সে আমার সঙ্গে বার হবে না, এই বলে সে নাকে কানে খৎ দিল। মানুষের কানে বাঘ শিকারের কুমন্ত্র দেবার অপরাধে দেবতাদের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে ছাড়ল। তার ওপর, গাছ থেকে নেমে আসবার প্রস্তাবেও সে রাজী হল না। আমি তাহলে তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছি, কাল সকালে এসে তোমাকে নিয়ে যাব—এই বলে যখন ভয় দেখালাম তখন সে নামতে রাজী হল। নামতে গিয়ে পড়ল মুশকিলে। ওঠবার সময় দিব্যি উঠে গিয়েছিল, কী করে তা সে জানে না। এখন নামবার সময় বুঝতে পারছে কাজটা তার অসাধ্য। অকপটেই সে বলল। প্রথম মহাযুদ্ধে সে লড়েছে; লড়াইতে তার বীরত্বের কত গল্পই না সে আমাদের শুনিয়েছে। ভয় কী জিনিস তা সে জানে না। তবে তার এত গাছ থেকে এখন নামার ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা—ঘা-খাওয়া বাঘটা যে কাছেপিঠেই আছে। অনেক অনুনয়-বিনয় করে, অনেক রকম অভয় দিয়ে তবে তাকে আমি গাছের মগডাল থেকে নেমে আসবার প্রচেষ্টায় রাজী করাতে পারলাম। সদারাম প্রথমে তার গা থেকে কোট খুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল, তারপর একটি একটি করে পা থেকে জুতো খুলল, তারপর মোজা। এইবার ঝাড়াহাতপা হয়ে গাছের গুঁড়িটা দুহাতে জড়িয়ে গড় গড় করে সে নেমে আসতে লাগল। ফলে, তার বুক আর পেটের চামড়া ছেঁচে গেল। মাটি ছোঁবার আগেই তার কামিজ আর কুর্তার হল দফারফা। সামনের দিকটা তখন হয় নেই, নয় নিশানের মত শুধু লেগে থেকে তাকে দেখাচ্ছে আফ্রিকী লড়াকুর মতন। মাধ্যাকর্ষণের গতিপথে এই অবতরণের ফলে দুর্ভাগ্যক্রমে

সদারামের হাঁটু গেল মচ্‌কে। মাটিতে নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই সে চেয়ে বসল তার আফিমের কৌটো। ওর কোটের পকেট হাতড়ে আমি তক্ষুনি কৌটোটা বার করে দিলাম। মন্ত্রপূত দ্রব্যটি ডবল ডোজে ঠেসে নিয়ে সদারাম খালি পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে টেকো মাথাটা নিয়ে দূর পাল্লায় ক্যাম্পের দিকে রওনা হল। জুতো, মোজা, পাগড়ি—কোনোটাই অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া গেল না। একশো হাত দূর থেকে তাঁবুর সামনে যখন অগ্নিকুণ্ড জ্বলতে দেখা গেল, একমাত্র তখনই সদারামের গলায় স্বর ফুটল। ওর গলা শুনে বোঝা গেল, ও খুব ধাঁধায় পড়েছে। আমাকে জিগ্যেস করল, যে প্রাণীটাকে ঝোপের তলা থেকে সে ধাঁ করে বেরিয়ে আসতে দেখেছে সেটা কি সেই বাঘ, যার গায়ে আমি গুলি ছুঁড়েছি?

এতক্ষণ যে স্নায়বিক উত্তেজনায় টান টান হয়ে ছিলাম, সদারামের একটা প্রশ্নে তা থেকে মুক্তি পেয়ে আমি ঢের সহজ হলাম। হোহো করে আমি হাসতে লাগলাম।

জিগ্যেস করলাম, "ছুটন্ত জানোয়ারটার মাথায় শিং দেখেছিলে?"

"হ্যাঁ, তা, দেখেছি বলেই মনে হয়। দেখ কাণ্ড, শিঙের কথাটা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম। হুঁ, এইবার মনে পড়েছে—শিং ছিল বটে। কিন্তু যে জায়গা, বলা যায় না—বাঘও তো স্বচ্ছন্দে হতে পারত।"

"হতে তো পারতই। তবে একটা জিনিস তোমাকে বলে নিই। আমাদের এদিকে বাঘের মাথায় শিং গজায় না, শিঙের কোনো দরকার নেই বলে।"

হাসতে হাসতে পরস্পরের পিছনে লেগে আমরা আমাদের তাঁবুতে পৌঁছে গেলাম। সদারাম এবার তার কৌটো খুলে সর্বার্থসাধক আরও একটা ডবল ডোজ সেঁটে নিল।

৩

চোট-খাওয়া বাঘের খোঁজে আমাকে যেতে হবে—এই ভাবনায় রাত্রে প্রহরের পর প্রহর আমাকে ঠায় জেগে কাটাতে হল। যখনই

একটু তন্দ্রা মতন এসেছে, আমার আর বাঘের মধ্যিখানে নেতিয়ে থাকা কালো অজগরের মত জংলী রাতের অন্ধকার আমার মগজের মধ্যে অমনি রাগে ফুঁসে উঠে আমাকে আচম্‌কা জাগিয়ে দিয়েছে। আর বাঘের স্মৃতিপুরাণগুলো কালনাগের জট খোলার মত করে একে একে আমার মনে পড়ে গেছে।

বহুদিন আগের দেখা একটি দৃশ্য আমার মানসপটে উদয় হল। আমার কাছ থেকে মাত্র পাঁচ ফুট দূরে দাঁড়ানো একটি লোককে আহত বাঘ এসে ঘাড় মট্‌কে দিয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল আমার শৈশবে; কিন্তু সেই ব্যথার দাগ আজও আমার মন থেকে মেলায় নি। চল্লিশোর্ধ্ব বছর পরেও সে কথা মনে পড়লে আমার গায়ে কাঁটা দিযে ওঠে।

১৯১৮ সাল। শীতের মরশুম। আগের দিন সন্ধেবেলায় মড়ি খেতে এসে একটা বাঘ আমার বাবার হাতে জখম হয়েছিল। বাবার হাতে ছিল ৫০০ বোরের এক্সপ্রেস রাইফেল; ৫৭০ গ্রেনের ছুঁচলোমুখ গুলিটা বাঘের পাঁজর যে ভেদ করে গিয়েছিল এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। বুলেটের ৫,৭৫০ ফুট পাউণ্ড ওজনের প্রচণ্ড ধাক্কায় বাঘ একেবারে পপাত ধরণীতলে। মাটিতে পড়ে খানিকক্ষণ আছাড়িপিছাড়ি খাওয়ার পর হুঙ্কার ছেড়ে বাঘ ঠিক্‌রে উঠে রাত্রের ঘনায়মান অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছিল।

বাবার স্থির বিশ্বাস ছিল বাঘটাকে কোথাও মরা অবস্থায় পাওয়া যাবে। পরদিন ভোর হতে না হতেই তিনি বাঘের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। বাবার সঙ্গে গেলাম আমি এবং তাঁর বন্দুকবরদার আর নিহত মোষের মালিকসহ তাবুর আরও তিনজন লোক।

সকাল সাতটা নাগাদ আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম। পাহাড়তলীতে কুয়াশার পুরু গালিচাতে তখনও আরামে গা এলিয়ে আছে শীতের সকাল। সারা রাত হিম পড়ে গাছগুলো ভারী হয়ে আছে

একটি সরু উপত্যকা নল্‌কা। তার পুবধারের পাহাড়ে

জলবিভাজিকার এপারে সেই মাঝবরাবর জায়গাটা পাওয়া গেল যেখানে আগের দিন সন্ধেবেলায় বাঘটাকে গুলি করা হয়েছিল।

সরাসরি না গিয়ে আমরা গেলাম একটু ঘুরপথে। জলবিভাজিকার ওপারে গিয়ে আমরা পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠলাম যাতে সটান ওপর থেকে নেমে ঘটনাস্থলে যেতে পারি। আহত জন্তুর পিছু নেবার সময়—বিশেষত জন্তুটি যদি বিপজ্জনক হয়—এই রকমের সাবধানতা সব সময় বিধেয়। চোটখাওয়া জানোয়ার সাধারণত চড়াই ভেঙে পাহাড়ের ওপরে ওঠে না। যাতে ব্যথার কষ্ট বাড়ে এমন জিনিস তারা পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে।

ঘুরে উল্টোদিক থেকে আমরা পাহাড়ের চুড়োয় উঠলাম। একে অনেকটা পথ, তার ওপর চড়াই ভাঙার কষ্ট; ফলে, আমরা এমন লবেজান হয়েছিলাম যে জায়গামত সব সময় সজাগ থাকার কথাটা আর আমাদের মনে থাকে নি। আমরা ধরে নিয়েছিলাম °৫০০ এক্সপ্রেস বুলেটের চোট বাঘ কিছুতেই সামলাতে পারবে না, সুতরাং সে না মরে পারে না আমাদের অসাবধান হওয়ার এও একটা কারণ ছিল। এতে প্রমাণ হয়, বাঘের শক্তিসামর্থ্য আমরা কমিয়ে দেখেছিলাম। আসলে যদি মোক্ষম জায়গায় না লাগে, তাহলে অমন ডজন ডজন °৫০০ এক্সপ্রেস বুলেটও বাঘ হজম করে ফেলতে পারে। একবার একটি প্রচণ্ড গুলিতে হৃদ্‌যন্ত্র উড়ে যাওয়ার পরেও আহত বাঘের শরীরে এমন তাকত ছিল যে, সে হাতির পিঠে চড়াও হয়ে তার আততায়ীকে মেরে তবে নিজে মরেছিল—এ ঘটনার লিখিত প্রমাণ আছে।

শৈলশিরায় পৌঁছে আঁকাবাঁকা রাস্তায় আমরা পাহাড়ের মাঝবরাবর নেমে এলাম। বাবা ছিলেন সকলের আগে, তাঁর ঠিক পেছনেই ছিল বেচারা তেল—আগের দিন বাঘ যার মোষটাকে মেরেছিল। হাত বিশেক তফাতে আমরা বাকি সবাই পরের পর সার বেঁধে আসছিলাম—আমি ছিলাম সকলের আগে।

প্রায় চল্লিশ হাত বেড়যুক্ত মালসা আকারের একটা ঢালু জায়গায়

এসে পৌঁছুনো গেল। গড়ানে জায়গাটার ঠিক ধারে একটা শাল-গাছ। খুব ঝাঁকড়া এবং খুব লম্বা। তার আওতার একপাশে একটা বাঁশঝাড়। বাবা যখন গাছটার কাছে পৌঁছেছেন—কী ভাগ্যিস্‌ এগোবার জন্যে তখনও তিনি গাছটাকে বেড় দেন নি—গাঁক্‌ করে একটা ছোট্ট তীক্ষ্ণ হুঙ্কারে বাঁশঝাড়টা কেঁপে উঠল।

আমার বাবা ছিলেন শালগাছটার পেছনে। বাকি আমরা সবাই ঘাসের জঙ্গলের আড়ালে। পরক্ষণেই একটা লোক আমার পাশ দিয়ে ছুটে গেল আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার পেছন থেকে দ্রুত ধাবমান একটা হলুদ রেখা ঝিলিক দিয়ে উঠে লোকটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। তখন একটা গুলির তীক্ষ্ণ আওয়াজ পেলাম, তার ঠিক পর পরই আরেকটা আওয়াজ। পোড়া বারুদের ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে এসে লাগল আর ধোঁয়ায় চোখে অন্ধকার দেখলাম।

বাবা কী একটা কথা বললেন আমার বোধগম্য হল না; তাঁর গলার আওয়াজে আমি সংবিৎ ফিরে পেলাম। বাবার কাছাকাছি যাবার জন্যে আমি আমার জায়গা ছেড়ে নড়তেই বাবা চিৎকার করে আবার আমাকে হুঁশিয়ার করে দিলেন—যে যার জায়গা ছেড়ে আমরা যেন কেউ না নড়ি। আমরা যে যেখানে ছিলাম একেবারে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিনিট দশেক পরে বাবা একটু একটু করে এগোতে লেগেন-যেখানে সেই লোকটা আমার খুব কাছে মাটিতে সাষ্টাঙ্গে পড়ে ছিল: আমার জায়গাটায় এসে জন্তুজানোয়ারদের একটা সরু পায়ে-চলা-পথের দিকে বাবা পা বাড়ালেন। যাতায়াতী পথটা গেছে একটা অগভীর খোয়াইয়ের ভেতর দিয়ে। না জানিয়ে আমি তাঁর পিছু নিলাম। আমার দাঁড়াবার জায়গাটা খুব বেশি হলে পাঁচ ছ' ফুট দূরে ইস্‌. তেলুর ক্ষতবিক্ষত দেহটা পড়ে। আর তার ঠিক পাশেই বাঘটা মরে পড়ে রয়েছে।

লোকটার মাথা দু ফাঁক হয়ে আছে। বাঘের থাবার প্রত্যেকটা নখ লোকটার মাথার খুলি ভেদ করে গেছে। ভুরু থেকে কপাল

পেরিয়ে পেছনদিকের ঘাড় পর্যন্ত পরিষ্কার ফালা ফালা করে কাটা। কেউ যেন ধরে ধরে ছুরি দিয়ে চিরেছে। কাঁধের কাছে এমনভাবে কামড়েছে যে, লোকটার বুক আর পিঠ একাকার হয়ে গেছে। দাঁত ফোটানোর জায়গাগুলো হাঁ হয়ে গিয়ে সেখান থেকে ফুসফুসের ভগ্নাংশগুলো বেরিয়ে আসছে আর রক্তের স্রোতে গাঁজলা উঠছে।

দেখে আমার গায়ের ভেতর এমন ঘুলিয়ে উঠল যে, হুড় হুড় করে আমি বমি করে ফেললাম। ফলে, বাবা কটমট করে আমার দিকে তাকালেন।

আট বছর বয়সে বনের রাজার তাকতের সঙ্গে সেই আমার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। প্রথম পরিচয়টা মোটেই সুখের হয় নি।

## ৪

সঙ্গী দুজন ওঠবার আগেই আমি খুব ভোর-ভোর উঠে পড়লাম। উঠে রাইফেলটা আদ্যোপান্ত সাফ করে নিলাম। আমি জানতাম একটা কঠিন শ্রমসাধ্য কাজে হাত দিতে চলেছি। অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে না দিয়ে যতদূর সম্ভব নিজের দখল রাখব।

চোট-খাওয়া বাঘের মত ভয়ঙ্কর জিনিস দুনিয়ায় দুটি নেই। এদেশের বনেজঙ্গলে আরও দুটি ভয়ঙ্কর প্রাণী আছে—হাতি আর মোষ। তারা একবার চোট খেলে আর রক্ষা নেই; তাদের মাথায় এমনভাবে খুন চেপে যাবে যে. ছলেবলেকৌশলে যেভাবেই হোক তারা শোধ তুলে ছাড়বে। কিন্তু যত যাই হোক, মারণ ক্ষমতার দিক দিয়ে এরা কেউই বাঘের নখের যুগ্যিও নয়। এদের দৈহিক স্থূলত্ব আর আক্রমণের পদ্ধতি এমন যে, শিকারী তুখোড় হলে হয়ত আত্মরক্ষার সুযোগ এবং চূড়ান্ত মার দেবার মওকাও মিলে যেতে পারে। কিন্তু চোট-খাওয়া বাঘের বেলায় কোনো জারিজুরি খাটবে না—সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবার মতন তার তখনও রাগ।

আহত বাঘের সন্ধান করবার সাধারণত চারটি পৃথক পদ্ধতি আছে।

এক, শিক্ষিত হাতির পিঠে চড়ে যাওয়া। উপায় হিসেবে এটাই সবচেয়ে নিরাপদ। যেখানে বাঘের সন্ধান করা হবে সেই এলাকাটি কত বড় এবং কি রকম, তার ওপর নির্ভর করবে এ কাজে ক'টা হাতি ব্যবহার করা হবে। সব সময় একটির বেশি হাতি ব্যবহার করা ভালো; কারণ, একা একটি হাতি হলে চরম মুহূর্তে তার ঘাবড়ে যাবার ভয় থেকে যায়।

দুই, জায়গাটাতে এক পাল গরু খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া। ওদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর হওয়ায় বাঘের আস্তানা খুঁজে বার করা সহজ হবে। তাছাড়া বাঘ যদি বিরক্ত হয়ে আক্রমণও করে বসে, তাহলে গরু বেচারাদের ওপরই সে গায়ের ঝাল ঝাড়বে। সেই ফাঁকে গুলিবন্দুকবাজ শিকারী, আসল যে দোষী—সে পার পেয়ে যাবে। তবে এ পন্থায় দুটো মুশকিল আছে। প্রথমত, যে জায়গায় বাঘ আছে সে জায়গায় গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত কাজ। হাওয়া উজানে বইলে বহু দূর থেকে—কখনও কখনও এমন কি আধ মাইল দূর থেকেও—গরুর পাল বাঘের গায়ের গন্ধ পেয়ে যাবে। সে অবস্থায় একসঙ্গে অনেক লোক মিলে জোরসে তাড়া না দিলে ওদের ওমখো একচুলও নড়ানো যাবে না।

এবং দ্বিতীয়ত, বাঘের ডেরার দিকে কেউ যদি ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেও, বাঘের এক হুমকিতেই ওরা হুড়মুড় করে এমন ভাবে পালাবে যে তার ফলে বেশ কিছু লোক হয় ওদের পায়ের খুরের নিচে বিশ্রীভাবে থেঁতলে যাবে নয় ওদের শিঙের গুঁতোয় অক্কা পাবে।

তিন নম্বর পদ্ধতি হল, বাঘের পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া। মাইলের পর মাইল দূর থেকে কুকুরেরা যদি ঘুণাক্ষরেও বাঘের গন্ধ পায়, ল্যাজ গুটিয়ে চোঁ চাঁ দৌড় দেবে। একমাত্র তালিম-দেওয়া সাহসী কুকুরদেরই এ কাজে লাগানো যেতে পারে।

চতুর্থ পদ্ধতি হল, আহত বাঘকে খোঁজার জন্যে সটান তার ডেরায় গিয়ে হানা দেওয়া। এই উপায়টি প্রয়োগ করার সময় যেতে হবে

নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে এবং যথাসম্ভব কম লোক সঙ্গে নিয়ে। সঙ্গী হিসেবে থাকবে বড় জোর দুজন কি তিন জন লোক; নিতে হবে ভালোভাবে যাচাই করে, যারা একটুতে ঘাবড়াবে না। এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করবার জন্যে আবার বলছি, এ কাজে সঙ্গে লোক বেশি থাকলে তাতে সাহায্য তো হয়ই না—বরং ঘাড়ের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়; এ ব্যাপারে যত বেশি খুঁতখুঁতে হওয়া যায়, শিকারে বিপদের সম্ভাবনাও তত কমে।

লুকিয়ে চুরিয়ে শিকার করবার অনেক হ্যাপা। তাই শেষের পদ্ধতিটি বেছে নেওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিল না। অবশ্য বরাবর এই পদ্ধতিই আমার পছন্দ।

সদারামকে আমি তাঁবুতে রেখে গেলাম—ওর মচকানো হাটুর যাতে শুশ্রূষা হয় এবং ও যাতে ওর সর্বার্থসাধক আফিম সেবন করে শরীরমনে বলভরসা পায়। চাকরটাকে সঙ্গে নিলাম: এ জাতীয় কাজে মোটেই সে আনাড়ী নয়। চোট-খাওয়া বাঘের পিছু নেওয়া আমার এই প্রথম নয়। মোটামটি একই রকমের অবস্থার মধ্যে আগেও আমি এ কাজ করেছি। কিন্তু যতবারই এ কাজ হাতে নিয়েছি গলা শুকিয়ে গিয়ে আমার ভয় ভয় করেছে। আমার অথবা আর কারো গুলি ছোঁড়ার দোষ হয়ে থাকলে সব সময় গালমন্দ করেছি—কেননা তার ফলেই তো আমাকে এমন ফ্যাসাদে পড়তে হয়েছে।

আগের দিন সন্ধেবেলায় বাঘ আমাকে তার ল্যাজে খেলাবার বিলক্ষণ সুবিধে পেয়েছে; সুস্থির হয়ে তাক্ করবার বিন্দুমাত্র সুযোগ দেয় নি। আমি ক্ষণিক উত্তেজনাবশে বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিয়েছি মাত্র—কী করছি না করছি সে সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ পাই নি। আমার ক্রিয়াকলাপ হয়েছে আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিবশে। অথবা আমার সেই অর্থহীন মূঢ় আচরণের পিছনে ছিল হয়ত ভয়ের তাড়না। সহজাত যে তাড়নাই হোক, কাজটা যে অর্থহীন মূঢ় হয়েছে—এ বিষয়ে এখন আর আমার সন্দেহ নেই।

ঠাকুমা-ঠান্‌দিদিরা বাঘকে নিয়ে হাঁউ-মাউ-খাঁউ গোছের যে গল্পই বলুন, সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় বাঘ কিন্তু আদতে মহাশয় প্রাণী। আমার তিরিশ বছরের আরণ্যক জীবনে এমন একটি দৃষ্টান্তও আমি দেখিনি, যেখানে বাঘ অকারণে মানুষের ওপর চড়াও হয়েছে। উলুবনে যেই সব্‌ সব্‌ আওয়াজ হয় অমনি বাঘ শুধু যে খোঁজ নিতে যায় তাই নয়, শিকার ধরবার মতলবেও যায়। আওয়াজ উৎপাদনকারী জীবটি যদি ঘাসের আড়ালে গা ঢাকা দেওয়া মানুষ হয়, বাঘ সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে এবং তাকে মেরে ফেলবার পর হয়ত টের পাবে—সে যেটা মেরেছে সেটা তার স্বাভাবিক শিকার নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঘটি যদি মানুষখেকো না হয়—মরা মানুষটাকে ফেলে রেখে ভয়ে চো চোঁ দৌড় দেবে।

আমার এই বাঘটা হাচমকা ধরা পড়ে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু এমন নয় যে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। জঙ্গলের ভেতর পালিয়ে যাবার তার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। আমার দৃঢ় ধারণা, মুখ বিকৃত করে চাইলেও আসলে সে আমার কোনো ক্ষতি করতে চায় নি। দুজনেই দুজনকে দেখে আমরা চমকে গিয়েছিলাম এবং তার মুখবিকৃতিটা ছিল, যত দূর মনে হয়, তার সেই চমকানো ভাবেরই লক্ষণ। আমি নিছক ভয় পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে বন্দুকের গুলি ছুঁড়লাম—তাও ভালোমত তাক্‌ পর্যন্ত না করে।

আগের দিন সন্ধেবেলায় সদারাম যে জায়গায় বনকুলের ঝোপের নিচে হরিণ দেখতে পেয়েছিল, সেই জায়গায় এসে আমার চাকরটাকে বললাম পাথরের টুকরো আর নুড়িতে পকেট আর কাঁধের ঝোলা ভর্তি করে নিতে। আমাদের সামনে তিরিশ গজ এলাকার মধ্যে যত ঝোপঝাড় আছে, ওকে বলে দিলাম প্রত্যেকটা ঝোপঝাড়ে ইট ছুঁড়ে মারতে। বাঘ যদি এই এলাকাটুকুর মধ্যে থাকে তাহলে ঢিল পড়তে দেখলে সে চটেমটে বেরিয়ে আসবে এবং আমি তখন তাকে গুলি করবার আরেকটা সুযোগ পাব—এই ভেবে বন্দুক নিয়ে আমি তৈরি হয়ে থাকলাম। বাঘ এতে অতিষ্ঠ হবে, কিন্তু কে তাকে কোথা

থেকে জ্বালাতন করছে জানতে না পেরে তেড়ে আসতে পারবে না। রাগে গরগর করতে করতে বাঘ তখন আস্তানা বদলাতে গিয়ে হয় আমার বন্দুকের নিশানার মধ্যে এসে যাবে, নয় আমি তার হদিশ পেয়ে যাব।

কিন্তু ঢিল ছুঁড়ে বাঘের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আমরা তখন গুড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে সামনে আরও তিরিশ গজ এলাকা জুড়ে ঢিল ছুঁড়তে লাগলাম। তাতেও কোনো ফলোদয় হল না। ক্রমশ সাবধানে গোটা উপত্যকাটা আমরা চষে ফেললাম। তারপর এসে পড়লাম একেবারে সেই গড়ানে জায়গাটায়—যেখানে আগের দিন সাক্ষাৎ বাঘের সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়েছিল।

খোয়াইয়ের পাড় থেকে বিশ হাত তফাতে একটা গাছ গড়ানে জায়গাটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। আমার লোকটাকে তার ওপর চড়ে বসতে বললাম। যখন দেখলাম গাছের মগডালের ওপর নির্বিঘ্নে ও বেশ জুৎ করে বসেছে, তখন আমি বুকে হেঁটে খোয়াইয়ের পাড়ে চলে গিয়ে ওকে বললাম—এই ঢিল ছুঁড়তে থাকো। ছ'টা আটটা ঢিল ছুঁড়তে না ছুঁড়তেই ওপাশের গড়ানে জায়গাটার নিচে থেকে চাপা গলায় গরর গরর্ আওয়াজ ভেসে এল। আমি আমার জায়গা থেকে পরিষ্কার ঠাহর করতে পারছিলাম বাঘ ঠিক কোথায় বসে গাঁইগুঁই করছে। কিন্তু খোদ মালিককে দেখতে পাচ্ছিলাম না।

যে জায়গা থেকে আমি প্রথম গুলিটা চালিয়েছিলাম, সেখান থেকে বাঘের ডেরা হাত চল্লিশকে দূরে। আমার গুলিতে বাঘ যে গুরুতরভাবে জখম হয়েছে, সে বিষয়ে আমি নিঃসংশয় হলাম; কেননা তা নাহলে এতক্ষণে সে বহুদূরে চলে যেত—অন্তত প্রায় সিকি মাইল দূরে সবচেয়ে কাছের জলের জায়গায় তো যেতই।

আমার লোকটিও বাঘের ডাক শুনতে পেয়ে কেল্লা মার দিয়ার ভঙ্গিতে হাসি হাসি মুখ করে ইশারায় জায়গাটা দেখিয়ে দিল। যখন দেখল আমি একেবারে চোখকান খাড়া করে তৈরি হয়ে আছি, তখন বেশ টিপ করে করে, ঘাসের যে ঝোপে বাঘ গা ঢাকা দিয়ে ছিল,

সেখানে টপাটপ কয়েকটা ঢিল ছুঁড়ল। গোটা কয়েক ঢিল বাঘের গায়ে লেগে থাকবে—এবার শোনা গেল তার ভয়ঙ্কর হুঙ্কার। আমার মনে হল, তার আওয়াজে আমার বুটের নিচেকার মাটি যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

যারা বাঘ দেখেছে, শুধু চিড়িয়াখানায় আর সার্কাসে, যারা কখনও ক্রুদ্ধ বাঘ-রাজার বাজখাঁই গর্জন শোনে নি—তারা কখনই ধারণা করতে পারবে না সে একটা কী হৃদ্‌কম্পজাগানো ভয়াবহ ব্যাপার।

খোয়াইয়ের পাড়ে একটা শিয়ালের আড়ালে বাঘ তখনও লুকিয়ে থেকে ক্রমাগত গজরাচ্ছে আর চারদিকের ঘাসের ওপর ল্যাজের বাড়ি মারছে।

একেকটি মুহূর্ত যাচ্ছে আর আমার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে। আমি ঠিক করেছিলাম বাঘের মুণ্ডু কিংবা কলিজার দিকটা স্পষ্টাস্পষ্টি যতক্ষণ না দেখতে পাচ্ছি, ততক্ষণ কিছুতেই গুলি ছুঁড়ব না। কিন্তু দেখে মনে হল ওদিকে বাঘও যেন আমার অভিরুচি অনুযায়ী তার গুপ্তস্থান ছেড়ে আসতে এবং তার শরীরের মোক্ষম জায়গাগুলো মেলে ধরে আমাকে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করতে দিতে রাজী নয়। এদিকে আমার চাকরটিও যেন বাঘের ইচ্ছেমত নিজের মন বেঁধে নিয়েছে। কেননা সেও ওদিকে ঢিল ছোঁড়া বন্ধ করেছে। আমি এখন কী করি।

এদিক ওদিক তাকালাম—কোথাও পাথরের টুকরো পড়ে আছে কিনা। কোথাও কিছু নেই। মাটির একটা ঢেলা পর্যন্ত নয়। আমার লোকটিকে ইশারা করব বলে গাছের দিকে মুখ তুলে তাকালাম। কিন্তু গজরানো বাঘের দিকে তাকিয়ে লোকটা এমন সম্মোহিত হয়ে আছে যে, আমার পক্ষে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হল না।

বাঘের মুহুর্মুহু গর্জনে এমন অস্থির হয়ে উঠেছিলাম যে, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। আমার পক্ষে আর কিছুতেই চুপ করে বসে

থাকা সম্ভব হল না। পকেট থেকে একটা ফালতু কার্তুজ বার করে নিজেকে পুরোপুরি গোপন রেখে আমি আধা-গোপন বাঘটার দিকে ছুঁড়ে মারলাম। কার্তুজটা শক্ত জায়গায় পড়ে খট্ করে আওয়াজ হল। বাঘটা ক্ষেপে গিয়ে তক্ষুনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের অর্ধপঙ্গু শরীরটা ঘাসবনের ভেতর থেকে টেনে হেঁচড়ে বার করে আনল। আমি তার মুণ্ডুটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। হাত তিরিশেক দূর থেকে আমার হাতের বন্দুক গর্জে উঠল। সাহস হারিয়ে যাকে আমি জখম করেছিলাম, কষ্টের হাত থেকে এতক্ষণে সে মুক্তি পেল।

আমার আগের গুলিটা—তামার পাতে মোড়া ৩০০ গ্রেনের ধাতুপিণ্ড—বাঘের বুকের সামান্য নিচে ইঞ্চি দুই ডাইনে বিঁধেছিল। গুলিটা তার কাঁধের হাড় সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দিয়ে সটান তার অন্ত্রে গিয়ে ঘা দিয়েছিল। তার জন্যে বেচারা উঠে দাঁড়াতে এবং খানিকটা পথও হাঁটতে অপারগ হয়ে পড়েছিল।

সদ্য যৌবনে-পা-দেওয়া বাঘটা বড় সুন্দর দেখতে ছিল। তার গায়ে ছিল পুরু পশমের ওপর ফ্যাকাশে কালোয় আর ম্যাড়মেড়ে সোনার জলে ছাপানো ভাঙা ভাঙা ডোরাকাটা দাগ।

বয়সের তুলনায় বেশ বড়সড়। মেপে দেখা গেল, আপাদমস্তক দৈর্ঘ্যে সে ন' ফুট আট ইঞ্চি।

# দিগম্বর

ও যখন এইটুকু, তখন ওকে প্রথম দেখি। ওর তখন বছরখানেক বয়েস। সাইজে ঠিক একটা ছোট টেরিয়ার। তিড়িং বিড়িং করে লাফায়। আমি তো প্রথম দর্শনেই ওকে দেখে মজে গেলাম। আরও ওর ন্যালাক্ষ্যাপা স্বভাবের জন্য ওকে আমার অত ভালো লেগেছিল—বোধহয় আমরা দুজনেই একগোত্রের বলে।

সে আজ বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমি তখন তরাইয়ের ভাবর এলাকায় কালাগড় ফরেস্ট ডিভিশন চুঁড়ে বেড়াচ্ছি এক স্বভাবদুর্বৃত্ত গরুখেকোকে গাঁথবার চেষ্টায়।

শয়তান জানোয়ারটা পুরো তিন বছর ধরে আমাকে কেবলি ঘোল খাইয়েছে। ওর দৌলতে জঙ্গলের গলিঘুঁজি ঘাঁতঘোঁত সমস্তই আমার জানা হয়ে গেছে। ওর জন্যে একবার আমাকে গোটা শীতের রাত গাছের মগডালে উঠে বসে থাকতে হয়েছিল; আমাকে ভড়কি দিয়ে শেষ অবধি সটকে পড়েছিল; শেষটায় ঝোপের মধ্যে শম্বর ভেবে ওকে একজন গুলি করেছিল, তাতেই ও মারা যায়। সে সব অন্য গল্প। এই ক্ষুদে নাড়াবুনের জীবনের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই।

শিশু ভোলানাথটিকে আমি প্রথম দেখি পোখরাওয়ের সোঁতায়। কুমায়ুন পর্বতমালার দক্ষিণ শিয়র থেকে যেসব মরশুমী জলধারা তরাই এলাকার পাহাড়তলীর বনভূমিতে এসে কাটাকুটি করে, এ সোঁতা তারই একটি। হিমালয়ের একেবারে দক্ষিণের বৃক্ষবহুল এই অরণ্যানী নিম্ন নেপাল আর আসামের ভেতর দিয়ে প্রায় দেড় হাজার মাইল জুড়ে ব্রহ্মদেশে গিয়ে ঠেকেছে। এই বিরাট এলাকা বন্য প্রকৃতির নিরন্তর বাধাবন্ধহীন লীলাক্ষেত্র। পশ্চিম হিমালয়ের সন্নিহিত অঞ্চল এর সঙ্গে জুড়লে—সেও আবার আকাশ্মীর নিরবচ্ছিন্ন

বন, উপবন, উপত্যকায় ছড়াছড়ি—এলাকাটি দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মাইলে গিয়ে দাঁড়াবে। একবার ভেবে দেখুন, কী বিরাট আকার। এইসব জঙ্গল, বিশেষত পুবদিকের বনাঞ্চল, দুনিয়ার সেরা শিকারের জায়গা। আর এই হল বনের রাজা ব্যাঘ্রকুলের সবচেয়ে যথাযোগ্য ডেরা।

আগে যে গরুখেকোর কথা বলেছি, তার জন্যে একদিন বিকেলে আমি পোখরাওয়ের সোঁতার ধারে বসে আছি। যেখানে আমি ঘাপটি মেরে রয়েছি, তার মাইল দুই তফাতে পাহাড়তলী অবধি উত্তরে লম্বালম্বি যে জঙ্গল—সোঁতাটি সেই জঙ্গলের ভেতর থেকে সদ্য ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে।

তখনও ছ'টা বাজে নি। হিমালয়ের পশ্চিম কিনারার কাছে তখনও জ্বল জ্বল করছে অস্তগামী সূর্য। উত্তরের সান্ধ্য হাওয়া সবে আড়ামোড়া ভাঙতে শুরু করেছে। পেছনে নিষ্পত্রপল্লব একটা রোগা লিকলিকে জরাজীর্ণ গাছ। পাহাড়ের খাদ থেকে হাওয়া উঠে গাছটির ধূসর অস্থিপঞ্জরে যেন ছড় টেনে টেনে সুচির হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাসের বিষণ্ণ সুর বাজিয়ে তুলছে। এ এক আলাদা রকমের উত্তুরে হাওয়া—শুধু পাহাড়তলীতেই এ হাওয়া বইতে দেখা যায়। এর স্থানীয় নাম 'ঢাড়ু'। সূর্যও অস্ত যায় আর অমনি এই হাওয়াও শুরু হয়। প্রথমে থেকে থেকে দমকা হাওয়া, তারপর ক্রমশ বেগ বাড়তে বাড়তে দেখা দেয় প্রচণ্ড ঘূর্ণীঝড়।

একটা কম্বল পাট করে তার ওপর আমি আয়েস করে বসবার ব্যবস্থা করেছিলাম। মাটিতে একটা ভাঙা ডাল পুঁতে আমার ৫৭০ কর্ডাইট দো-নলা রিগ্‌বি রাইফেলটা ঠেকো দেবার ব্যবস্থা করেছিলাম। এপাশে ওপাশে অথবা হাতে না রেখে নিজের সামনাসামনি এইভাবে কিছুর ওপর ঠেকো দিয়ে রাইফেল রাখলে শুধু যে আরামে বসা যায় আর বিপদের আশঙ্কা ঢের কম থাকে তাই নয়—দরকারের সময় প্রায় নিঃশব্দে আপনি আপনার রাইফেল কাঁধে তুলে নিতে পারবেন।

যে দুচারটে ফাঁক ছিল, পাতা দিয়ে ঢেকেঢুকে নিলাম যাতে আমাকে দেখা না যায়; একটা দুটো পাতা ছিঁড়ে চোখের অন্তরাল সরিয়ে দিলাম। জলের বোতল আর বাড়তি গুলিগুলো এমন জায়গায় রেখে দিলাম যেন হাত বাড়ালেই পাই। সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে যখন সবে গ্যাট হয়ে বসেছি, তখন কোথাও কিছু নেই হঠাৎ সেই স্রোতস্বিনীর বাঁকের মুখে আবছা আলোয় হুস্ করে ভেসে উঠল এক পাল বুনো হাতি।

হাত আশী আমার তফাতে হাতির পাল। ওরা এমুখো আসছে না। খাত পেরিয়ে যাচ্ছে। হাওয়া বইছে ওদের দিক থেকে আমার দিকে। হাতিদের নজর চলে বেজায় কম. কিন্তু তাদের নাকও যেমন ধারালো. কানও তেমনি প্রখর। কিন্তু ওদের দিক থেকে জোরালো হাওয়া থাকায়, ওদের নাকে আমার গন্ধ যাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ছিল না বললেই চলে।

শুকনো খাতের ভেতর দিয়ে ওরা সটান ওপারের বাঁকের কাছে উলুবনে ঢাকা জলের গর্তের দিকে ধেয়ে চলেছিল। বাঁকের কাছ থেকে ওরা না আমার গন্ধ পাচ্ছে, না পাচ্ছে দেখতে। আমি কিন্তু ঝোপের আড়ালে নিজে লুকিয়ে থেকে দিব্যি অবাধে একেবারে সামনাসামনি ওদের শ্রীমুখগুলো দর্শন করতে পারছি।

সত্যি, সে এক অপরূপ দৃশ্য। পশ্চাৎপটে রজতপাংশু পাহাড়ের কোলে গাঢ় ধূসর অরণ্য। অসংখ্য পাখিপাখালি আর কীটপতঙ্গের কূজনেগুঞ্জনে মুখরিত সন্ধ্যার অতলস্পর্শী স্তব্ধতা। আর তার পুরোভাগে বুনো হাতির দল বিনা দৃকপাতে নির্বিকারভাবে জলে দাঁড়িয়ে এ ওর গায়ে জলকাদা ছুঁড়ছে।

হাতিরা জল ছেড়ে উঠছিল না। ওদের শৌচকর্ম আর ফষ্টিনষ্টি দেখতে দেখতে আমি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল, আমার হাঁটুর কাছে খুব আলতোভাবে একটা কিছু বাইরে থেকে ঢুঁ মারছে। আমি বসেছিলাম বাবু হয়ে, ভাঁজ-করা একটা পাতলা কম্বলে পা দুটো ঢেকে। আড়চোখে মাটির দিকে তাকাতেই তো

আমার চক্ষু চড়কগাছ! আমার বিছানো কম্বলের ওপর হিলহিল করতে করতে ইয়া বড় এক কালো কেউটে সাপ তার ফণা তুলে হাঁটু বেয়ে উঠছে। সাপ আর সাপের স্বভাব নিয়ে আমি অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছি; আমি জানতাম এ অবস্থায় সাপের করাল গ্রাস থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হল একেবারে মড়ার মত স্থির নিশ্চল হয়ে বসে থাকা। বিন্দুমাত্র নড়েছি কি, সাপ আচমকা ঘাবড়ে গিয়ে আত্মরক্ষার সহজাত তাড়নায় সঙ্গে সঙ্গে ছোবল বসাবে।

সর্পকুলের নিখুঁত দেহরেখার মসৃণ সৌন্দর্য, রঙের সুষমা আর সুললিত সাবলীলতার আমি বরাবরই ভক্ত। তবে বরাবরই সসম্ভ্রমে দূর থেকে। এটি আমার এতই গায়ের কাছে যে, না পাচ্ছিলাম সোয়াস্তি আর না পারছিলাম মুগ্ধ হতে। আমার স্থির বিশ্বাস, স্বয়ং ডি. এইচ. লরেন্সকেও যদি আমার মত সাপ কোলে নিয়ে বসে থাকতে হত, তাহলে সাপের ওপর অমন সুন্দর কবিতা লেখার বদলে শুধু একটি কথাই তাঁর হাত দিয়ে বার হত। আমার মনে হল, কী একটা হিলহিলে জিনিস আমার শিরা বেয়ে যেন উঠছে আর আমার স্নায়ুগুলো কেমন যেন অসাড় হয়ে আসছে।

সেই সাপ তার সমস্ত শরীরটা—দশ ফুট ?—আমার হাঁটুমোড়া পা দুটোর ওপর দিয়ে খুব ঠায় অতি সন্তর্পণে সর্ সর করে টেনে নিয়ে চলে গেল।

কয়েকটা মুহূর্ত যেন কয়েকটা যুগ। অনেকক্ষণ পর অনুভব করলাম আমার পায়ের ওপর আর কোনো ভার নেই, ঘর্ষণজনিত কোনো অনুভূতিও নেই। কিছুতেই চোখ খুলে তাকাতে ভরসা হচ্ছিল না। হয়ত আমার পায়ে কোনো সাড নেই; মগজটাই বোধহয় অসাড় হয়ে গেছে, যার জন্যে আমার স্পর্শবোধও আর নেই। আমি একেবারে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। কতক্ষণ ধরে যে দাঁতে দাঁত দিয়ে চোখ বুঁজে ছিলাম খেয়াল নেই। হয়ত মিনিট কয়েক। কে বলবে? মন তখন চরকির মত ঘুরছে। শেষকালে যখন চোখের মণিদুটোর পেছনে ছুঁচ ফুটতে লাগল আর বন্ধ চোখের

পাভাতুটো টনটন করতে লাগল, তখন আর চোখ না খুলে পারলাম না। সাপ তখন আমার ধারে বাতাসে কোথাও নেই। ঘামের বড় বড় ফোঁটা টপ টপ করে আমার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

২

হাতির পাল জল ছেড়ে উঠে এখন ওপারে। পশ্চিমপাড়ের কাছাকাছি এক প্রকাণ্ড বাঁশবনের দিকে তারা চলেছে। এই বাঁশঝোপ একেবারে মাইলের পর মাইল চলে গিয়ে উত্তরদিকে পাহাড়ের গায়ে উঠে গেছে; সেখানে দুর্ভেদ্য ঘন বাঁশের জঙ্গল আর প্রকৃতির একটানা সবুজ তৃণোদ্যান। হাতির পাল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গাছের ডালপালা ভেঙে উদরস্থ করতে করতে চলেছে। এখানে বসে থেকে আমি তার আওয়াজ পাচ্ছি। মড় মড় করে ভাঙছে গাছ, মট মট করে ভাঙছে ডাল; খুশিতে ডগমগী তাদের হুড়মুড় হুড়মুড় আওয়াজ আর বৃংহিত নাদ মাইলের পর মাইল দূর থেকেও শোনা যায়। জঙ্গলে যখন এই তোলপাড় কাণ্ড চলে, তখন তার খুব কাছাকাছি বাঘ বড় একটা থাকে না। আমি যতটা দেখেছি, তাতে জঙ্গলের দুই চাঁই—বাঘ আর হাতি—যে যার নিজের দিক থেকে তারা অনাক্রমণীয় হওয়ায় সচরাচর কেউ কারো রাস্তা মাড়ায় না। তারা পরস্পরকে সসম্ভ্রমে দূরে দূরে রাখে।

কখনও কখনও এর ব্যতিক্রমও ঘটে। কেন এবং কি অবস্থায় বাঘ হাতির ওপর চড়াও হয়, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে আমি ঢোলখণ্ড সোঁতায় একটি ঘটনার কথা জানি; সেখানে একটা বাঘ একটা বাচ্চা হাতিকে মেরে ফেলেছিল। আরেকবার হয়েছিল কি, আমি তখন মোড়ঘাটি ফরেস্টের রেস্টহাউসে আছি—গাঁক গাঁক করে একটা বাঘ পেছন পেছন ঊর্ধ্বশ্বাসে তেড়ে আসায় একটা গোটা হাতির পাল মাঝরাত্তিরে এসে রেস্টহাউসের উঠোনে আশ্রয় নেয়।

এ তো গেল আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা। এ ছাড়া চল্লিশের

কোঠার গোড়ার দিকে এদেশের পত্রপত্রিকায় খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে যার বিবরণ বেরিয়েছিল, সেও খুব বিখ্যাত ঘটনা। জিম করবেট এ ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'জাঙ্গ্‌ল্ লোর' বইতে। তরাইয়ের ভাবর অঞ্চলে টনকপুরের কাছে হাতির সঙ্গে বাঘদের লড়াইতে হাতিটা মারা যায়, এই হল ঘটনা। টনকপুরের দুই জেলে দিনের শেষে ঘরে ফির'ছিল। তারা এই লড়াইয়ের প্রত্যক্ষদর্শী। জেলে দুটি ঘন উলুবনের ভেতর দিয়ে এসে শেষ নালাটা পেরিয়ে উঁচু পাড়ের ওপর উঠবে। এমন সময় দেখে নালাটার ঠিক ওপারে একজোড়া বাঘ। নালাটা সে জায়গায় গজ চল্লিশ চওড়া। যে'দিকে বাঘ দাঁড়িয়ে, সেইদিক দিয়েই তাদের বাড়ি যাওয়ার রাস্তা। সুতরাং ঝোপের মধ্যে তাদের লুকিয়ে পড়তে হল। বাঘদুটো চলে যাক, তারপর তারা বাড়ির পথে হাঁটা দেবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই উলুবনের ভেতরে কী একটা যেন নড়ে চড়ে উঠল। তারপরই নালাটার এপারে একটা দাঁতাল হাতির দর্শন পাওয়া গেল। টনকপুর জঙ্গলের এই দাঁতাল হাতির কথা সবাই জানত; সারা অঞ্চলেই তার নামে ঢি ঢি পড়ে গিয়েছিল। এইতো অল্প কিছুদিন আগেই হাতিটা ফরেস্ট বাংলোর খুঁটিগুলো উপড়ে দিয়ে বাংলোটাকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে নালার কাছে এসে ওপারে বাঘদুটোকে দেখে হাতিটা শুঁড় তুলে ফোঁসফাঁস শুরু করে দিল। তারপর বাঘদুটোর দিকে এগিয়ে গেল। বাঘদুটো হাতির দিকে ফিরে রুখে দাঁড়াল। কাছে আসতেই একটি বাঘ থাবা উচিয়ে হাতিটাকে ভড়কি দিল আর অন্য বাঘটা পেছনে ঘুরে গিয়ে হাতির পিঠের ওপর লাফিয়ে পড়ল। হাতিটা তখন এক ঝট্‌কা মেরে শুঁড় দিয়ে তার পিঠে-চড়া বাঘটাকে পাকড়াও করার চেষ্টা করল। সেই ফাঁকে সামনের বাঘটা লাফিয়ে তার মাথায় চড়ে বসল। ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে ক্রোধোন্মত্ত হাতির হুঙ্কার আর বাঘদুটোও তখন গলা সপ্তমে চড়িয়ে গজরাচ্ছে। জেলে দুজন তো জাল-টাল ফেলে সোজা টনকপুরের

দিকে দে-দৌড়। লোকে বলে, তাদের নাকি এমন কাপড়ে চোপড়ে হয়ে গিয়েছিল যে, বাড়ি পৌঁছে গোড়াতেই এত বড় একটা খবর দেবার মত অবস্থা ছিল না—আগে তাদের ছুটতে হয়েছিল নিজেদের সামলাতে।

টনকপুরের লোকজনেরা প্রথম যখন লড়াইয়ের হাঁকডাক শুনতে পায়, ঘরে ঘরে তখন সবে বিকেলের রান্নাবান্নার যোগাড় চলেছে। তার খানিক পরেই জেলে দুজন এসে খবর দেয় যে, দুটি বাঘ আর একটি হাতিতে যুদ্ধ হচ্ছে; যাদের মধ্যে ভয়ডর একটু কম, তারা বাঁধের ধারে ছুটে গেল লড়াই দেখতে। যখন দেখা গেল, ঝটাপটি করতে করতে বাঘ আর হাতিতে তাদেরই দিকে সরে আসছে, তখন তারা হুড়মুড় করে পরিত্রাহি ছুট লাগাল। দেখতে দেখতে টনকপুরের প্রত্যেকটা বাড়ির দরজায় খিল পড়ে গেল। যেখানে বাঘে হাতিতে লড়াই হচ্ছিল, তার ঠিক ওপরে উঁচু পাড়ে ছিল এক অবসরপ্রাপ্ত ভদ্রলোক মিস্টার ম্যাথেসনের বাংলো। তাঁর বক্তব্য, লড়াই চলেছিল কয়েক ঘণ্টা ধরে। পুলিশ আর স্থানীয় লোকজন সারা রাত ধরে সমানে গুলির আওয়াজ করে; যাতে ভয় পেয়ে ওরা লড়াই থামিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু লড়াইয়ের ঝোঁকে ওরা সে সব কানেই তোলে নি।

সকাল হলে, টনকপুরের লোকজনেরা ঢিবির দিকে দল বেঁধে গিয়ে দেখে, একশো ফুট নিচে পাথরভর্তি সোঁতার ধারে হাতিটা মরে পড়ে আছে। ও অঞ্চলের রাজস্ব অফিসারের বিবরণে জানা যায়, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ক্ষরণের ফলে হাতির মৃত্যু হয়। হাতির শরীরের কোনো অংশই বাঘদুটি ছিঁড়ে খায় নি এবং সে সময়ে অথবা তারপরে টনকপুরের ধারেকাছে কোথাও কোনো মৃত বা আহত বাঘের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

দুটির মধ্যে একটি ছিল বাঘ, আরেকটি বাঘিনী। যে বিরাট মদ্দা হাতিকে তারা মেরেছিল, তার দুটো দাঁতের ওজনই নব্বই পাউণ্ড, অর্থাৎ মণখানেক। হাতিটা রাস্তা থেকে জোর করে তাদের

ভাগাবার চেষ্টা করে; তারই ফলে লড়াই বাধে। বাঘদুটো বেশ কৌশল খাটিয়ে হাতিটাকে কাবু করে। একটি বাঘ তার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে, সেই সুযোগে অন্য বাঘটি হাতির মাথার ওপর লাফিয়ে উঠে থাবা মেরে চোখ তুলে নেয়। হাতি তখন অন্ধ হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে করতে উঁচু পাড়ে চলে আসে। গোল গোল আলগা পাথরে পা রাখার জায়গা না পেয়ে তার আর নড়াচড়ার উপায় থাকে না। দুই বাঘ তখন তাকে সম্পূর্ণ মুঠোর মধ্যে পেয়ে ঘাড়ের ওপর প্রাণপণে দাঁত বসিয়ে দেয়।

তবে এমন ঘটনা খুবই কম ঘটে। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় বাঘ আর হাতি দুপক্ষেরই জানা আছে দুপক্ষের শক্তিসামর্থ্যের খবর. অনেকটা সেইজন্যেই তারা পরস্পরকে সযত্নে এড়িয়ে চলে—কেউ কাউকে ঘাঁটায না।

হাতির পাল যতক্ষণ কাছেপিঠে রয়েছে, ততক্ষণ বাঘ আদৌ এদিক মাড়াবে না—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম বলে ঠিক করলাম আজ এখানেই ইতি টানা যাক। কিন্তু হাতির পাল এত কাছে খাওয়ায় ব্যস্ত যে, এ সময় উঠে যেতে ভরসা পাচ্ছিলাম না, ওদের কাড়ানাকাড়ায় কানে তালা ধরাবার আমার বিন্দুমাত্র অভিরুচি ছিল না।

হঠাৎ গোটা বন এলাকায় একটা থমথমে ভাব নেমে এল। হাতিদের হুড়মাতুনি আর ডালভাঙার মড়মড় আওয়াজ থেমে গিয়ে এক অস্বস্তিকর স্তব্ধতা দেখা দিল। যেদিকে হাতির পাল, সেইদিক থেকে আচমকা একটা অদ্ভুত ধাতব আওয়াজ ভেসে এল। আওয়াজটা আমার চেনা। হাতিরা মাটিতে শুঁড় আছড়ে যখন ফোঁতফোঁত করে, তখন এই রকম শব্দ হয়। ওরা সাধারণত বাঘ দেখলে এই রকম আওয়াজ করে।

বলতে না বলতে বাঘের গর্জনে সারা বন কেঁপে উঠল। এই বাঘের ডাক—এর এক অদ্ভুত আওয়াজ। আওয়াজটা এমন নিটোল,

বাজখাঁই আর ভরাট যে, ঠিক কোথা থেকে আসছে নির্দিষ্ট করে বলা প্রায় অসম্ভব। কোন্ দিক, সেটা আওয়াজ শুনে যদিও বা ধরা যায়, জায়গাটা ঠিক করে বলা সম্ভবই নয়। আপনার কাছ থেকে দশ কি একশো গজ দূর থেকেও যদি বাঘ ডাকে, গলার বিস্তারে কোনো তারতম্য বুঝতে পারবেন না। ভয়চকিত জানোয়ারের দল বিপদ ঠিক কোন্ দিকে বা কত দূরে বুঝতে না পেরে যে যেদিকে পারে হুড়মুড় করে ছোটে। এইভাবে পালাতে গিয়ে তাদের কেউ কেউ প্রায়ই সটান্ বাঘের মুখে পড়ে।

বাঘ আবার ডেকে উঠল। এবার তার গর্জন পাহাড়ের কাছাকাছি প্রতিধ্বনিত হল। তারপর পাঁচ ছ' মিনিট অন্তর অন্তর তার হুঙ্কার শোনা যেতে লাগল। প্রত্যেক বারই আওয়াজ শুনে মনে হল বাঘ বোধহয় উত্তর পুবদিকে যাচ্ছে। তার মানে, হাতির পাল সোঁতা বরাবর আমার আশ্রয়স্থলের দিকে নেমে আসায় বাঘটা বিরক্ত হয়েছে। সে এখন বিপরীত দিকে তার ঘাঁটির অদূরে পাহাড়ের সমান্তরাল পথ ধরে চলেছে। মনে মনে হাতির পালকে গালাগাল তো দিলামই, সেইসঙ্গে নিজের ভাগ্যকেও দুষলাম। গরুচোর বাঘটার বরাত ভালো বলতে হবে; ওর পেছনে ঘুরে আমার এ পর্যন্ত কম দিন নষ্ট হয় নি। মনে মনে আজকের দিনটাও আমার পক্ষে আরও একটা অপয়া দিন হিসেবেই আমি গণ্য করলাম।

হাতিগুলো আমার রাস্তা ছেড়ে বনের আরেকটু ভেতর দিকে ঢুকে গেলেই আমি ওদের নজর এড়িয়ে ক্যাম্পে ফিরে যাব—এই ভেবে আমি অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু বাঘ রয়েছে জেনে তারা জায়গা ছেড়ে নড়তে পারছিল না; ফলে তাদের জন্যে আমিও ঠাঁইনাড়া হতে পারছিলাম না। তখন রাত আটটা বেজে গেছে; হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তে মাথার ওপর চাঁদ উঠে দূরবিস্তৃত ছায়ার জালটাকে গুটিয়ে এনেছে। হাওয়ার সাঁই-সাঁই আর হাতিদের কাড়ানাকাড়ার পর নেমে আসা ক্ষীণ নৈঃশব্দ্যের যবনিকাকে সমানে ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছে

হুতোম-প্যাঁচার একঘেয়ে ভুতভুত্তুম আওয়াজ। কাছেই একটা গাছে কাঠঠোকরার সূচীতীক্ষ্ণ ঠক্ঠক্ আওয়াজ ধ্যানমগ্ন অরণ্যের সহস্র তরুতলে জ্যোৎস্নায় ছিন্নভিন্ন উলিঢুলি অন্ধকারকে এফোঁড় ওফোঁড় করছিল।

হঠাৎ একটা শম্বরের ভয়-পাওয়া ডাক শোনা গেল; আমার পেছনদিকে জঙ্গলের উত্তর-পুব কোণ থেকে তার ট্যাঁক-ট্যাঁক আওযাজ ভেসে এল। জঙ্গলের সমস্ত প্রাণীর কাছে এটা বিপদ্-জ্ঞাপক ধ্বনি; তবু আমি ওতে খুব গুরুত্ব দিলাম না।

শম্বরটা এরপর ক্রমশ ঘন ঘন পরিত্রাহি ডাকতে শুরু করে দিল। ক্রমশ চিতলের দলও অস্থিরভাবে ট্যাঁউ-ট্যাঁউ করে তার পোঁ ধরল। কাছেই একটা জংলা শেয়াল ঘ্যাঁষঘেঁষে গলায় হাঃ-হাঃ করে ডেকে উঠল এবং তার পরক্ষণেই ভয়-পাওয়া একপাল বনশুয়োর সোঁতার মধ্যে ছুটে পালাল।

শুয়োরের পাল ছায়া-ঢাকা জায়গাটা থেকে চটপট সরে গিয়ে সোঁতার মাঝখানটায় গিয়ে আশ্রয় নিল—যেখানে খোলামেলার মধ্যে যথেষ্ট চাঁদের আলো। ওরা আপনা থেকেই বুঝেছিল—ঝোপঝাড়ের ভেতর, যেখানে উঁচু পাড়ের ছায়া পড়েছে সে জায়গায় কিংবা সোঁতার বাঁকের মুখের কাছাকাছি থাকাটা নিরাপদ নয়। কাজেই সেইসব জায়গা এড়িয়ে সোঁতার মাঝবরাবর চাঁদনির আলোয় আলোয় তারা ক্ষেতখামারের দিকে ছুটতে লাগল। ওরা যদিও হাওয়ার বিপক্ষে ছুটছিল, তবুও প্রায় গজ তিরিশ দূর থেকে ওরা টোপ হিসেবে রাখা আমার মোষটার গায়ের গন্ধ টের পেয়েছিল। ছায়াঢাকা জায়গায় ঘাসের আড়ালে মোষটা স্থির নিশ্চল হয়ে বসে ছিল—তার সামনে ঠিক তার গায়ের রঙের সঙ্গে মিশ খাওয়া একটা পাথর খাড়া হয়ে ছিল; সুতরাং মোষটাকে দেখতে পাওয়া তাদের সম্ভবপর ছিল না। ওরা বোধহয় ওদের তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি দিয়ে বুঝেছিল, ধারেকাছে কোথাও তাদের অজানা কোনো অ-জংলী জানোয়ার আছে; হয়ত দুপেয়ে জঘন্য প্রাণীটার কথাও তারা জেনে

গিয়েছিল। যেতে যেতে তারা একটু থমকে দাঁড়াল, তারপর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে তীরবেগে ছুটতে লাগল। একেবারে তালে তালে পা ফেলে সার বেঁধে ওদের ছুটতে দেখে আমার যা মজা লাগছিল। যেন কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছে একদল ঘোরসওয়ার। কচ্ছিত খর্বপদ এই জানোয়ারগুলোর দ্রুত গতি, শৃঙ্খলা আর নিয়মানুগত্য দেখে আমি সেদিন মনে মনে তাদের সেলাম জানিয়েছিলাম।

এও আমার খুব অবাক লাগল যে, বাঘের ডাক গোটা জঙ্গলের বাসিন্দাদের ওপর যেন কী একটা মন্ত্র পড়ে দিয়েছে। হতচকিত হয়েও তারা অদৃশ্য বিপদ সম্পর্কে খুব হুঁশিয়ার থেকে মধ্যে মধ্যে—এখান থেকে ও, ওখান থেকে সে—এমনিভাবে পালাক্রমে যে যার নিজের নিজের ভাষায় বিপদের সঙ্কেত করছে।

পালাক্রমে এই বিপদ্‌জ্ঞাপক ধ্বনির মাঝখানে আমার পিছনে বাঁদিকে একটা খশ্‌ খশ্‌ আওয়াজ পেলাম। আবারও একবার আমার গোপন আস্তানার খুব কাছে—বলতে গেলে এবার ছ হাত দূরেও নয়—খশ্‌ খশ্‌ আওয়াজটা যখন এগিয়ে এল, তখন কেমন যেন একটু ধাঁধায় পড়ে গেলাম: কী হতে পারে? খানিকটা এদিক ওদিক করে গয়ংগচ্ছভাবে ফিরে চলে গেল। লম্বা লম্বা ঘাসের ঘন জঙ্গলের ভেতর জিনিসটা কী ঠাহর করতে পারলাম না। শুয়োর বা ভালুক যে নয়, সে বিষয়ে আমার কোনোই সন্দেহ ছিল না। কী তাহলে? শজারু কি? হবেও বা।

আবার সেই খশ্‌ খশ্‌ শব্দ। এবার সোঁতার পাড়ের দিকে এগোচ্ছে। আমি আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি; কতক্ষণে পাড় বেয়ে নামে; খোলা জায়গাটায় গিয়ে পড়লেই তখন আমার নজরে আসবে। পাড়ের কাছে যেখানে ছায়াঘন অন্ধকার, শব্দটা এবার সেইখানে। খুব সম্ভব মাটিতে বসে পড়েছে; বসে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আদিগন্ত দেখে নিচ্ছে কোথায় কী আছে না আছে। সাধারণভাবে জঙ্গলের সব জন্তুরই এটা স্বভাব। খোলাখুলি বেরিয়ে

পড়বার আগে তারা গা ঢাকা দিয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে প্রকাশ্যস্থানটা ভালো করে দেখেশুনে নেয়—মাংসাশীরা খোঁজে শিকার আর অন্য প্রাণীরা খোঁজে নিরাপত্তা।

আমি ঠায় তাকিয়ে আছি। কতক্ষণে জানোয়ারটা বেরোয়। কিন্তু ছায়া থেকে কিছুই বেরিয়ে এল না। একটানা উত্তেজনায় আমার স্নায়ুগুলো অবসন্ন হয়ে পড়ল; আমার ধৈর্যের বাঁধও ভেঙে গেল। ঠিক করলাম খবরদারি ছেড়ে এবার ক্যাম্পে ফিরে যাব। আমার সামনে গোটা এলাকাটা জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে; সোঁতার ওপারটাও আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম; তার পশ্চাৎভূমিতে বিকীর্ণ আলোয় গা-ধোয়া জঙ্গলের জমাট অন্ধকারের ছায়ামূর্তি কী সুন্দর যে দেখাচ্ছিল।

আমার মালপত্র গোছগাছ করে নিয়ে সবে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় আবার সেই খশ্ খশ্ শব্দ। এবারও চোখকান খাড়া করতে হল।

শব্দকারী এবার আড়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। পাড়ের কাছে চারটে জানোয়ারের আবছা মূর্তি আঁচ করতে পারছি; তিনটে ছোট, একটা বড়। আস্তানা থেকে গজ চল্লিশ দূরে। আস্তে আস্তে তারা এই দিকেই এগিয়ে আসছে, কিন্তু একবারও ছায়া ছেড়ে নড়ছে না। ফলে আমার পক্ষে স্পষ্ট করে ওদের চেনা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। আকারে আর হাবভাবে স্পষ্টই বুঝছি ওরা শুয়োরও নয়, ভালুকও নয়। তাহলে কী ওরা? হায়েনা? কিন্তু হায়েনা হলে দল বেঁধে থাকবার তো কথা নয়। তবে বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে মা-হায়েনা? তা অবশ্য হতে পারে।

কয়েক পা আসবার পর—চার কি পাঁচ—আবার ওরা মাটির ওপর বসে পড়ে চারপাশের ছায়ার মধ্যে প্রায় মিলিয়ে গেল। ওদের মধ্যে একটি, মাথায় ছোটখাটো, দেখ্-না-দেখ্ কম অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ে মাঝে মাঝে পেছনের দুটো পায়ে দাঁড়িয়ে থাকছে আর নানা রকমের খেল দেখাচ্ছে। আবার তারপরই ছুটে গিয়ে মার

পিঠের উপর লাফিয়ে পড়ছে। মা যেই তাকে গা ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিচ্ছে, অমনি সে ঘাসের ভেতর থশ্ থশ্ করে পাড়ের ওপর ছুট লাগাচ্ছে। আমি আবছা-আবছাভাবে ওর এই দৌড়ঝাঁপের কিছুটা কিছুটা দেখতে পাচ্ছিলাম।

ধাড়ী জানোয়ারটা উঠে পড়ে সোঁতার যেখানটা আলো হয়ে আছে, সেখানে এসে দাঁড়াল।···না, এ হতেই পারে না! আমি কি তবে এতক্ষণ গাঁজায় দম দিয়ে বসেছিলাম? এটুকুও মাথায় ঢোকে নি যে, তিন তিনটে বাচ্চা ট্যাঁকে নিয়ে ওটা জলজ্যান্ত একটা বাঘিনী।

৩

বাঘিনী ধীর পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। নিজেকে সে সারাক্ষণ ছায়ার মধ্যে রেখে সোঁতার পাড় ঘেঁসে হাঁটছিল। পাশাপাশি বাচ্চাগুলো যাচ্ছিল প্রায় তার বগলদাবা হয়ে। তার মধ্যে কেবল একটিই যা ছটফটে, মাঝে মাঝে সে দলছুট হয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিল আর তারপরই আবার দৌড়ে সবাইকে ধরে ফেলছিল। সোঁতার পাড়ে একটা জায়গায় ছোট একটা গড়খাই ছিল, সেখান দিয়ে সোঁতার মধ্যে নামা যায়; জানোয়ারদের আনা-গোনার সরু পথটি এখান থেকে উল্বন পেরিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেছে। তার কাছাকাছি পৌঁছে বাঘিনী দাঁড়িয়ে গেল; তার ছানাগুলোও দাড়াল। ঝোপের আড়াল থেকে আমি ওদের সবাইকে খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম—তার কারণ, ওরা ছিল মাত্র বিশ গজ তফাতে; সরু বালির চর পেরিয়ে আকাবাঁকা যে জায়গাটায় ওরা দাঁড়িয়েছিল, সে জায়গাটা ঢের পাতলা আর কম কালো ছায়ার ঘোমটায় ঢাকা ছিল।

অত লম্বা-চওড়া বাঘিনী সাধারণত দেখা যায় না; দৈর্ঘ্যে প্রায় ন'ফুট। এত কাছে দাঁড়িয়ে আছে যে, বন্দুকের প্রায় মুখোমুখি। আমি রাইফেল তুলে ওর ঘাড় বরাবর নিশানা করলাম; একটু বাঁ-

কাত হয়ে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ও আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এর চেয়ে নিখুঁত, এর চেয়ে ভালো নিশানা আর হয় না। আঙুলের ডগা দিয়ে ঘোড়াটা শুধু একটু টুস্‌কে দেওয়া; ব্যস্‌, খেল্‌ খতম। কিন্তু বাঘিনীকে মারবার আমার আদৌ ইচ্ছে ছিল না। মা বলে, সৃষ্টিশীল শিল্পী বলে ওর সাতখুন মাপ। প্রাণে ধরে ওকে আমি মারি কি করে? মা-হারা বাচ্চাগুলো অনাথ হয়ে তিলে তিলে না খেয়ে মরবে কিংবা তার চেয়েও খারাপ, হায়েনা আর শেয়ালের পেটে যাবে—না, আমি অতটা পাষণ্ড নই। কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে যেভাবে ছিল সেইভাবে ঠেকো দিয়ে রাখলাম।

বালির ওপর বাঘিনী তার সামনের থাবা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে মাটিতে পেট ঠেকিয়ে থেবড়ে বসল। প্রায় বেড়ালছানার মতন বাচ্চাগুলো তার চারদিকে ঘুরে ঘুরে খেলতে লাগল; কখনও এ ওর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কখনও দল বেঁধে মার ঘাড়ে পিঠে লাফাচ্ছে। কখনও এ ওর দিকে গুঁটিসুটি মেরে এগোচ্ছে, কখনও মার গায়ে গা ঘষছে। কখনও মার মুখ চেটে দিচ্ছে আবার মাও তখন ফিরে তাদের চেটে দিচ্ছে।

কী সুন্দর যে দেখতে লাগছিল। যেন বিমূর্ত রীতির রং-ধরানো ক্লাসিকাল আর্টের ঐতিহ্যমণ্ডিত কোনো মায়াবী ছবি। আমি নিজেকে ভুলে গিয়ে পরমানন্দে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। বাচ্চা-গুলোর সাইজ প্রায় বুলটেরিয়ারের মতন। তার মধ্যে একটি বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা. মাথাটাও একটু বড় গোছের। বোধহয় সেটা মদ্দা বাচ্চা। এটারই ছিল মাথায় পোকা; যা মজার মজার কসরত দেখাচ্ছিল। ওদের বয়েস বছর খানেক কি বা হয়ত কিছু বেশি হবে; যে বয়সে পুরোদমে তালিম পেয়ে বাচ্চারা মাকে শিকার ধরার কাজে সাহায্য করতে আরম্ভ করে—গোড়ায় গোড়ায় মার কাছে শিকারকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আর তারপর মার সতর্ক পাহারায় নিজেরাই শিকারের ওপর চড়াও হয়।

বাঘের বাচ্চা পাঁচ বছরে সাবালক হয়। গোড়ার দু তিন বছর

সে মার স্থাওটা হয়ে ঘোরে। প্রতি দুই বা সম্ভবত তিন বছর অন্তর তার বাচ্চা হয়—তার আগে হয় বলে মনে হয় না।

বাচ্চার মুখে মার দুধ যখন আর রোচে না, তখন তার মা নিজের খাওয়া একতাল মাংসের ওয়াক তুলে বাচ্চাদের খেতে দেয়; জন্মের মাস পাঁচেক পর থেকে অন্য খাবারের সঙ্গে বাচ্চাকে সে টুকটাক এটা সেটা মেরে খাওয়ায়। এই সময়টা কুচো কুচো শুয়োরছানা, চিতল হরিণের কচি কচি বাচ্চা, ময়ূর এবং এমন কি বনমুরগিদেরও কপাল পুড়বার সময়।

কিছুদিনের মধ্যেই মা খাবারের খোঁজে বেরোলে বাচ্চারা তার পিছু নেয়; কিন্তু জন্মের এক বছরের মধ্যে বাঘ তার বাচ্চাদের নিজে হাতে শিকার করতে তেমন উৎসাহ দেয় না। তাদের গোড়ায় চোট-খাওয়া কিন্তু জ্যান্ত ছোট ছোট প্রাণী যোগানো হয়; বাচ্চারা সেগুলো নিয়ে পা দিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করে, ভয়ভাবনা করে, আঁচড়ায়, কামড়ায় —তাজা রক্তের সংস্পর্শে এসে শিক্ষানবীশ ব্যাঘ্রশাবকদের ইন্দ্রিয়গুলো প্রখরতর হয়।

বাঘের বাচ্চার শিক্ষাদীক্ষা দ্বিতীয় বছরেও চলতে থাকে। ছোট ছোট প্রাণীদের মারবার বিদ্যায় পোক্ত হতে বাঘের বাচ্চার জন্মের পর মাস আঠারো লেগে যায়। বাচ্চাদের শিখতে হয় অজস্র জিনিস: মারণবিদ্যা তার ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র।

লাফঝাঁপ করতে হয় বিস্তর। কচি বয়সে প্রথমে তো যত দৌরাত্ম্য মাকেই সইতে হয়; তারপর গাছের ডাল, পাতা আর যাবতীয় নড়ন্ত জিনিস এবং সবশেষে ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণীদের ধরে ধরে মারা। একবার আমি একটা বাঘের বাচ্চাকে চিতল হরিণের বাচ্চার মৃতদেহ নিয়ে খেলতে দেখেছিলাম। এক মানুষখেকো বাঘকে মারব বলে একবার আমি একটা ডোবার ধারে রাতভর জেগে বসে ছিলাম; সেই সময় একটা বাঘের বাচ্চাকে একটা মরা হরিণছানা মুখে করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলাম। আমার সামনে বালির ওপর চাঁদের আলো পড়ে ঝিকঝিক করছিল।

সেখানে বাচ্চা বাঘটি তার গুরুর কাছে শেখা পাঠগুলো আরেকবার ঝালিয়ে নিচ্ছিল। সামনের দুই থাবায় মরা হরিণছানাটিকে তুলে নিয়ে থেবড়ে বসে খানিকটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে তারপর তার ঘাড়ে এমনভাবে লাফিয়ে পড়ল যেন হরিণছানাটি জ্যান্ত। বেড়াল যেমন মরা ইঁদুর ধরে চাপড়ায়, তেমনিভাবে হরিণছানাটিকে কিছুক্ষণ চড়চাটি মেরে হঠাৎ মুখে তুলে নিয়ে তড়াক করে ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

পরের দিন রাত্রে ঐ একই ডোবার ধারে বাচ্চাটিকে আবার আমি দেখলাম। এবার তার সঙ্গে তার মা; তারা দুজনে মিলে শিকার-শিকার খেলছিল। বাচ্চাটা একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকছিল; তার মা কাছে আসবার সঙ্গে সঙ্গে মার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ছিল। তারপর এ ওকে জাপ্‌টে ধরে গড়াগড়ি খেতে খেতে পেছনের পা দুটো দিয়ে আলতোভাবে পরস্পরকে আচড়ে দিচ্ছিল—ঠিক যেভাবে বাঘের জাত আর বেড়ালের জাত মারাত্মকভাবে থাবা মেরে পেট ফাঁসিয়ে দেয়। কখনও কখনও বাঘিনী তার বাচ্চাকে ধরবার জন্যে প্রাণপণে ছুটছিল। একবার ঐভাবে ধরতে গিয়ে বাঘিনী নিজেকে সামলাতে না পারায় বাচ্চাটি তার ভরে চাপা পড়ে চেঁচিয়ে উঠল, তারপরই খেলা ছেড়ে কাঁদো-কাঁদো মুখে বাচ্চাটি ঝোপের ভেতর চলে গেল।

আমি আরও দুবার ওদের ঐ রকম তালিম নিতে দেখেছিলাম। পাঠক্রম দুবারেরই টোপ হিসেবে রাখা মোষের বাচ্চা। বাঘের বাচ্চাদের দিকে কড়া নজর রেখেছিল তাদের মা। গলায়, আর ঘাড়ে আঁচড়ে কামড়ে বাচ্চামোষের ঘাড় মটকাবার অনেক চেষ্টা করেছিল তারা। শেষ পর্যন্ত তাদের মা এসে মোষের ঘাড় ভেঙে দিয়েছিল।

আমি ঠায় তাকিয়ে।

দুই থাবার মাঝখানে মাথা রেখে বাঘিনী একইভাবে বসে রইল। জন্তুজানোয়ারদের যাতায়াতী পথের দিকে তার কান খাড়া হয়ে

আছে। হয় সোঁতার ওপারে, নয় আবাদী এলাকার চষা ভুঁইয়ের দিকে এখন তার যাওয়ার মতলব।

এতক্ষণ সারা সময় টোপ হিসেবে বেঁধে রাখা আমার মোষটি মাটিতে ঘাড় গুঁজে একেবারে নিথর নিস্পন্দ হয়ে বসে—এমন কি কান অবধি নাড়াচ্ছে না, চোখের পলকও বোধহয় ফেলছে না। সহজাত বুদ্ধিতে সে এটা জানত যে, ঘাসের ছায়ার ভেতর সে মিশে রয়েছে এবং তার পেছনে আছে পাথরের চাই—সুতরাং সে নিরাপদ; তবে সে নিরাপত্তা নির্ভর করছে তার নিঃসাড়ে পড়ে থাকার ওপর।

বাঘিনী তার ডানদিকের জঙ্গলের দিকে কান খাড়া করে আর মৃগপথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে স্ফিংক্সের ভঙ্গিতে বসে রয়েছে। তার বাচ্চারাও ঠিক তারই ভঙ্গিতে গুটিসুটি মেরে বসে। বড়সড় বাচ্চাটা মাঝে মাঝে জোট এড়িয়ে বালির ওপর ছুটে ছুটে যাচ্ছিল, আর তক্ষুণি তার মার চাপা গলার স্পষ্ট ধমকানিতে ফিরে ফিরে আসছিল। বেয়াড়া বাচ্চাটি কাছে এসে ধনুকের মত টান টান হয়ে বেঁকে ল্যাজটা মাথার ওপর অর্ধবৃত্ত করে তুলে মার মুখে গা ঘষে দিচ্ছিল। তার মা কখনও কখনও তাতে সাড়া দিয়ে বাচ্চার গা চেটে দিচ্ছিল, কখনও আবার চটে গিয়ে চটাস চটাস করে চড়িয়ে দিচ্ছিল। আর থাবার নিচে মা যখন চেপে ধরে রাখছিল, তখন বাচ্চাটা তার মার মুখ আঁচড়ে দিচ্ছিল, মা তাকে ছেড়ে দিতেই অমনি সে পেছনের পা দুটোতে ভর দিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে তার বোনদের দিকে চলে গিয়ে আবার সেইরকম দুষ্টুমি জুড়ছিল। তারপর আবার এক সময়ে দল ছেড়ে সটকে পড়ছিল। একবার এই রকম করতে করতে, মার দিকে আলতো থাবা দেখিয়ে যখন সে পেছনের দুপায়ে দাঁড়িয়ে নাচছে কুঁদছে, হঠাৎ তাল সামলাতে না পেরে দড়াম করে পড়ে গেল। পড়ল একেবারে চিৎপাত হয়ে; যখন সে উঠতে যাচ্ছে, তার ছোট দুই বোন এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেচারা মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে চার চারটে থাবা ছুঁড়ে সমানে চেষ্টা করছে ওদের হাত ছাড়িয়ে উঠতে। সে একটা দৃশ্য!

আমার পেট ফেটে হাসি আসছিল। অনেক কষ্টে সে হাসি দমন করতে হল।

মাঝে মাঝে মার কাছ ছেড়ে অনেকটা দূরে চলে যাচ্ছিল। একবার তো আমার প্রায় নাকের কাছে এসে পড়েছিল। আমি বেজায় ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কেননা ও যদি আমাকে পেরিয়ে আর খানিকটা এগিয়ে যেত, তাহলে আমি সাংঘাতিক বিপদে পড়ে যেতাম। মানুষই হোক, আর জন্তুই হোক—কপালদোষে কেউ যদি একবার বাঘ আর তার বাচ্চার মাঝখানে এসে পড়ে, তার আর নিস্তার নেই। নইলে, লোকে যাই বলুক, বাচ্চা সঙ্গে থাকলে বাঘিনীরা এমনিতে কাউকে কিছু বলে না; অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে। পাছে বাচ্চাদের কিছু হয়, সেই ভয়ে বাঘিনীরা কোনোরকম লড়াই বা ঝুটঝামেলার ভেতর যেতে চায় না। বাঘিনীর কাছে সবচেয়ে বড় কথা হল তার বাচ্চার নিরাপত্তা; সেক্ষেত্রে আর সব কিছু তার কাছে গৌণ।

তিড়িং বিড়িং করতে করতে ক'চ বাচ্চাটা আমার খুব কাছে এসে গেছে; পা ফেলছে নিশ্চিন্ত নির্বিকারভাবে। কিন্তু পাড় বরাবর যে ছায়া, নিজেকে ঠিক সেই চৌহদ্দির মধ্যেই রাখছে। আরেকটু হলেই ও আমাকে ছাড়িয়ে চলে যেত; কিন্তু আমার কপাল ভালো, হাওয়ার ঝাপটা লেগে একটা ঘাসের ডগা কাঁপছিল, মাটিতে তার ছায়াটাকে নড়তে দেখে বাচ্চাটা দাঁড়িয়ে গেল। যে কোনো জিনিস নড়তে দেখলেই শিকারী জন্তুদের মধ্যে চড়াও হওয়ার প্রবৃত্তি চেগে ওঠে। হিংস্র জন্তু দেখে যেসব লোক ছুটে পালাতে যায়, তারাই বেশি বিপদে পড়ে; কিন্তু যারা নিজের জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, তারা বেঁচে যায়।

বাচ্চাটা তৎক্ষণাৎ ওৎ পেতে বসে নড়ন্ত ছায়াটাকে তাক করতে লাগল। শরীরটাকে প্রায় মাটিতে নুইয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে নিঃশব্দে শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার জন্যে সে তার বেগ সঞ্চার করতে লেগে গেল। ডালকুত্তার মত তার ল্যাজটা এপাশ ওপাশ

করছে, কম্পমান দেহের আগায় তার মুণ্ডুটা অনড় অচল একরোখা। কাছে যাচ্ছে, আরও কাছে। আমি সমস্ত বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলে মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখছি। শেষকালে থেমে পড়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে শরীরের সমস্ত ভারটাকে ছুঁড়ে দিয়ে নড়ন্ত ছায়াটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। আমি মনে মনে বলে উঠলাম, 'ক্যাবলাকান্ত'। সে যে কী মজার তামাসা, কী বলব। জঙ্গলের যেন ডন কুইক্সট। তার প্রতি গভীর মমতায় আমার মন ভরে উঠল।

বালির ওপর ছায়ার সঙ্গে তার যুদ্ধ অনেকক্ষণ ধরে চলল। শেষে অধৈর্য হয়ে তার মা ডাক দিল।

ডাক শুনে চলে গেল বটে, কিন্তু মার কাছে নয়। সোঁতার মধ্যে খোলা জায়গার দিকে। মোষটা যেখানে বাঁধা ছিল, সেই রাস্তায়। মোষের বাচ্চাটা বোধহয় ভয় পেয়ে তার কান বা ল্যাজ নাড়িয়ে ফেলেছিল, কিংবা বাঘের বাচ্চাটা এমন রসালো খাদ্যটি নিজগুণেই আবিষ্কার করেছিল। যেভাবেই হোক, ঘটনাটি ঘটায় আমি মহা ফাঁপরে পড়ে গেলাম। মোষটি নজরে পড়ামাত্র বাঘের বাচ্চাটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে মাটিতে গুড়ি মেরে রইল—একটু আগে ছায়া নড়তে দেখে ঠিক যে রকমের ভঙ্গি করেছিল। এবার আর সে শিকারের দিকে এগিয়ে গেল না। তার বদলে খ্যানখেনে চাপা গলায় একটা অদ্ভুত শব্দ করল—মিউ! শেষের দিকে আচমকা কাঁপা কাঁপা সুর। আর ঠিক সেই সময় দেখলাম তার মা পা টিপে টিপে বাচ্চার দিকে এগোচ্ছে।

বাঘিনীকে আমার গুলি করার ইচ্ছে ছিল না। আবার এও চাইছিলাম না যে, মোষটা হাতছাড়া হয়। বাঘিনী ক্রমেই এগিয়ে আসছে আর প্রতি মুহূর্তে ঘনিয়ে আসছে মোষটির মৃত্যু। বাঘিনীকে ভড়কে দেওয়ার জন্যে নিজের উপস্থিতি ফাঁস করে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো মতলব মাথায় আসছে না। সেই ভেবে দুটো হাতে জোরসে তালি বাজালাম। ব্যস্, তারপরই লাগ্ লাগ্ করে শুরু হয়ে গেল।

বাঘিনী আচমকা নিথর নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিভীষিকার

কালো পাথরে খোদাই-করা যেন হিংস্রতার জমকালো প্রতিমূর্তি। আর তারপরই ছাড়ল গোটা কয়েক হুঙ্কার—গোঁয়ার নৃশংস সেই হুঙ্কার রাত্তিরটাকে বীভৎস করে তুলল আর আমার কান মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। রাত ভয়ে কম্পমান, সময় স্তব্ধ আর সর্বনাশের সুতোয় প্রাণ হাতে করে ঝুলছে জীবন। মুহূর্তের জন্যে আমার মগজ হিম হয়ে গিয়েছিল আর বিক্ষুব্ধ বায়ুস্রোত এসে আছড়ে পড়েছিল আমার স্নায়ুতটে। আমি আমার রাইফেলের ছোট কুঁদোটা নিজের অজান্তেই চেপে ধরে ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলাম। বাঘিনী সমানে হুঙ্কার ছাড়ছিল; তার নিষ্ঠুর বন্যতা আর গায়ের জ্বালা জ্যোৎস্নাচর্চিত অন্ধকারকে পিটিয়ে লাশ করছিল।

ওর ঐ অত মারমুখো হাঁকডাক আর ঐ অতক্ষণ ধরে হম্বিতম্বি—তাতেই ও ধরা পড়ে গেল। আমি বুঝলাম এর সবটাই ভান। ওর ঘরের কথা আড়ি পেতে শোনা, ওর নিষিদ্ধ এলাকায় অনধিকার প্রবেশ—শালার বেটা শালার আস্পর্ধা তো কম নয়। তাই ও চেয়েছিল বেটার প্রাণে ভয় ঢুকিয়ে দিতে, যাতে আর টঁ্যা ফোঁ না করে।

বাঘিনী যেখানে ছিল সেখানেই গ্যাঁট হয়ে থাকল। কিছুতেই নড়বে না। তিনটি বাচ্চাই তাদের মার কাছ ঘেঁষে প্রায় তার ছায়ার ছায়া হয়ে রইল। বাঘিনী আমার আস্তানার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়িয়ে। তার ভাবখানা—এ জমিতে আমার ন্যায্য অধিকার, বাহারওয়ালা ভাগো।

আমি আবার তালি বাজালাম। জবাবে এবার সে আরও জোরে হুঙ্কার ছাড়ল। আমি চলে যাওয়ার কথা ভাবলাম—এমন কি ছুটবার কথাও ভাবলাম। কিন্তু ছোটা মানেই নির্ঘাৎ আক্রমণ ডেকে আনা। ভাগ্যিস ঠিক সময়মত ঐ সর্বনেশে চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেছিলাম। মোষের বদলে আমার দিকে ওদের দৃষ্টি ফেরানোর জন্যে নিজের কপাল চাপড়ালাম; কিন্তু এরপর কী যে করব জানি না। আর ধৈর্য ধরতে পারছিলাম না; এস্পার ওস্পার

কিছু হয়ে যাক। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ওকেই মেরে ফেলব ঠিক করলাম। বন্দুকটা উঠিয়ে অবিচলভাবে সিধে ওর স্কন্ধমূলে টিপ করলাম। কিন্তু ঘোড়াটা যে টিপব, কিছুতেই আর হাত উঠল না।

ভাবলাম, ওকে আরও একটা সুযোগ দিই। হাততালির শব্দটা পরিচিত নয় বলে ও হয়ত আওয়াজের সূত্রটা ঠিক ধরতে পারে নি। আমি যদি উঠে দাঁড়িয়ে আত্মপ্রকাশ করি, তাহলে সার্কাসের ভালুকের মত মাধ্যাকর্ষণের আইন অমান্যকারী জীবটাকে বুক-ঢিবঢিব হাঁটু-ঠকঠক অবস্থায় ফেলে রেখে ও নিজের গোঁ ছেড়ে দিয়ে নিছক নাক সিঁটকে চলে যেতে পারে!

রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল ঠেকিয়ে বাঘিনীর ঘাড় বরাবর নিশানা ঠিক রেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাঘিনী আমার দিকে কটমট করে তাকাল। কী করবে সে বুঝতে পারছিল না! এইভাবে কাটল আধ সেকেণ্ডটাক সময়। আমি চোখের পলক না ফেলে দেখছি ও কী করে না করে। আমার আঙুল ক্রমশ ঘোড়াটাকে বেড় দিয়ে চেপে বসছে। বাঘিনী তার সামনের দুটো থাবা মাটিতে ঠুকল না—সাধারণত ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে যা করে থাকে। ও শুধু ধারালো দাঁত দুটো বার করে কান-ফাটানো এক হুঙ্কার ছাড়ল। আমি বুঝলাম, ও অত পর চড়াও হবে না সাব্যস্ত করেছে। ঘোড়ার ওপর আঙুলের চাপটা হালকা করে দিলাম। আবার একবার সে সরোষে গর্জে উঠল। সে ডাক আমার বাঁদিকে পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে বন পেরিয়ে স্তব্ধ রাত্রিকে হাড়েমজ্জায় কাঁপিয়ে তুলল। ওর ডাকের মধ্যে এমন একটা হিংস্রতা ছিল যে আমি সঙ্গে সঙ্গে কুঁচকে গেলাম আর আপনা থেকেই বন্দুকের ঘোড়ায় আমার আঙুলের চাপ বৃদ্ধি পেল। এক সেকেণ্ডের মাত্র এক ভাগ সময়, তারই মধ্যে আত্মস্থ হয়ে যখন তাকালাম—দেখি বাঘিনী তার ছানাপোনাদের নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে হাওয়া হয়ে গেছে।

লুকানো জায়গা থেকে যখন আমি বেরিয়ে এলাম, তখনও আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে আছে। কী মারাত্মক অবস্থায় পড়েছিলাম—আমার তো প্রায় নাড়ি ছেড়ে যাবার দাখিল। শরীর আর বইছিল না। মাটিতে ধপাস্ করে বসে পড়লাম। সেই ঝিম-ধরা অবস্থায় কতক্ষণ যে বসে ছিলাম খেয়াল নেই।

তারপর উঠে পড়ে হেঁটে হেঁটে ক্যাম্পে ফিরেছিলাম। বাকি রাতটা দুঃস্বপ্নের চোটে বার বার ঘুম ভেঙে গেছে। যতবার চোখ বুজেছি, ততবারই দেখেছি যেন সাঁই সাঁই করে বইছে ঝড়, ভূমিকম্পে পায়ের নিচে টলমল করছে মাটি, কখনও শুনছি ক্ষ্যাপা হাতিদের কাড়ানাকাড়া—আবার পরক্ষণেই দেখছি গাঁক গাঁক করে তেড়ে আসছে একপাল বাঘ।

৪

জঙ্গলে আমার যে শুটিংয়ের পারমিট, তার মেয়াদ ফুরিয়ে আসছিল। গরুচোর বাঘটাকে আর টিট করা হল না, তার আগেই আমাকে পাতশাড় গোটাতে হল। এরপর আরও বছর কয়েক আমি অবশ্য ও অঞ্চলে প্রায়ই যাওয়া আসা করেছি—যে বদমায়েশ বাঘটা তখনও অবাধে দৌরাত্ম্য চালিয়ে যাচ্ছিল, প্রধানত তাকে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করাবার জন্যে। কিন্তু বাঘটা প্রত্যেকবারই আমাকে বোকা বানিয়েছে।

বাঘের সেই বাচ্চাগুলোর কথা আমার বরাবরই মনে ছিল। ও অঞ্চলে যখনই গিয়েছি পারতপক্ষে তাদের একবার দেখে আসবার চেষ্টা করেছি। ওদের ডেরার কাছাকাছি গভীর জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে বসে থেকেছি, ওদের সম্ভাব্য যাতায়াতী পথের ওপর নজর রেখেছি, অতি প্রত্যূষে উঠে মাইলের পর মাইল হেঁটে ফিরেছি। ওদের পায়ের দাগ দেখে দেখে এগিয়েছি, ওদের হানা দেওয়ার বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলোতে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়েছি—ওদের শুধু একটু চোখের দেখা দেখব বলে এবং সম্ভব হলে ফটো তুলব। কিন্তু

প্রায় প্রত্যেকবারই নিরাশ হয়েছি। বার কয়েক শুধু নিমেষের জন্যে ওদের দেখেছি। কত চেষ্টা করেছি, কিন্তু একটিবারও ফটো তুলতে পারি নি।

পাথরাও সোঁতায় বাঘের পরিবারটির সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার বছর পাঁচেক পরে ক্যাবলাকান্তটির সঙ্গে আমার একবার রাস্তায় দেখা হয়েছিল। সে তখন ইয়া প্রকাণ্ড ধুমসো বাঘ। দুর্ভাগ্যক্রমে, সেবার বাধ্য হয়ে ওকে আমায় মেরে ফেলতে হয়।

পাশেই বড়হাপুর রেঞ্জে রামজীওয়ালা ফার্মের কাছে দমক নামে যে জঙ্গল, সেখানেই ঘটনাটা ঘটে। হরিদ্বার এবং আরও পশ্চিম থেকে একটি সরু রাস্তা সাপের মত এঁকেবেঁকে গেছে রামনগর, টনকপুর এবং আরও পুবে; এ রাস্তা শুধু বর্ষার সময় অচল। রাস্তার দুদিকে দুটি সমান্তরাল জঙ্গল—দমক আর কালুশহীদ ফরেস্ট। এই এলাকায় একদা ছিল কণ্বমুনির আশ্রম। নবোদ্ভিন্নযৌবনা শকুন্তলার সঙ্গে রাজা দুষ্মন্তের এই বনেই দেখা হয়েছিল। কালিদাসের কবি-কল্পনাকে উদ্দীপিত করা এই বন মোগল-বাদশাদেরও ছিল বিখ্যাত শিকারের জায়গা। এই এলাকার একটি অংশের তারা নামও দিয়েছিল 'শিকারগড'। ছোট বড় নানা মাপের খেতখামারে এখন সে জায়গাটা বসন্তের দাগের মত হয়ে আছে—ঝাকড়া চুলওয়ালা মাথায় যেন ছাড়া ছাড়া ভাবে বিশ্রী টাক পড়েছে।

ক্যাবলাকান্তকে এমনি একটা ক্ষেতিবাড়ির কাছে যখন আমি দেখি, ও তখন বেজায় বজ্জাতি করে বেড়াচ্ছে। আমি ও অঞ্চলে গিয়েছিলাম শিকারে। তখন এপ্রিল মাস। আমি যেতেই, গ্রামের লোকেদের যা স্বভাব, আতিথেয়তার ধুম পড়ে গেল। ওদের ট্যাঁক যেমন খালি, তেমনি ওদের দোষ ঐ এই যে, একটু বেশি রকমের ওরা দিলদরাজ। ওদের অন্তঃকরণের প্রাচুর্য এত বেশি যে, যা আছে সবটাই ওরা অতিথির পাতে তুলে দেবে। ওদের মধ্যে যে নবাব খাঞ্জা খাঁ, সে একজন অকিঞ্চন রাজপুত—অকিঞ্চন বলতে একেবারেই

হাড়হাভাতে এবং সর্বনেশে রকমের দিলদরিয়া আর ভয়ডরহীন বেপরোয়া রাজপুত। ডাকাবুকো এই বুড়ো মানুষটির নাম ঠাকুর আমীর সিং। এ তল্লাটে সবাই তাঁকে সমীহ করে ভাইসাহেব বলে ডাকে। পয়সার টানাটানি ছাড়াও, জোয়ান বয়সে একবার তাঁর পক্ষাঘাত হয়েছিল—সেও তাঁর আরেক দুর্ভোগ। ফলে, এখনও কথা বলতে গেলে জিভ জড়িয়ে জড়িয়ে যায়, হাঁটতে গেলে পা লগবগ করে আর তাঁর একটা হাত প্রায় অকেজো হয়ে গেছে। রোগা হাড্ডিসার চেহারা, দেহযন্ত্র বিকল। কিন্তু এই বীর রাজপুতের অসাধারণ মনের জোর। এখনও পুরোমাত্রায় তাঁর শিকারের শখ, শিকার ঢুঁড়ে বার করবার কাজে এ তল্লাটে তাঁর জুড়ি নেই। বনের প্রত্যেকটা ঝোপঝাড়, প্রত্যেকটা গাছ তাঁর নখাগ্রে।

বলতে গেলে, জঙ্গলের প্রত্যেকটা বাঘের নাড়িনক্ষত্র তাঁর জানা : কার কী স্বভাব, কার কী বৈশিষ্ট্য, এমন কি তাদের মাপগুলো পর্যন্ত প্রায় নিখুঁতভাবে তিনি জানেন। বন্য জানোয়ারদের পায়ের ছাপ দেখে বেড়ানো তার বাতিক; তাঁর অনুমানগুলো প্রায় ক্ষেত্রেই একেবারে নির্ভুল হয়। জন্তুদের পায়ের ছাপ দেখে তিনি বলে দিতে পারেন কার কত বয়স, কার কি রকম গড়ন, মদ্দা না মাদী, এমন কি পায়ের ছাপটা কতক্ষণ আগেকার।

তাঁবু ফেলবার আগে আমি গেলাম ভাইসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। মাইল দেড়েক দূরে তাঁর কুঁড়েঘর। নমস্কারপর্ব শেষ করে এ অঞ্চলের বাঘদের, বিশেষ করে গরুখেকো বাঘটা সম্পর্কে খবরাখবর নিলাম। পাখরাও সোঁতার আমার সেই পুরনো দোস্তদের সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসাবাদ করলাম।

ভাইসাহেব বললেন, বাঘিনীমা-র কাছছাড়া হওয়ার পর এক ভাই আর দুই বোন কিছুদিন একঠাঁই হয়ে থেকে দল বেঁধে শিকার করে বেড়াত। ইতিমধ্যে বাঘিনীর অবশ্য আরও চারটি বাচ্চা হয়েছিল। এক বোন মারা পড়ে এক তথাকথিত শিকারীর হাতে —বেচারা যখন কাছেই এক ডোবার ধারে দাঁড়িয়ে ব্যাঙ ধরে

খাচ্ছিল। আরেক বোন বেপাত্তা হয়ে যায়—সম্ভবত সে চলে গিয়েছিল কোনো দোসর খুঁজতে। ওদের ভাইটি এখন রীতিমত ডাগর—দেখতেও হয়েছে খুব সুপুরুষ। কাছেপিঠেই সে থাকে; কিন্তু ছেলেবেলার দুরন্তপনা এখন দৌরাত্ম্য হয়ে দাঁড়িয়েছে; কোথায় স্বভাবত জংলা জানোয়ার শিকার করবে, তা নয়—বাড়ির গরু-ছাগল মেরে মেরে বেড়ায়।

জোয়ান বয়সে ওর এমন বদস্বভাব গড়ে উঠেছে জেনে, আমার একটু অবাকই লাগল। কেননা সাধারণত কমবয়সী বাঘ লোকালয়ের দিকে বড় একটা ঘেঁষে না; তারা প্রধানত বুনো জানোয়ার মেরে খায়। যখন বেশি রকম মোটা হয়ে পড়ে, কিংবা বেশি বয়সে কাহিল হয়ে পড়ে ছুটে বনের শিকার ধরার ক্ষিপ্রতা কমে যায়—তখন দেখা দেয় গরুমারা বিদ্যা।

ওর এই জঘন্য স্বভাবের জন্যে এ অঞ্চলের সবাই ওকে বিষনজরে দেখত। কেননা আজ বাদে কাল ও প্রথমে নরঘাতক এবং তারপর নরখাদক না হয়েই যায় না।

পরদিন সকালে রাখালেরা যখন মাঠে গরু চরাতে গেল, তাদের সঙ্গে গেলাম। আমার সঙ্গে গেলেন ভাইসাহেব। ওদের গরুগুলোকে বনের ভেতর এমন জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে যেতে বললাম যেখানে ডোরাকাটা ডাকুটার দর্শন মিলবে।

বেলা গড়িয়ে গেল, তবু বেটার দেখা নেই। আমরা সমানে গরুর পালের সঙ্গে রয়েছি। ভাবলাম, ছোঁড়ার হয়ত এতদিন পর মতিগতি ফিরেছে; যেভাবে এতদিন ওকে গালমন্দ দিয়ে এসেছি, আর বোধহয় দিতে হবে না। সুতরাং ওর দর্শন না পাই, তাতে আমার দুঃখ নেই।

সন্ধে হয়ে আসছে, আর দেরি করা যায় না। রাখালের দল এবার গরুগুলোকে ডেকে ডুকে নিয়ে গাঁয়ের পথে রওনা হল। আমার বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল। ভাইসাহেবকে বললাম আজ এখানেই ক্ষান্ত দেওয়া যাক। ভাইসাহেবও তাতে সায় দিলেন।

একটা সরু খাতের ভেতর দিয়ে আমরা ফিরছিলাম। সেখানে তিনি একদিনের পুরনো বাঘের পায়ের ছাপ দেখালেন।

পায়ের ছাপ দেখে আমি আঁচ করতে পারলাম—এটা একটা কমবয়সী মদ্দা বাঘ; প্রায় ছ-হাত লম্বা; খুব একটা বেঢপ মোটা নয়—সর্বসাকুল্যে পৌনে চার থেকে সোয়া চার মণের মধ্যে ওজন।

পায়ের ছাপ দেখবার পর ভাইসাহেবকে আমি অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম—একটা পুঁচকে বাঘ, কী হবে মেরে? ওতে কোনো গৌরব নেই। আধপেটা-খেতে পাওয়া গাঁয়ের যেসব হালগরু, সেগুলোকেও একেবারে মারার মুরোদ হবে না ঐটুকু বাঘের। তাছাড়া গায়ে আরেকটু তাকত হলে ওর যখন জঙ্গলের জানোয়ার মারার ক্ষমতা হবে, তখন ওর এই বদ্‌স্বভাব চলেও তো যেতে পারে।

ভাইসাহেব মারকুটে শিকারী নন; জঙ্গলের জীবজন্তুর ওপর তাঁর খুব মায়ামমতা। তবু তিনি আমার সঙ্গে একমত হলেন না। বললেন, ওটাকে না মারলেই নয়। গরু মেরে গাঁয়ের গরিব বেচারাদের সর্বনাশ তো করছেই, তাছাড়া ও মানুষখেকো হল বলে—ওর স্বভাব সেইদিকে যাচ্ছে।

মানুষখেকোরা বাঘদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চালাক। বেজায়গায় গুলি লেগে কানাখোঁড়া হয়ে কিংবা বুড়ো হয়ে গিয়ে বাঘ যখন আর সেরকম দৌড়ঝাঁপ করে শিকার ধরতে পারে না, তখন সেই অবস্থায় কেউ কেউ হয়ত মানুষখেকো হয়েছে। তাই বলে মানুষখেকো হওয়ার ইতিহাস কিন্তু সকলের এক নয়। গরুমোষ মারতে মারতে বাঘের আস্পর্ধা এমন বেড়ে যায় যে, এক সময় রাখালের ঘাড়েও ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন ওটা তার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যায়। একবার যখন জানা হয়ে যায় যে গরু মারার চেয়ে মানুষ মারা ঢের সহজ কাজ—তখন সেইসব বাঘ কিছু পরিমাণে মানুষ খাওয়া ধরে। অবশ্য তেমন বাঘ সংখ্যায় খুবই কম হয়, যাদের একমাত্র খাদ্য নরমাংস।

কচি বাঘটাকে মারতে তবু আমার মন উঠছিল না। শত হলেও

আমি তাকে এইটুকু থেকে দেখে আসছি, প্রায় একটা বাৎসল্যের ভাব নিয়ে ওর ছোট থেকে বড় হওয়া আমি সাগ্রহে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু ভাইসাহেব এমনিতে খুব চুপচাপ এবং কম কথার মানুষ। তাঁর আন্তরিক অনুরোধ-উপরোধ শুনে অগত্যা আমাকে মিথ্যে মন-কাঁদার ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হল। তাঁর মানবপ্রেমের যুক্তি আমি না মেনে পারলাম না।

৫

পরদিনও একবাটি টাটকা দুধ নিয়ে সাতসকালে ভাইসাহেব আমার ক্যাম্পে হাজির। এক টুকরো, নেহাত ছোট্ট এক চিলতে জমি ছাড়া ইহলোকে তাঁর একমাত্র অস্থাবর সম্পত্তি ঐ গরু।

তাড়াতাড়ি দু কাপ চা বানিয়ে নেওয়া গেল। বললাম, আজও রাখালদের সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে যেতে চাই—বেটা গরুমারার খোঁজে। আমার প্রস্তাবে ভাইসাহেব খুব একটা উৎসাহ দেখালেন না। আমাকে বিশ্রাম নিতে বললেন। ব্যাপারটা যেন কেমন-কেমন মনে হল। কাল উনি আমাকে মনুষ্যত্বের নাম করে হবু মানুষখেকোটাকে মারবার জন্যে অত ব্যগ্রতা করলেন আর আজ কিনা ওঁর ইচ্ছে নয় যে, আমি তার পিছু নিই।

যাই হোক, ওঁর কথায় তেমন কর্ণপাত না করে রাখালদের সঙ্গে গরুর পাল নিয়ে আমি বনের পথ ধরলাম। ভাইসাহেব একা রইলেন ক্যাম্পে। ওদের পেছনে পেছনে থেকে আমি জায়গায় জায়গায় জোর করলাম ওরা যাতে গরুগুলোকে যথাসম্ভব জঙ্গলের ভেতরে নিয়ে যায়। ভোর থেকে বেলা অবধি এইভাবে একটানা জঙ্গল ঠেঙিয়ে আমার পেট চোঁ চোঁ করছিল, পা ধরে এসেছিল। পদে পদে ব্যর্থমনোরথ হওয়ার অবসাদে আমি একেবারে মুষড়ে পড়েছিলাম। আসবার আগে ওদের বলে এলাম—যখন আমি থাকব না, তখন পালে বাঘ পড়লে বাঘকে যেন ওরা তড়কে না দেয়; আর যেটা জখম হবে সেটাকে যেন গাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা না করে।

ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আমি তো ক্যাম্পে ফিরলাম। আমার পৌঁছুতে পৌঁছুতে বোধহয় বেলা তিনটে হয়ে গিয়েছিল। দেখি ভাইসাহেব উদ্‌গ্রীব হয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। ওঁর কথা বলার শান্ত নির্বিকার ভাব মাঝে মাঝে খুব বিরক্তিকর লাগে। সেই রকম ভাবে দু চার কথায় আমাকে উনি জানালেন যে, মাইল দেড়েক দূরে বাঘে একটা গরু মেরেছে—অবিলম্বে সেখানে যাওয়া দরকার। আর কোনো কথা নয়। সটান জঙ্গলের দিকে রওনা হলাম। ভাইসাহেব আগে আগে পথ দেখিয়ে চললেন।

ওঁর মুখে সংক্ষেপে শুনলাম : বেলা বারোটা নাগাদ একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে বাঘটা বনের মধ্যে একা একটা গরুকে চরতে দেখে তার ওপর চড়াও হয়। ভাইসাহেব হঠাৎ সে জায়গায় গিয়ে পড়েছিলেন। গরুর পাল বা রাখাল ধারেকাছে ছিল না। কাজেই বাঘ নিশ্চয় নির্বিবাদে এতক্ষণ ওটার সদগতি করছে।

বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ অকুস্থলে পৌঁছে আমরা পা টিপে টিপে এগোতে লাগলাম। একটা খরস্রোতা নালার বাঁকে চাটুর আকারের এক টুকরো নিচু ফাঁকা জমি তার চারপাশ দিয়ে উঁচু উঁচু অনতিঘন শালগাছ, গাছগুলোর তলায় খুব বেশি ঝোপঝাড় হয়ে নেই। জায়গাটার মাঝখানে বিশাল অজগরের মত পেঁচিয়ে রয়েছে দশ গজ চওড়া দু হাত গভীর শুকনো খটখটে একটা ছোট্ট গড়খাই।

আমরা দক্ষিণমুড়ো থেকে গড়খাইটার দিকে এগিয়ে ধাপে ধাপে সেই জায়গায় উঠে এলাম, যেখানে ভাইসাহেব বাঘটাকে লাফিয়ে পড়তে দেখেছেন এবং গরুটাকে যন্ত্রণায় আর্ত চিৎকার করতে শুনেছেন। আমরা এক ফার্লঙের মত পুরো রাস্তা সাবধানে পা টিপে টিপে হেঁটে গরুটার দিকে নিঃশব্দে এগোলাম। বাঘের টিকি দেখা যাচ্ছে না এবং 'মড়ি'টাকেও প্রকৃত প্রস্তাবে ঠিক মৃত বলা যায় না। বেচারা গরুটা তখনও বেঁচে। খাতের ঢালু গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। ঘাড়ের দুপাশে গভীর ক্ষত, গলার কাছে

চেয়ার দাগ এবং কাঁধের দুপাশের দুটো ডানা আলগা হয়ে গিয়ে নড়নড় করছে।

বেচারা এমন বেকায়দা হয়ে বসে আছে যে, ওর পাগুলো দেহের ভারে চাপা পড়েছে আর ঘাড়টা সামনের দিকে মাটিতে গোঁজা। আমরা আসায় অতিকষ্টে মাথাটা তুলে জলভরা করুণ চোখে আমাদের দিকে তাকাল। তার নিষ্পলক চোখে এমন একটা ব্যথাকাতর অসহায় ব্যগ্রতা ফুটে উঠেছিল যে, আমি ওকে কষ্ট থেকে মুক্তি দেবার জন্যে হাত ওঠাচ্ছিলাম। বাধা দিলেন ভাইসাহেব। ঘাড় নেড়ে বারণ করলেন। তারপর গরুটার কাছে বসে তাকে একমুঠো কচি ঘাস খাওয়াবার চেষ্টা করলেন। গরুটা হাঁ করতে পারল না। ওর চোয়াল আটকে গেছে। বোধহয় ওর সারা শরীরে তখন ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ ছড়িয়ে পড়েছে।

আমার ঘড়িতে তখন পাঁচটা বেজে গেছে। মিথ্যে মন খারাপ করে এখন আর সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম এমন কোনো জায়গা আছে কিনা যেখানে গা ঢাকা দিয়ে বসা যায়। তেমন কোনো জায়গা নেই। গরুটা যেখানে পড়ে ছিল, তার চারদিকে খাতটা এমন পাক দিয়ে গেছে যে, শুধু একটিমাত্র দিক থেকে জায়গাটা দেখা যায়—যেদিকটা দিয়ে বাঘকে আসতে হবে। তার উল্টো পাড়ে একটা মরা গাছের গুঁড়ি। জমি থেকে ৮ ফুট উঁচুতে ওর মাথার একটা ডাল ফ্যাকড়া বার করে রয়েছে।

গাছে উঠে ফ্যাকড়ার মুখটাতে গাঁট হয়ে বসবার ব্যবস্থা করলাম। খানিকটা মাথার টুপিতে আর খানিকটা আমার জ্যাকেটের গায়ে কিছু লতাপাতা জড়িয়ে নিলাম। বাঘের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্যে নিজেকে যথাসম্ভব ঢেকে ঢুকে, আমার 'স্কোপ-সাইট-ওয়ালা '৩৭৫' এইচ অ্যাণ্ড-এইচ ম্যাগনাম রাইফেলের সেফটি ক্যাচ খুলে তারপর ভাইসাহেবকে হাত নেড়ে বললাম গ্রামে ফিরে যেতে।

গাছের ওপর জুৎ করে বসে ঘড়ির দিকে তাকালাম। পাঁচটা বেজে কুড়ি মিনিট। শাল গাছগুলোর নিচে সন্ধ্যার ঘনায়মান ছায়ায় তখন পড়ন্ত বেলায় আলো আঁধারের লুকোচুরি খেলা চলেছে।

আমি বসেছি বোধহয় পনেরো মিনিটও হয় নি। হঠাৎ সারা শরীরে প্রচণ্ড জ্বালা অনুভব করলাম। কেউ যেন আমার সর্বাঙ্গে শত শত তপ্ত ছুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে—শরীরের এমন এমন জায়গায় যে কহতব্য নয়। প্রতি মুহূর্তে সেই জ্বালার ব্যাপ্তি আর তীব্রতায় এমনভাবে আমি আক্রান্ত হতে লাগলাম যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হল আমার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণার কারণ আবিষ্কারের জন্যে এপাশ ওপাশ করতে গিয়ে দেখি আমি বসে আছি একেবারে লালপিঁপড়ের বাসায়। হাজারে হাজারে লালপিঁপড়ে আমার গা বেয়ে উঠে পড়েছে একেবারে জামাকাপড়ের ভেতর—অধিকাংশই তাক করেছে আমার গেঞ্জি জাঙিয়া আর খালি গায়ের মধ্যেকার জায়গা। আমি কিছুই করতে পারছি না। বাঘ যেকোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। আমি এতটুকু নড়াচড়া করলেই বাঘের কাছে ধরা পড়ে যাব। সময় অসহ্য রকমের খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে—রাত্রে ঘুমের মধ্যে বুক-চাপার মত। আর পারা যাচ্ছে না—জামাকাপড় টান মেরে খুলে ফেলতে না পারলে বোধহয় পিঁপড়েগুলোই আমার গায়ের চামড়া খুলে নেবে। ইস্তফা দেবার জন্যে মন যখন প্রায় বেঁধে ফেলেছি, সেইসময় আমার ছেলেবেলায় পিতৃদেবের একটা অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল।

বাবা ওৎ পেতে বসে আছেন একটা চিতাবাঘ মারবার জন্যে—যে চিতাবাঘ তাঁর প্রিয় কুকুরটিকে মেরেছে। তখন বর্ষার শেষ। চারিদিকে থিকথিক করছে পোকামাকড় আর গিজগিজ করছে লতাপাতা। মাটির ওপর বসে থাকা অবস্থায় তাঁর এক পায়ের বুটের ভেতর কি করে যেন ঢুকে পড়েছিল একটা কাঁকড়াবিছা।

যতবার তিনি পায়ের আঙুলগুলো নাড়াচ্ছেন ততবারই বিছেটা ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে কামড়াচ্ছে। এইভাবে পাকা দু ঘণ্টা তাঁকে কাঁকড়াবিছের কামড় সয়ে যেতে হল। তারপর চিতাবাঘ 'মড়ি'র কাছে ফিরে এলে তাকে তিনি গুলি করে মারলেন। তাঁর পা এমনভাবে ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত জুতো কেটে পা বার করতে হল।

ছেলেবেলায় সেই স্মৃতির কথা মনে করে মনে খানিকটা জোর আনার চেষ্টা করলাম। শয়তান পিঁপড়েগুলো এদিকে সমানে আমাকে কামড়াচ্ছে। ঠোঁট ফুলে উঠেছিল। দাঁতে দাঁত চেপে আরও একটি ঘণ্টা কোনোরকমে কাটালাম। আমার নিশ্বাসে একটা চাপা গোঙানি। আর পারলাম না। মনে মনে বললাম, 'চুলোয় যাক বাঘ, চুলোয় যাক পরের ভালো'—বলে গাছ থেকে নেমে পড়লাম।

গাছের গুঁড়িতে রাইফেলটা ঠেস দিয়ে রেখে একটি একটি করে পরনের সমস্ত জামাকাপড় খুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেললাম। দরজী-দত্ত সভ্যতার হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এবার কামড়ে-ধরা পিঁপড়েগুলোর মুণ্ডু ছিঁড়ে ছিঁড়ে গা থেকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করলাম। শরীরের সর্বাঙ্গে দাগড়া দাগড়া হয়ে গিয়ে গণ্ডারের চামড়ার মত দেখাচ্ছে: যেখানেই কামড়েছে সেখানেই ফুলে ডুমো ডুমো হয়ে গেছে।

মাটিতে দিগম্বর হয়ে দাঁড়িয়ে আমি তখন একমনে দুশমনগুলোকে তাড়াতে ব্যস্ত। আমার চারপাশে কী ঘটছে না ঘটছে, সে সম্বন্ধে আমার কোনো হুঁশ নেই। গায়ে সুতোর কোনো বালাই না রেখে খোলা আকাশের নিচে আমি দাঁড়িয়ে, যেন নরকের ধোলাইঘর থেকে সটকে-পড়া কোনো পাপীতাপী লোক—গৌর নিতাইয়ের ঢঙে আমি হাতদুটো পরিত্রাহি নাড়ছি আর কুকুরের মত পোকা বাছার ভঙ্গিতে সমানে গা আঁচড়াচ্ছি। বাঘ শিকারের গোড়ার কথাই হল নটনড়নচড়ন হয়ে বসে থাকা, আর আমার অবস্থাটা তখন ভেবে

দেখুন—যেই সেই করে নাচছি। সেই অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে হঠাৎ গরুর আর্ত চিৎকারে আমার টনক নড়ল। নিশ্চয় বাঘ এসেছে।

রাইফেলের দিকে এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে গরুটার দিকে তাকালাম। কী সর্বনাশ, আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে বাঘ সেই জ্যান্ত গরুটাকে পেছনের দিক থেকে খাচ্ছে। ও এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার কীর্তিকলাপ সব দেখেছে; কিন্তু গোঁয়ার-গোবিন্দ বলেই হোক কিংবা হয়ত বোকা গবেট বলে, ও আমাকে ধর্তব্যের মধ্যেই না এনে নির্বিকারভাবে অভদ্রের মত ভোজে বসে গিয়েছে। একগ্রাস কাঁচা মাংস মুখে নিয়ে পেছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে নিজেকে চমৎকারভাবে গাঁথবার আমাকে একটা সুযোগ করে দিল। তৎক্ষণাৎ রাইফেলটা ঘাড়ে তুলে ওর মাথা আর ঘাড় তাকি নিশানার মধ্যে পেলাম। ঘাড় আর মাথার ঠিক সন্ধিস্থলে টিপ করে রাইফেলের ঘোড়াটা টিপলাম। সঙ্গে সঙ্গে গুলির একটা আওয়াজ আর সেইসঙ্গে বাঘটা ল্যাজের ডগাটা পর্যন্ত একটু না নড়িয়ে ধপাস করে গরুটার গায়ে ঢলে পড়ল। ৩০০ গ্রেনের কপোর টিপ দেওয়া বুলেট, সেকেণ্ডে ২,৫৪০ ফুট যার ছোটার বেগ আর যার ধাক্কা দেবার ক্ষমতা ৪,৩০০ ফুট-পাউণ্ড—সেই বুলেটটা ঠিক গলা-সই হয়ে বেঁধায় বাঘটা কিছু বোঝবার আগেই সঙ্গে সঙ্গে পটল তুলেছিল।

আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে নিলাম বাঘটা সত্যিই মরেছে কিনা। তারপর আরো কাছে গিয়ে গরুটার মাথায় একটা গুলি করে ওকে যমযন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচালাম। মেপে দেখলাম বাঘটা ৯ ফুট ১ ইঞ্চি—লম্বায় স্বাভাবিক, কিন্তু শরীরের বাড় এখনও পুরো হয় নি। মেরে ফেলার পর আমার খুব খারাপ লাগছিল। বুকের ভেতর স্নেহের যে জায়গাটা এতদিন সে দখল করে রেখেছিল, সেটা যেন খালি হয়ে গেল। পাথরাও সোঁতায় ওকে এইটুকু বয়সে প্রথম দেখার পর থেকেই বরাবর ও আমার মনের মধ্যে ছিল। এতদিনে

ও কত বড়টা হল, মুখ্যত সেটা দেখে আসবার জন্তেই বার বার আমি জঙ্গলে যাবার টান অনুভব করেছি। আহাম্মকটা মরে গেল। এখন থেকে এ জঙ্গল আমার কাছে শূন্য বলে মনে হবে। আমার বুকের ভেতরটা ব্যথায় মুচড়ে উঠল।

গ্রীক ট্র্যাজেডির পরিসমাপ্তিতে অনেক সময় মানুষের মনের তন্ত্রীতে যেমন মহত্তম সুর বেজে ওঠে—তেমনি এক পরমভাব নিয়ে শেষ যবনিকা পড়ল পরদিন সকালে। গ্রামের একটি ছোকরা এসে আমাকে খবর দিল, বাঘ যেটাকে মেরেছে সেটা ভাইসাহেবের গরু। আর পাঁচজনের জীবন আর জীবিকা যাতে রক্ষা পায় তার জন্তে ভাইসাহেব তাঁর নিজের বলতে সবেধন নীলমণি ঐ গরুটিকে বাঘের মুখে সঁপে দিয়েছিলেন।

আজ পাড়াগাঁর অখ্যাত অজ্ঞাত এক নিরক্ষর পঙ্গুদেহ দীনদরিদ্র সাদাসিধে মানুষ এই ভাইসাহেব। আমি তাঁর মধ্যে যে আশ্চর্য মহানুভবতা, চিত্তের যে চরম উৎকর্ষ দেখতে পেলাম, তার কাছে কোথায় লাগে আমার শহুরে মানুষ হওয়ার শূন্যগর্ভতা, কোথায় লাগে আমার পুঁথিবিদ্যেয় ফোঁপরা হওয়া মনের অনুর্বরতা। এর জবাবে আমি কী তাঁকে দেব—ধন্যবাদের একটি কথাও আমার মুখ দিয়ে সরল না। যাই বলি না কেন, এক্ষেত্রে সে কথা জলো ছেঁদো বেখাপ্পা বেসুরো শোনাবে।

# জোর বরাত

কথায় বলে, বেড়ালের ন'টা প্রাণ। বেড়াল যার মাসী তেমন একজন সম্পর্কে আমি বলতে পারি, কথাটা ঠিক। চার বছর সময়ের মধ্যে তিন তিনবার তার শরীরের মোক্ষম জায়গাগুলোতে গুলি লেগেছে, কিন্তু প্রত্যেক বারই সে আমাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়ে পালিয়েছে।

প্রকাণ্ড মোটাসোটা গোমড়ামুখো কেঁদো বাঘ; তার বয়স হচ্ছিল। পায়ের ছাপে গভীর কাটাচেরার দাগ, আকারে প্রায় উটের বাচ্চার পায়ের ছাপের মত।

লম্বায় তো প্রায় দশ ফুটের মত হবেই, চওড়ায়ও কোন্ না দশাসই। মোটামুটি শক্ত মাটিতেও ছেৎরানো গভীর পায়ের দাগ দেখে সে যে বিশাল ভারী তা আঁচ করা যায়। বালির ওপর তার পায়ের ছাপগুলো দেখাত অবিশ্বাস্য রকমের বড়—যেন একেকটা জামবাটি। ঢোলখণ্ডের শুক্‌নো সোঁতার খাতে আমি তার এই পায়ের ছাপ প্রথম দেখি।

কুমায়ুন পর্বতমালার কাছাকাছি এই জলধারাটি নিতান্তই শীর্ণ। কিন্তু বর্ষায় তার সে কী দুর্বার কূলপ্লাবী চেহারা হয়। কালাগড় আর ল্যান্সডাউন ডিভিশনের সংরক্ষিত বনের সীমানা পেরিয়ে সেই জলধারা যখন বন-উজার-করা ক্ষেতখামার, গুহাগর্ত, খোয়াই আর বিজনোর জেলার বড়হাপুর জঙ্গলমহালের তৃণভূমিতে এসে পড়ে, তখন সে এক মহানদী।

গরুখেকো বাঘের স্বভাব অনেকটা মন্দিরের পাণ্ডাপুরুতদের মত; তার মধ্যে থাকে একটা গয়ংগচ্ছ ভাব। রোজকার পেটপুজোর ব্যাপারটা নিয়ে বেশি গা ঘামানোয় সে বিশ্বাস করে না। কিন্তু পুরুতের বেটা যেমন পুরুত হয়, তেমনি গরুচুরিটা কিন্তু বাঘের

জাতব্যবসা নয়। যে বাঘ গরুখেকো, ছেলেবেলায় তার হাতেখড়ি হয় কিন্তু জংলা জানোয়ার শিকারে—অবস্থার ফেরে কিংবা বুড়ো বয়সে সে হয়ে পড়ে গরুখেকো। যেসব গাঁয়ে গরু পাওয়া যায়, সেসব গাঁ থেকে অনেক দূরের কোনো জঙ্গলে এরা কখনই ডেরা বাঁধে না। গোচারণের ধারেকাছে যেসব বনবাদাড়ে খাবার জল আর ঘুমোবার নিরিবিলি জায়গা মেলে, সেইসব বন গরুখেকো বাঘের পক্ষে প্রশস্ত। যতক্ষণ না, লোকে ওদের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে, ততক্ষণ মানুষজনের কাছে থাকা নিয়ে ওদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

জানোয়ার-শিকারী, গরু-মারা, মানুষখেকো—বাঘদের মধ্যে এরকম কোনো জাতের তফাত নেই। স্বভাব বদলের ক্ষেত্রে এগুলো একই বাঘের জীবনে স্তরভেদ বা অবস্থান্তর মাত্র। তাছাড়া এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই যে, ভাগগুলো খুবই স্পষ্ট এবং ধরাবাঁধা—ভিন্ন প্রকৃতির হলেও স্বভাবে মেশামিশির সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

গরুছাগল টেনে নিয়ে যাওয়া যাদের স্বভাব, তারা সাধারণত চেহারায় মোটা আর স্বভাবে ঢিলেঢালা হয়, দৌড় ঝাঁপও কম করে। যারা শুধু বনের জানোয়ার শিকার করে, তারা কিন্তু চটপটে - কেননা বন চুঁড়ে বেড়ানো আর দ্রুত ধাবমান শিকার ধরার ব্যাপারে প্রভূত পরিমাণ দৈহিক শক্তি আর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। গরুখেকো বাঘকে খেয়ে বাঁচবার জন্যে এতটা গা ঘামাতে হয় না। তার কাজ বলতে শুধু বনের বাইরে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকা—দলছুট গরু বা মোষ দেখলেই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়া। শেষ দফায় খাওয়ার পর চতুর্থ কি পঞ্চম দিন থেকে আবার সে কোমর বেঁধে লাগে পরের কিস্তির খাবারের খোঁজে। এমন নয় যে গোখাদক বাঘ শুধু গোমাংসই খায়; মুখ বদলাতে সে সব সময়ই রাজী; সোনামুখ করে হরিণের বা ভেড়ার বা শুয়োরের মাংস তো খাবেই, তাছাড়া টুকটাক বনমোরগ, বাঁদর, বড় গিরগিটি কিংবা এমন কি নস্তির মত

ব্যাঙ পর্যন্ত সে বেশ খুশি হয়েই খাবে। খাওয়ার ব্যাপারে তার অতশত বাছবিচার নেই। যেকোনো রকম মাংস হলেই হল—পচাগলা পোকা-পড়াতেও তার আপত্তি নেই।

ঢোলখণ্ড সোঁতা যেখানে ক্ষেতখামার এলাকায় পড়েছে, সেখানে এই প্রকাণ্ড কেঁদো বাঘটার পায়ের ছাপ আমি প্রথম দেখি। লোকমুখে শুনলাম কালুশহীদ ফরেস্টে যে গরুমারা বাঘটা থাকে, এ হচ্ছে সেই পাজীর-পা-ঝাড়ার পায়ের ছাপ। বাঘটা বনের ধারে এসে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়; এ পর্যন্ত সে গাঁয়ের লোকের কম গরুছাগল মারে নি। জনপূর্ণ বসতির খুব কাছে থাকার ফলে মানুষ সম্বন্ধে তার ভয়ডর একেবারেই চলে গিয়েছিল; আর তার ওপর হয়ে উঠেছিল অসম্ভব ফিচেল আর ফন্দিবাজ।

একবার সে, বেলা এই তিনটে নাগাদ, বনের ধারের এক গাঁয়ে দিনেদুপুরে ঢুকে পড়ে বাড়ির উঠোনে বাঁধা ছুটো হালবলদের ঘাড় মটকায়। গাঁয়ের লোকে যত চেঁচামেচি হৈ হল্লা করে, বাঘটা ততই গাঁকগাঁক ক'রে উল্টে তাদের ভয় খাইয়ে দেয়। তারপর দিব্যি ধীরেসুস্থে একটা বলদকে টেনে নিয়ে কাছেই একটা ঝোপে চলে গিয়ে মনের সুখে তার ভোজনপর্ব সমাধা করল।

তখন ফেব্রুয়ারি মাস। আমার এক বন্ধু কালুশহীদ ফরেস্টে নিজের নামে শিকারের অনুমতি পেয়ে আমাকে তাঁর সঙ্গী হতে বলেছিলেন। আমার এই বন্ধু ডক্টর প্রসাদ—তাঁর বিজ্ঞানের বিশ্লেষণী এলেমকে শিকারের ক্ষেত্রেও লাগাতে ছাড়েন না; আরণ্য জীবন, বনজঙ্গলের দৃশ্য, উর্দু কবিতা আর সেইসঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র—সব কিছু সম্পর্কেই তাঁর ছিল স্বপ্ন-দেখা মরমী হৃদয়। ডক্টর প্রসাদ অনেকদিন থেকেই ঝুলোঝুলি করছিলেন একবার একসঙ্গে শিকারে যাবার জন্যে। কাজেই আমি তাঁর অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না। ডক্টর প্রসাদের ছুটি মোটে এক সপ্তাহের। দিল্লী থেকে প্রায় একশো সত্তর মাইল গাড়িতে ঠেঙিয়ে আমরা ফরেস্ট ব্লকে পৌঁছে শুনলাম—

একটা গরুমারা বাঘ আশপাশের ক্ষেতখামারের গরুগুলোর ভুষ্টিনাশ করে ছাড়ছে।

তিনদিন ধরে আমরা জঙ্গলটা চষে ফেললাম। জঙ্গলের কোথায় কী এবং গরুমারা বাঘের আসাযাওয়ার সময়, পথঘাট ইত্যাদি খুঁটিয়ে জেনে নিলাম। নানা জায়গায় টোপ রেখে পরখ করলাম এবং প্রত্যেক দিন সন্ধেবেলায় এ-নালায় সে-নালায় এখানে সেখানে বসে থেকে দেখলাম। হারামজাদা শয়তান টোপও মুখে নিল না, একবার দেখাও দিল না। আমরা ওর পাত্তা করবার চেষ্টা করছি এবং ও সেটা বুঝতে পেরেছে, এমন কোনো লক্ষণই ওর দিক থেকে প্রকাশ পেল না। শিকারীর সেই ভূস্বর্গে আমরা ছুটিতে পথহারা দেবদূতের মত ঘুরে বেড়ালাম—সপ্তাহের প্রথমার্ধে আমরা দুই ছিটগ্রস্ত ভবঘুরে প্রত্যহ উদয়াস্ত ঘুরেও তার স্বভাবচরিত্র চালচলন সম্পর্কে কিছুমাত্র ওয়াকিবহাল হতে পারলাম না। এ বিষয়ে আমার কোনোই সন্দেহ নেই যে, ঐ তিনদিন নিশ্চয় একাধিকবার আমরা তার গোপন আস্তানার গা ঘেঁষে গিয়েছি—আমরা কপালের ঘাম মুছে আর পা টেনে টেনে চলা দেখে বেটা মনে মনে নিশ্চয় খুব হেসেছে।

ও এলাকায় আরও কিছু বাঘ ছিল; তার মধ্যে চারটের আমরা হদিশ পেয়েছিলাম। কিন্তু তাদের নিয়ে আমাদের কোনোই মাথাব্যথা ছিল না। একটি তো টোপ হিসেবে রাখা আমাদের একটা মোষের ঘাড়ও মট্‌কেছিল, তারপর মোষটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল নলখাগড়ার বনে। পায়ের দাগ দেখে আমরা অবশ্য বুঝেছিলাম, আমরা যার তক্কে তক্কে আছি এটা সে বাঘ নয়—তবুও নিছক কৌতূহলবশেই দাগ বরাবর আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম। ছ সাত বছর বয়সের ছোট্টখাট্টো মদ্দা বাঘ—তার পায়ের ছাপ দেখে এটা আমরা আঁচ করেছিলাম।

মাটিতে শক্ত করে খুঁটি পুঁতে তার সঙ্গে ছোট মাপের একটা মজবুত দড়ি বেঁধে মোষের বাচ্চার পায়ে এঁটে ফাঁস পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। টোপ হিসেবে মোষ বাঁধবার সময়, তার সামনের পায়ের লোমের

গুছির একটু ওপরে শক্ত করে বাঁধন দেওয়া দরকার—দেখতে হবে দড়িটা যেন মজবুত হয়, মোষ যেন দড়ি ছিঁড়ে পালাতে না পারে; আবার তাই বলে এমন শক্ত না হয় যে, মোষটাকে মেরে বাঘ দড়িদড়া ছিঁড়তেই পারবে না; মরা মোষটাকে টেনে ঝোপের ভেতর নিয়ে যাওয়া দরকার। দড়ি যদি বেশি শক্ত হয়, বাঘ যদি ছিঁড়তে না পারে—তাহলে মোষটাকে সে গুম করতে পারবে না। খোলা জায়গায় পড়ে থাকলে শেয়াল শকুন এসে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব চেটেপুটে খেয়ে স্রেফ হাড় ক'খানা ফেলে রেখে যাবে। তেমন হলে বাঘ আর ফিরে আসবে ভাবছেন? সে গুড়ে বালি। দড়ি বেশি লম্বা কিংবা বেশি ঢিলে না হয়, তাহলে পায়ে জড়িয়ে গিয়ে মোষ নির্ঘাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। মোষ যেন পায়ে না জড়িয়ে স্বচ্ছন্দে উঠতে বসতে পারে. এমনভাবে দড়ি ছেড়ে বাঁধতে হবে।

যে মোষের গলায় দড় বাঁধা থাকে, বাঘ তাকে বড় একটা ছোঁয় না—কেননা বেশির ভাগ বাঘই বেশ তুখোড়, ফাঁদ পাতার ব্যাপারটা তারা ধরতে পারে। কয়েকটা ঘটনার কথা আমি জানি, বাঘ মোষের চারপাশে চক্কর মেরেছে, মাটিতে পায়ের দাগ দেখে সেটা বোঝা গেছে। কিন্তু অজানা বিপদের আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত আর মোষের ওপর চড়াও হয় নি।

সব সময় এমন ফাঁকা জায়গায় টোপ বাঁধা দরকার, যে জায়গাটা চারদিক থেকে অবাধে স্পষ্ট দেখা যাবে। ধারেকাছে কোনো ঝোপঝাড় অথবা এমন কি কোনো উঁচু পাথরও যেন না থাকে, যাতে মোষটা ঢাকা পড়ে যেতে পারে। শিং আর কানের ওপর দিয়ে সুতো বেঁধে যদি ঘন্টি ঝুলিয়ে দেওয়া যায় তো সেটা মন্দ হয় না। গলায় ঘণ্টা বাঁধা থাকলেও কোনো কোনো মোষ ঘাপটি মেরে থাকার জন্যে একটুও না নড়েচড়ে একেবারে স্থির হয়ে থাকে। কিন্তু ঘন্টির ফাঁসটা যদি শিং আর কানে পরানো থাকে, তাহলে প্রত্যেকবার কান নাড়লে ঠুং-ঠাং আওয়াজ না হয়েই পারে না। গরু-মারা বাঘ বহুদূরে থাকলেও, ঘণ্টার ঠুং-ঠাং আওয়াজ ঠিক তার কানে যায়।

দড়ি বাঁধার খুঁটি পাওয়া না গেলে, মাটিতে একটা ছোট গর্ত খুঁড়ে —এই ধরুন, তিন ফুট গভীর আর এক ফুট লম্বা—তার মধ্যে একটা কাঠিতে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিন। গর্তের তলায় বেশ করে পাথর দিয়ে ওপরটা পিটিয়ে শক্ত করে তাতে এমনভাবে বালি আর ঘাস ছড়িয়ে দিন যাতে চারদিকের প্রকৃতির সঙ্গে মিশ খায়। যদি এভাবে পোক্ত করা যায়, তাহলে আলগা বালিতেও সে দড়ি সরানো সহজ হবে না --বাচ্চা মোষের পক্ষে তো নয়ই। মাটির ভেতর কাঠি রেখে তাতে টোপ বাঁধলে দেখা যেমন পাবে না, তেমনি বাঁধনও বেশ মজবুত হবে; এতে আরও এক সুবিধে। মাটির ওপর খুঁটি জেগে না থাকলে মোষ তাতে দড়ি জড়িয়ে জড়িয়ে শেষটায় ফাঁস লাগিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে পারবে না।

পায়ে দড়ি যেন কখনই খুব এঁটে না বসে। পা আর দড়ির মধ্যে যেন এক আঙুলের ফাঁক থাকে। দড়ি আঁট করে বাঁধলে মোষ বেচারা যন্ত্রণায় ছটফট করবে: তার ফলে, সকালবেলায় পা ফুলে ঢোল হয়ে মোষটা খোঁড়াতে থাকবে। পা বাঁধার দড়ি যেন সাদা না হয়। সব সময়ই ব্যবহার করা উচিত সবুজ কিংবা খাকি দড়ি। তাহলে ঘাসপাতার রঙের পাশে দাড়টা আর তত বেশি প্রকট হয়ে উঠতে পারবে না। রাত্রে যেন যথেষ্ট পরিমাণে ঘাসপাতা ধারেকাছে থাকে।

বাঘ আমাদের মোষটাকে নিশ্চয় দিন থাকতে থাকতেই মেরেছে; কেননা পরদিন সকালে মাটিতে টানাহেঁচড়ানোর দাগ বরাবর জায়গায় জায়গায় আমরা মাকড়সার জাল আর তার গায়ে ফোঁটা-ফোঁটা শিশির দেখতে পেলাম। মাকড়সারা কখনও রাতবিরেতে কাজ করে না, জাল বোনার কাজ সূর্যাস্তের আগেই তারা সেরে ফেলে। বাঘটা চড়াইয়ের রাস্তায় এক ফার্লঙের বেশি দূর মোষের বাচ্চাটাকে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু তাতে মাকড়সার একটি জালও ছেঁড়ে নি, আর ছিঁড়ে থাকলেও

জালগুলো নিশ্চয় তারা সারিয়ে ফেলেছিল। এ থেকে বোঝা যায়, সূর্য অস্ত যাবার ঢের আগেই মোষের বাচ্চাটাকে মেরে বাঘে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

বাঘ আর সেই সঙ্গে চিতাবাঘেরও এ এক অদ্ভুত স্বভাব। যে জায়গায় তারা শিকার মারবে, সে জায়গা থেকে সব সময় তারা 'মড়ি'গুলোকে টেনে নিয়ে যাবে। খোলা জায়গায় বসে খাওয়ার ব্যাপারে তাদের বেজায় বীতস্পৃহা; মরা জন্তুকে টানতে টানতে তারা এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যেখানে যথেষ্ট ছায়ায় ঢাকা আবরু আছে। অনেক সময় এইসব জায়গায় এত বেশি ঘন ঝোপঝাড় থাকে যে, 'মড়ি'র কাছে কোনো মানুষকে পৌঁছুতে গেলে হামাগুড়ি না দিয়ে উপায় থাকে না।

বাঘের হাতে খুন হওয়া এই মোষের বাচ্চাটার কথাই ধরুন না কেন। যে জায়গায় তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, সে জায়গাটা থেকে নিকটতম গ্রাম কমপক্ষে দু মাইল দূরে। জঙ্গলের অনেকখানি ভেতরে খুব নিরিবিলি জায়গা. লোকজন সেদিকে মাড়ায় না; তার চারপাশে দুর্ভেদ্য শালবনের ভেতরে সোঁতার বাঁকের কাছে ছায়ায় ঢাকা পরিষ্কার জলের একটা সুন্দর ডোবা। এ সত্ত্বেও বাঘ সেই মোষের বাচ্চাটাকে সেখান থেকে টানতে টানতে নিয়ে গেছে টিলার একটা ফ্যাকড়া পেরিয়ে ঘন বাঁশঝাড়ের ভেতর। লোকে স্ত্রীচরিত্রকে দুর্জ্ঞেয় বলে, কিন্তু বাঘের কাণ্ডকারখানা তার চেয়েও রহস্যজনক।

বাঘ যেখান দিয়ে মোষটাকে টেনে নিয়ে গেছে, আমরা দাগ বরাবর সেই পথ ধরে এগোতে লাগলাম—কখনও হামাগুড়ি দিয়ে চলেছি, আর অধিকাংশ সময় চলেছি কুজো হয়ে, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে ঘাস আর উলুবনের ফাঁকফোকর দিয়ে। চড়াই বেয়ে ওঠা কম কষ্টসাধ্য নয়। এত বাধাবিপত্তির ভেতর দিয়ে পাক্কা আড়াই মণী পাষাণভার যে বাঘ টেনে তুলেছে, তার হিম্মতের কথা ভেবে আমাদের অবাক লাগছিল। বাঘের মাংসপেশীতে, বিশেষ করে তার ঘাড় আর দাবনার পেশীগুলোতে কী প্রচণ্ড শক্তি।

বাঘের ঘাড়ের পেশীগুলোর নিচে আছে শমশের সদৃশ ছুটি ছোট হাড়। অন্যান্য অস্থির সঙ্গে ঘাড়ের ছুই পার্শ্বস্থিত এই হাড় ছুটোর কোনো যোগ নেই। একমাত্র বিড়াল জাতীয় প্রাণীদের শরীরেই এই হাড় আছে। হাড়ছুটোকে বলে 'লাকি বোন্' বা লক্ষ্মীমস্ত অস্থি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকের ধারণা, দিনের পর দিন যখন বাঘের আর শিকার জোটে না, তখন ঘাড়ের এই হাড়ের জায়গাটা জিভ দিয়ে চেটে সে নাকি ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। অনাবশ্যক দেখালেও, আমার মনে হয় হাড়ছুটো তার ঘাড়ের মাংসপেশীতে বাড়তি শক্তি যোগায়। বাঘ তার নিজের ওজনের চেয়ে বহুগুণ বেশি ভার এমন ছুরারোহ পথ বেয়ে এমন দূর দূর জায়গায় টেনে নিয়ে যায় যে, ভাবাই যায় না।

'মড়ি'র ভুক্তাবশেষ যেখানে পড়ে ছিল, সেখানে আমরা পৌঁছুলাম। পুরো জায়গাটা ছয়লাপ হয়ে আছে চাটদা আর বাসি হাড়ে। গরু-ছাগলের হাড়, জংলা জন্তুর হাড়। কোনো কোনো হাড়ের গায়ে আটকে-থাকা চিমসে চামড়া দেখে বোঝা যায় তার কতকগুলো চিতল আর শম্বরের।

বলিহারি অভ্যেস, তবে বাঘের রাজ্যে খুব একটা বিরল নয়। বাঘের খানা খাওয়ার এই নৈমিত্তিক জায়গা। আশেপাশে যেখানেই শিকার মারুক, তাকে টেনে হিঁচড়ে এইখানে নিয়ে এসে তারপর নিরিবিলিতে বসে খাবে। চেটানো ঘাসে ঢাকা এই সঙ্কীর্ণ জায়গাটা উপোষীমগুলের কাঁটাগাছে ভর্তি; জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে সরু সরু বাঁশের মত দেখতে প্রায় অভেদ্য এক ধরনের লম্বা লম্বা নলখাগড়া—স্থানীয় ভাষায় তার নাম নারকুল। পাহাড়ের ঢালের ওপর এই জায়গাটা একে শালগাছের ঘন জঙ্গলে ঢাকা, তার ওপর গাছগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে অতিকায় লতাগুল্ম আর ঝুলন্ত অর্কিড। মোষের বাচ্চাটার ল্যাজ, পায়ের খুর, মাথার শিং আর ঘন্টিটা ছাড়া আর প্রায় কিছুই পড়ে নেই। বাঘ মোষের ল্যাজটা দাঁত দিয়ে কেটে ফেলে দিয়েছে এবং সেটা পড়ে আছে ফুট চারেক দূরে। বাঘদের এ একটা অদ্ভুত অভ্যেস; বাঘের হাতে

খুন হওয়া যত গরুমোষ আমি দেখেছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেছি ল্যাজগুলো কেটে তারা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এটা শুধু বাঘদের মধ্যেই দেখা যায়, চিতাবাঘদের মধ্যে নয়।

সকালে আমরা গিয়ে পৌঁছেছি এগারোটায়। হলে হবে কি, তখনও বাঘের সেই খানা খাওয়ার জায়গাটা এত অন্ধকার আর ছায়াচ্ছন্ন ছিল যে, খুব দ্রুতগতিসম্পন্ন ফিল্ম আর এফ-২ লাইকা থাকা সত্ত্বেও এক্সপোজার মিটারের নির্দেশ অনুযায়ী লেন্সের দরজা প্রায় হাট করে খুলে দিতে হল।

গোটা কয়েক ছবি তুলে নিলাম। তারপর হাড়ের স্তূপের ভেতর থেকে গলার ঘণ্টিটা তুলে নিয়ে ফেরার পথে পা বাড়ালাম। এ বাঘটির ব্যাপারে আমাদের আদৌ কোনো আগ্রহ ছিল না।

বাঘকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আনবার জন্যে যে ক'জায়গায় আমরা মোষ বেঁধেছি, দেখা গেল তার সব ক'টিই একটু বেশি রকম জঙ্গলের মধ্যে—সেসব জায়গা থেকে ক্ষেতিবাড়ি অনেকখানি দূরে। গরুখেকো বাঘটাকে কব্জায় আনতে হলে আবাদ অঞ্চলের আরো কাছে সরে যেতে হবে। কেননা ক্ষেতিবাড়ির আশপাশের বনবাদাড় ছেড়ে বাঘটাকে বড় একটা ঠাইনাড়া হতে দেখে যায় না।

এলাকাস্থ এক শিকারী, বন্ধুস্থানীয় এক ফরেস্ট অফিসার আর গ্রামের মোড়ল—এই ক'জনের আমাদের একটা ছোটখাটো বৈঠক হল। ওদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে ঠিক করলাম, ফরেস্ট রেস্ট-হাউস ছেড়ে কাছাকাছি কোনো ক্ষেতিবাড়িতে এসে আমরা থাকব। রিজার্ভ ফরেস্টে বন্দুক ব্যবহারের বৈধ অনুমতিপত্র আমাদের ছিল। তা সত্ত্বেও আমরা ঠিক করলাম, পুরোপুরিভাবে খামার এলাকায় আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। দুটি বিষয় মনে রেখে আমরা এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এতে প্রথমত, গরুমারা বাঘ যে এলাকায় দৌরাত্ম্য করেছে, আমরা তার একেবারে মধ্যিখানে থাকতে পারব;

দ্বিতীয়ত, বনবিভাগের সীমাসরহদ্দের বাইরে যেতে পারলে নিয়মের বাঁধাবাঁধির হাত থেকে আমরা খানিকটা রেহাই পাব।

দিবালোকে-শিকার-করার নিয়মটিতে একমাত্র সেইসব 'শিকারী'-দেরই সুবিধে হয়—আদৌ তাদের শিকারী বলা যায় কিনা সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে—যারা জঙ্গলখেদার নাম করে যত পেশাদার পশুহন্তা, ভাড়াটে লোকলস্কর, হাতি আর হ্যান্ ত্যান্ নিয়ে বনজঙ্গলে চড়াও হয় এবং এমন সব কাণ্ড করে যে, দেখে মনে হবে যেন যুদ্ধবিগ্রহ হচ্ছে। ওদের বন্দুক ছোঁড়ার মধ্যে হাতযশ নেই, পুরোটাই ওদের পয়সার খেল্। ওরা চায় পোঁটলা বাঁধতে, শিকারের মজা পেতে নয়; চায় নিজের ঢাক পেটাতে, নিজেকে বশে আনতে নয়—এইসব ধনুর্ধর শিকারীদের আর কোনো লক্ষ্য, আর কোনো কর্ম নেই।

একমাত্র-দিবালোকে-বন্দুক-ছোঁড়ার এই একচোখো নিয়মকানুনে ঐসব বিটকেল ভড়ংবাজদেরই সুবিধে করে দেওয়া হয়েছে; শিকার-ক্রীড়ায় যাদের সত্যিকার অনুরাগ, যারা একা একা নিজেরা পায়ে হেঁটে শিকার করে—এই নিয়মকানুনে তাদের কোনো সুবিধে নেই। দিবালোকে শিকারের নামে শ'যে শ'যে লোকলস্কর আর হাতির পাল নিয়ে যারা চৌপহরদিন জঙ্গল তোলপাড় করে বেড়ায়, তাদের চেয়ে একা একজন শিকারী গহন বনে রাতভর সজাগ দৃষ্টিতে থেকে কী করে যে জানোয়ারদের বেশি কোতল করতে পারে বা বেশি ঘাঁটাতে পারে, এ আমার মাথায় আসে না।

নিজের সাহস পরখ করে দেখা আর বনের সব.চয়ে তুখোড় সবচেয়ে চৌকস জংলা জন্তুজানোয়ারদের টেক্কা দেওয়া—শিকারের মজাই তো এইখানে। তা নয়, হাতিশাল থেকে হাতির পাল জুটিয়ে, জঙ্গলখেদার জন্যে লোকলস্কর লাগিয়ে বেড়াজালে ঘিরে জানোয়ারকে তাড়িয়ে যারা মাচার নিচে আনিয়ে নেয় আর নিজেরা গাছের উঁচু ডালে নিরাপদে মাচা বেঁধে বসে থাকে, সামনে হাজির করা জানোয়ারের চালচলন স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে যাদের বিন্দুমাত্র কোনো

ধারণা নেই—তারা কী করে পাবে শিকারের মজা বা গৌরব! যে একা হাতে চতুর জানোয়ারের মহড়া নেয়, জঙ্গলের ওস্তাদ জানোয়ারকে যে জঙ্গলবিদ্যায় হার মানায়—মজা পাওয়া বা গর্ব করা তারই সাজে।

সামনে ঝোপের গায়ে ছায়ান্ধকার; ছায়া ভেদ করে চোখ ড্যাবডেবে করে আপনি ঠায় তাকিয়ে আছেন; হাতে মুঠো করে ধরা রাইফেল। আস্তে আস্তে সেখানে যখন আপনার বহুপ্রতীক্ষিত আগন্তুকের সাদা বুক আর প্রকাণ্ড মাথাটা ফুটে উঠল, তখন হঠাৎ আপনার মাথায় রক্ত চড়াৎ করে উঠে সারা শরীরে একটা নেশাচ্ছন্ন ভাব এনে দিল।

এ সময় যদি এতটুকু নড়াচড়া করেন, হাতের বন্দুক যদি কাঁধে ওঠাতে যান তো অবধারিত মৃত্যু; কেননা বাঘ তার দুটো বড় হলুদবর্ণ চোখ যতদূরসম্ভব টান টান করে সামনে তাকিয়ে আছে, আপনি সামান্যতম নড়লে চড়লেও এখন সে দেখতে পাবে। যতক্ষণ না সে আপনার সামনে পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় গট গট করে হেঁটে গিয়ে পাশ ফিরে চেয়ে পেছনে কোনো শব্দ হয় কিনা দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে, ততক্ষণ আপনার বুকের মধ্যে ঢেঁকিতে যেন সমানে পাড় দিতে থাকবে, রক্তের মধ্যে ঝড়ের দামামা ক্রমশ সুর চড়িয়ে আপনার কানে তালা ধরাতে থাকবে—সেই অবস্থায় আপনাকে ঘাপটি মেরে থাকতে হবে।

এমনও হতে পারে যে, আপনি 'মড়ির কাছে ওৎ পেতে বসে রয়েছেন; আড়াল থেকে বেশ কিছুক্ষণ ভালোভাবে দেখে শুনে নিয়ে বাঘ এসে সেই মড়ির ওপর দাঁড়াল। তখনও কিন্তু আপনি এতটুকুও নড়াচড়া করছেন না। আপনি একেবারে জমে বরফ হয়ে গেছেন—আপনার চারপাশের নির্জীব জড়পদার্থের মতই আপনি তখন অচল অনড়। থেকে থেকে কেবলি আপনার স্নায়ুতটে এসে আছড়ে পড়ছে ধৈর্যের বাঁধভাঙা ঢেউয়ের পর ঢেউ, আর অপরূপ প্রাণচাঞ্চল্যে মন বিভোর হয়ে বোধশক্তিকে এলোমোলো করে দিচ্ছে।

বাঘের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা উচ্চগ্রামের শ্বাসাঘাত আর জিভে দরাজভাবে একটা চক-চক আওয়াজ করে বাঘ তার বিশাল মাথাটা 'মড়ি'র কাছে নামিয়ে নিয়ে গেল; এই হচ্ছে সময়। আস্তে আস্তে, খু-ব আ-স্তে আ-স্তে র ইফেলটা আপনার কাঁধে উঠল; এবার হাত স্থির রেখে নিশানা করা—নিশানাটা ঘাড় আর প্রকাণ্ড মুণ্ডুর সন্ধিস্থলে হলেই ভাল হয়, অথবা কল্জে বরাবর, সামান্য একটু নিচেয় কাঁধের হাড়ের কাছাকাছি, বুকের পাঁজরের ঠিক মাঝখানে; তারপর বন্দুকের ঘোড়ায় আলতোভাবে একটু মোচড় দেওয়া।

রাইফেল রণরণিয়ে উঠে প্রতিধ্বনিত হল এক সঘন গর্জন। নড়া নয়, বিন্দুমাত্র নড়া নয়; মনে রাখবেন বাঘ শিকারে এ হচ্ছে সবচেয়ে বিপদজ্জনক মুহূর্ত। বাঘ যদি তৎক্ষণাৎ মারা না গিয়ে থাকে, সাংঘাতিকভাবে জখম হয়ে যদি ধারেকাছেই থেকে থাকে, তাহলে গুলি লাগার প্রথম ধাক্কাটা সামলে ওঠার পরই তার চেষ্টা হবে নজর করে দেখা—কে তাকে এই ভোগান্তিতে ফেলেছে। ঘাবড়ানোর দরুনই হোক আর উত্তেজনার বশেই হোক, কেউ একবার যদি এতটুকু নড়েচড়ে সেই ক্রুদ্ধ বাঘকে নিজের অবস্থানের কথা জানিয়ে দেয়, তাহলে স্বয়ং শিবেরও সাধ্যি নেই তাকে রক্ষা করে।

এইসব যখন ঘটে, তখনকার উত্তেজনা আর রোমাঞ্চের সঙ্গে দুনিয়ার এমন কী আছে যার তুলনা চলতে পারে?

দমাদ্দম ঢাক পিটিয়ে হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দে মারণযজ্ঞের অনুষ্ঠান; মগডালে মাচা বেঁধে বসা আর 'আগে বাঁচো'র নীতিকথায় মানইজ্জত খোয়ানো; পয়সা দিয়ে লোক লাগিয়ে নির্বিকারে জীবহত্যা করা আর হাতির বহর সাজানো—এসব যারা করতে চায়, তারা করুক। কিন্তু যে প্রকৃতিপ্রেমিক, সে জঙ্গলের মধ্যে নিশুতি রাত্রে একা একা জেগে থেকে চোখকান খাড়া রাখবে; অরণ্যের নির্জনতায় যে শিহরণ, যে কাব্যমাধুরী—একমাত্র প্রকৃতিপ্রেমিকেরই তা অনুভূতিগোচর হবে। শুধু প্রকৃতিপ্রেমিকই পারে তার হৃদয়তন্ত্রীকে নিস্তব্ধ নিশীথিনীর সুরে বেঁধে নিতে।

কতকগুলো মূঢ় অর্থহীন আইনকানুনের নামে ক্রীড়ানুরাগী আর প্রকৃতিপ্রেমিকদের এই সুখ আর নির্দোষ আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে নিরেট আমলার দল নিজেদের কাজেকর্মে এটাই প্রমাণ করছেন যে, তাঁদের বোধশক্তির নিতান্ত অভাব।

একটু আগে আমি বলেছি, গুলি করবার ঠিক পরমুহূর্তেই আহত বাঘকে ঘুণাক্ষরে যদি নিজের অবস্থিতি জানতে দেওয়া হয় তাহলে বিপদ অনিবার্য—কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। এর একটা সবচেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী মিসেস স্মাইদিস্; তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়ে দেশবিদেশের কাগজে ফলাও করে এই খবরটি বেরিয়েছিল। কাহিনীটি বলছেন এমন একজন যিনি চোট-খাওয়া বাঘের মুখ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরেছেন—শিকারের ইতিহাসে এ এক অদ্বিতীয় ঘটনা।

এটা ঘটে ১৯২৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। ভদ্রমহিলার স্বামী ছিলেন একজন ফরেস্ট অফিসার। তরাইয়ের জঙ্গলে তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে গিয়েছিলেন শিকার করতে। জুয়ালাসাল শুটিং ব্লকে তাঁরা শিকার করে বেড়াচ্ছিলেন। জায়গাটা বড় সুন্দর; লম্বা লম্বা ঘাস আর উঁচু উঁচু গাছের ঘন জঙ্গলের নিচে একফালি সমতল জমি; তার একপ্রান্তে শৈলশিরা আর পাহাড়তলাতে ছেঁড়াখোঁড়া হিমালয়ের পয়লা পাদপীঠ। স্বামীর পৃষ্ঠরক্ষী হিসেবে ভদ্রমহিলা বসেছিলেন গজ চাল্লশ তফাতে একটা ঝাকড়া টুন্ গাছের ওপর মাটি থেকে চোদ্দ ফুট উঁচুতে বাঁধা একটা মাচায়। বাঘটাকে তাড়িয়ে মিঃ স্মাইদিসের সামনে আনা হলে তিনি দু দুবার গুলি করলেন, কিন্তু একটা গুলিও বাঘের গায়ে লাগল না। বাঘ না থেমে যেমন এগোচ্ছিল তেমনি এগিয়ে গেল। তিরিশ গজ যাবার পর যখন সে মিসেস স্মাইদিস্‌কে পেরিয়ে যাবার উপক্রম করছে, ঠিক সেই সময় ভদ্রমহিলা বন্দুক ছুঁড়লেন। বাঘ পড়ে গেল; গুলিটা আরেকটু হলেই তার শিরদাঁড়ায় গিয়ে লাগত। ভদ্রমহিলা দ্বিতীয়বার গুলি করলেন, কিন্তু এবারও ফস্‌কাল। এরপর কী ঘটল, সে বৃত্তান্ত 'ইলাস্ট্রেটেড

উইক্‌লি অব ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশিত তাঁর নিজের লেখা থেকে তুলে দিচ্ছি :

দ্বিতীয়বার যখন গুলি করি, আমার নড়াচড়া বাঘের নিশ্চয় চোখে পড়ে যায়—কেননা সে তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা আমার গাছ লক্ষ্য করে আগের চেয়েও চড়া গলায় গাঁক গাঁক করতে করতে ছুটে আসে। আমি ভেবেছিলাম বাঘটা বুঝি পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎ আমার হুঁশ হল, বাঘটা গাছ বেয়ে আমার মাচা বরাবর খাড়া উঠে আসছে। পড়ি মরি করে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি, ততক্ষণ বাঘের ডোরাকাটা প্রকাণ্ড মাথা আর থাবা মাচার ধার বরাবর এসে গেছে ; বাঘটা মাচায় উঠতে চেষ্টা করছে, চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি।

তার হাঁ-করা প্রকাণ্ড মুখ, রক্ত-লাগা লাল টকটকে দাঁত ; একেকবার ডাক ছাড়ছে আর সেই সঙ্গে তার মুখের রক্ত-লাগা ফেনা ছিটকে এসে আমার টুপি আর জামাকাপড় ভিজিয়ে দিচ্ছে। আমি তার হাঁ-করা মুখের ভেতর দিয়ে রাইফেলের নলটা একেবারে গলার মধ্যে (নলের মুখ থেকে আট ইঞ্চি ওপরে তার দাঁত বসানোর দাগ আজও রয়েছে) চালিয়ে দিয়ে ঘোড়া টিপলাম বটে, কিন্তু গুলি ছুটল না।

তখন আমার ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা, কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না। রাইফেলটা নিয়ে বাঘে আমাতে রীতিমত টানা-হেঁচড়া চলেছে, আমাকে ও বেশ ঝাকাচ্ছে—এমন সময় দেখি, মাচার দড়িদড়া ছিঁড়ে ওর বিশাল থাবাটা ওপরে উঠে এসেছে ; তাই দেখে পিছু হটতে গিয়ে আমি নিশ্চয় একেবারে মাচার একধারে বেমক্কা পা ফেলেছিলাম, পরক্ষণেই টের পেলাম আমি পড়ে যাচ্ছি।

মাটিতে পড়ার অনুভূতিটা আমার মনে নেই, তবে তার ঠিক পরের অবস্থাটা মনে আছে—ঘাস-আগাছার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, কেটে-ফেলা গাছের গুঁড়িগুলোর ওপর দিয়ে পড়ি-

মরি করে আমি ছুটছি আর প্রতি মুহূর্তেই ভাবছি এই বুঝি বাঘ আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল।

খুব বরাতজোর স্মাইদিস্ সাহেব তাঁর মাচা থেকে গুলি করে বাঘের ঠিক কল্‌জেটা ফুঁড়েছিলেন, তার ফলে, বাঘটা গাছের ওপর থেকে মৃত অবস্থায় মাটিতে এসে পড়ল।

সে যাই হোক, লোক লাগিয়ে শিকার করবার কথা কখনও আমাদের মনেও স্থান পায় না—না আমার, না আমার বন্ধুর, তাছাড়া গরুচোর বাঘ বইতে লেখা সময়সূচী মেনে চলবে, এমন ভাবাটাও হবে আমাদের দিক থেকে মূঢ়তা। সুতরাং আমরা ঠিক করলাম, বন-বিভাগের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকা ছেড়ে ক্ষেতখামারের এমন জায়গায়, আমরা চলে যাব যেখানে কৃষকেরা নিজেদের জানমাল বাঁচাবার জন্যে স্বচ্ছন্দে ঠগডাকাত নিকেশ করতে পারে। জঙ্গলে আসার চতুর্থ দিনে এইভাবে আমরা বোঁচকাবোঁচকি কাঁধে ফেলে নতুন জায়গায় গিয়ে উঠলাম।

পরদিন সকালে আর বিকেলে আমরা এলাকাটির কোথায় কী আছে, ঘুরে ঘুরে খোঁজ নিয়ে এলাম আর দেখে এলাম বাঘটা এই কমাসে কোন কোন জায়গা থেকে গরুমোষ শিকার করেছে। ধাকরিয়া নামে নিরিবিলি একটা গ্রামে আমরা ঘাঁটি গাড়লাম। গ্রামটি ..চলংশু .ন তার পুব পাড় এবং তার বাকি তিনদিকে ছড়ানো গিরিদরির প্রশস্ত গিরিখাত আর রকমারি খোয়াই আর সেই সঙ্গে বেশ ঘন উন্মুক্ত শালবন নদীর দুদিকে এই রকমের আরও যেসব গ্রাম ছড়িয়ে আছে. সে সব গ্রামে পাল পাল গরুমোষ থাকে। আসলে এই জায়গাগুলো গড়ে ওঠে মূল জনপদের ফাঁড়ি হিসেবে—এই জায়গাগুলো চাষবাসের চেয়েও বেশি ব্যবহার হত গোপালনের ক্ষেত্র হিসেবে। গোচারণের সুবিধের জন্যেই এখানে ক্রমশ গরু-মোষের সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে, কাজেই গরুচোর বাঘের পক্ষে

এইসব জায়গায় কাছেপিঠে থাকাটা খুবই লাভের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

এলাকাটি দেখবার জন্যে আমরা চক্কর দিচ্ছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে আমরা নালার মধ্যে এক জায়গায় বাঘের পায়ের দাগ দেখতে পেলাম; এটা বাঘের নিত্যনৈমিত্তিক পথ; রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে এইখান দিয়েই সে ক্ষেতিবাড়িতে গিয়ে ঢোকে। এটাকেই আমরা আমাদের ভবিষ্যতের কার্যক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলাম। সবচেয়ে ভালো হত আর ফার্লংখানেক এগিয়ে যেতে পারলে—যেখানে নালার শুকনো খাতটি সাপের চেরা জিভের মত দো-ফলা হয়ে আছে আর যার গোড়ায় রয়েছে কাছাকাছি কাঁটাগাছের বিরাট ঝোপ। বন থেকে এই জায়গাতেই বাঘ বেরিয়ে আসত। তারপর সে হাঁটতে হাঁটতে যেত হয় নালা বরাবর ভাটিমুখো, নয় নালাটার ফ্যাকড়া বরাবর ঘুরে ক্ষেতখামার এলাকায়। কিন্তু বনবিভাগের এলাকাধীন হওয়ায় এবং হাজারগণ্ডা বিধিনিষেধের ঠেলায় রাত্তির বেলায় ওখানে গুলি ছোঁড়া যাবে না। কাজেই আমাদের পরিকল্পনা থেকে জায়গাটাকে বাদ দিতে হল—কেননা, এই বাঘটি তার শয়তানী বুদ্ধি খাটিয়ে এমনই একটি অভ্যেস দাঁড় করিয়ে ফেলেছিল যে, গুলি ছোঁড়ার নির্দিষ্ট সময়টি পার করে দিয়ে তার অনেক পরে নিজের ডেরা ছেড়ে সে বেরিয়ে আসত। অগত্যা বেশি ভালোর বদলে কম ভালো জায়গাটা আমরা বেছে নিলাম।

পাড় থেকে একটু নেমে নালার তলদেশ থেকে ফুট সাতেক উঁচুতে মাটিতে গর্ত করে আমরা বসবার ব্যবস্থা করলাম; গর্তের পাশগুলো আর সামনেটা সবুজ পাতা সমেত টাটকা ডালপালা দিয়ে ঢেকে দিলাম। বাঘ শিকারে এই গুপ্ত আশ্রয়স্থলটি খুব জরুরী; মাটিতেই হোক আর গাছেই হোক, আত্মগোপনের যথাযথ ব্যবস্থা চাই—কেননা শিকার করতে পারা না পারা এরই ওপর সম্পূর্ণ না হলেও প্রধানত নির্ভর করে। সযত্নে এমন একটা জায়গা বাছতে হবে, প্রথমত, যেটা সরাসরি বাঘের রাস্তার মধ্যে পড়ে না—বাঘ

তাহলে আর পেছনদিক থেকে এসে পড়তে পারবে না; দ্বিতীয়ত, জায়গাটা যেন দৃষ্টি আকর্ষণ না করে; তৃতীয়ত, অনেক দূর থেকে জায়গাটা যেন নজরে না পড়ে। চারপাশে যেসব গাছপালা হয়, হুবহু সেইসব গাছের পাতা আর ডাল দিয়েই গোপন আশ্রয়স্থলটি ঢাকতে হবে এবং সেসব এমন জুতসই করে সাজাতে হবে, যাতে দেখে মনে হয় গাছগুলো ও-জায়গায় প্রকৃতই জন্মেছে।

সব সময় টোপের যথাসম্ভব কাছে বসা ভালো এবং স্বচ্ছন্দে আত্মবিশ্বাস নিয়ে যতটা পারবেন আপনার উদ্দিষ্ট শিকারের সঙ্গে মাথায় মাথায় সমান সমান হয়ে বসবেন। আমি আমার টোপ অথবা 'মড়ি' থেকে কখনই বিশ গজের চেয়ে বেশি দূরে বসি না, আমার ক্ষেত্রে প্রায়ই এই দূরত্ব হয় দশ গজ, কখনও কখনও তার চেয়েও কম। আমি মাটিতে বসা পছন্দ করি, কারণ তাতে জানোয়ারের মাথার সমতলে থাকা যায়—ভালোভাবে গুলি ছোঁড়ার আর তার ফলে নিরাপদে শিকার করার ব্যাপারে এতে বিস্তর সুবিধে হয়। তবে এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত, এবং হয়ত এটা যার যেমন অভিজ্ঞতা যার যেমন অভিরুচির ব্যাপার—কোনোকালেও নিয়ম বেঁধে দেওয়া যায় না।

আমার এই কথা থেকে ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন মনে করে না বসেন যে গাছের ওপর না উঠে মাটিতে থাকেন যিনি পছন্দ করেন তিনি একজন অসাধারণ সাহসী বীরপুরুষ। নিজের সম্বন্ধে আমি বলতে পারি, আমি সে রকম বীরপুরুষ নই। আমি ভয় পাই, আমি ঘাবড়াই এবং সম্ভবত মূলগত দিক থেকে সকলের অনুভূতিই এক। ভয় জিনিসটি স্বভাবধর্মী। ভয়ের সাহায্যে আমরা বিপদ সম্বন্ধে সজাগ হই এবং সে সম্পর্কে আমাদের অবহিত হতে হয়। আত্মরক্ষার্থে হুঁশিয়ার করার এই সহায়ক ব্যবস্থা সমস্ত জীবদেহেই আছে। বিপদসঙ্কেত পেয়ে নিজের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে নিজের দখলে রাখা এবং ভয়ের মুখোমুখি হয়ে ভয়কে হার মানানো--এই একটা জিনিসই মানুষের পক্ষে সম্ভবও বটে, উচিতও বটে।

যেসব লোক গাছের মাচা পছন্দ করেন—যাঁরা নতুন শিকারে যেতে শুরু করেছেন এবং যাঁরা কচিৎ কদাচিৎ শিকারে যান, তাঁদের পক্ষে মাচা জিনিসটা বোধহয় এইদিক থেকে বরং ভালো যে, এতে তাঁরা এমন একটা আত্মবিশ্বাস পাবেন, যার ওপর নির্ভর করে সাফল্যের শতকরা ৯০ ভাগ—নিচের কয়েকটা কথা মনে রাখলে তাঁরা ভালো করবেন

যে গাছে মাচা করা হবে তার স্থান, অবস্থান, লক্ষণীয়তা ইত্যাদি ব্যাপারে উপরোক্ত বিষয়গুলি মানা ছাড়াও দেখতে হবে গাছটির গুঁড়ি যেন বেশ পোক্ত হয়, ডালপালাগুলো যেন মজবুত হয় এবং পাতাগুলো যেন ঘন হয়। দেখতে হবে ওজনের ভারে কিংবা দমকা বাতাসে মাচা যেন না দোলে। কেউ যদি চারপাইকে মাচা হিসেবে ব্যবহার করতে চান, তাহলে দেখতে হবে চারপাইতে যেন ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ না হয় এবং পোকামাকড় না থাকে। চারপাইটি গাছের ওপর বাঁধবার আগে জলে ভিজিয়ে নিলে কোনোরকম আর আওয়াজ হবে না এবং রাতটা আপনি নির্ভাবনায় কাটাতে পারবেন। তাছাড়া চারপাইয়ের জোড়ের মুখগুলোতে যদি একটু তেল দিয়ে রাখেন, তাহলে বিনা আওয়াজে আপনি নিশ্চিন্তে আর নিঝঞ্ঝাটে থাকতে পারবেন।

জমি ছেড়ে বারো থেকে ষোল ফুট উঁচুতে মাচা বাঁধা নিরাপদ, দড়িতে যেন বিশেষ কোনো স্বর না থাকে। ঝোপঝাড় আগাছার আকারের ওপরে মাচার উচ্চতা নির্ভর করবে। ঘাস যদি খুব লম্বা হয়, নিচে ঘাসের মধ্যে এবং চারপাশে চেয়ে দেখার জন্যে মাচাও হবে উঁচুতে। মাচা এমন জায়গায় বাঁধতে হবে, যেখান থেকে বাধাবন্ধনহীনভাবে গুলি করতে পারা যাবে এবং পঁচিশ থেকে তিরিশ গজ অবধি চতুর্দিক দেখা যাবে। চারদিকে এবং তলায় ডালপালা দিয়ে এমনভাবে আড়াল করতে হবে যাতে শিকারীকে কোনোদিক দিয়ে না নজরে পড়ে। তলার দিকটা ঢাকতে হবে খুব ভালো করে। এই কাজটা বিশেষ দরকারী এবং অনেকেরই সেদিকে খেয়াল

থাকে না। ডালপালা লাগাবার সময় উপরোক্ত নিয়মগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করা দরকার, ডাল বা পাতাগুলো যেমন তেমনভাবে যেন সাজানো না হয়—দেখতে হবে, মাচাটা যেন দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। সামনে আড়াআড়িভাবে একটা পাল্লা ফেলে তাতে রাইফেলটা ঠেস দিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। মাচা বাঁধার এটি একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আপনাকে হয়ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হবে; সারাক্ষণ রাইফেলটা ঠায় হাতে করে নিয়ে বসে থাকলে হাত ধরে আসবে. কিংবা পাশে শুইয়ে রাখলে পরে ওঠাবার সময় ডালপালায় কিংবা কাপড়ে বেধে যেতে পারে, তার চেয়ে পাল্লায় ঠেস দিয়ে রাখলে যেকোনো সময় বাগিয়ে ধরে গুলি করবার সুবিধে হবে। পাল্লাটি ফিকে রঙের দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধতে হবে, যাতে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ না হয় এবং যাতে খুলে পড়ার ভয় না থাকে। গুলি ছোঁড়ার সময় পাল্লার গায়ে রাইফেলটা লাগিয়ে রাখলে নড়েচড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না; কিন্তু সেক্ষেত্রে বন্দুকের নল আর পাল্লার মাঝামাঝি জায়গায় হাত রাখতে হবে, তা নইলে শক্ত ঠেকোর দরুন বুলেট উঠে গিয়ে লক্ষ্যস্থল এড়িয়ে চলে যাবে। পাল্লাটা যেন বেশি উঁচু করে বাঁধা না হয়, বেশি উঁচু হয়ে গেলে নিচে মড়ির দিকে মুখ করে গুলি ছোঁড়া সম্ভব হবে না।

যে গাছে পাতা নেই তেমন গাছ কখনও বাছবেন না। পিঠে ঠেস দেওয়ার জন্যে পেছনে যেন মোটা গুঁড়ি কিংবা দুটো ডালের জোড়ের মুখ থাকে। ওল্টানো চারপাইয়ের দুটো পায়ের সঙ্গে ডাণ্ডা বেঁধে তাতে আরামে ঠেস দিয়ে বসে এর অভাব মেটাতে পারেন। কম জায়গার মধ্যে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হলে অনবরত আপনাকে নড়েচড়ে বসতে হবে এবং তাহলেই সদাসতর্ক বাঘ চোখে দেখে কানে শুনে আপনার উপস্থিতি টের পেয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত. অস্বস্তিকর অবস্থায় বসে থাকতে থাকতে আপনার হাতপা ধরে আসবে এবং অবসন্ন ক্লান্ত দেহে তখন আর কারো পক্ষেই সিধে অভ্রান্ত লক্ষ্যে গুলি করা সম্ভব নয়। মাচা হবে মজবুত, প্রশস্ত,

আরামদায়ক এবং চোখকে ফাঁকি দেওয়া ; সামনে রাইফেলের ঠেকো আর পেছনে হেলান দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে ; দমকা হাওয়ায় দুলে উঠবে না এমন এক গাছের ডালে মাচাটি বাঁধতে হবে। শিকারের গায়ে অব্যর্থভাবে গুলি লাগাতে হলে চাই এই ধরনের যথোপযোগী মঞ্চ।

আমরা জ্যান্ত টোপ বেঁধে চৌপর রাত পাহারায় থাকব সাব্যস্ত করলাম; ঠিক করলাম দুজনে একসঙ্গে আমরা পালা করে রাত জাগব। নিহত জানোয়ারের কাছে বাঘ সাধারণত বিকেল চারটে থেকে সন্ধের মধ্যে ফিরে আসে, তার আগে আসে কদাচিৎ এবং রাত ন'টার পর আদৌ আসে না বললেই হয়। এই 'মড়ি'র কাছে সে আসে চারদিক দেখেশুনে খুব সন্তর্পণে। বাকি খাবারের কাছে ঘেঁষবার আগে টিলার ধারে কিংবা অন্য কোনো জুতসই জায়গায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে লুকিয়ে বসে থেকে সে বেশ বুঝেশুনে নেবে সন্দেহ করবার মত কোথাও কিছু আছে কিনা। যখন নিঃসংশয় হবে—সাধারণত সন্ধে নাগাদ—তখনও কিন্তু খাবারের কাছে সটান যাবে না। দুশো গজের মধ্যে থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে চক্কর দেবে; বিশ তিরিশ গজ অন্তর অন্তর একবার করে থামবে। আধ ঘণ্টা নিঃসাড়ে বসে ঝোপের আড়াল থেকে তার চারপাশের প্রত্যেকটি ডালপালা আর পাথর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। যে মাচায় বসে থাকে, এই সময়টাই তার কাছে সবচেয়ে উদ্বেগজনক। নিথর নিস্পন্দ থাকার জন্যে তাকে তখন দাঁতে দাঁত দিয়ে যৎপরোনাস্তি ধীরস্থির হয়ে থাকতে হয়। কখনও কখনও আমার এমন হয়েছে যে, মাচার ঠিক পেছনেই বাঘের নিশ্বাসের আওয়াজ পাচ্ছি অথচ আমার পক্ষে তার দিকে ফিরে তাকানো সম্ভব হচ্ছে না।

চূড়ান্ত পর্যায়ে বাঘ হয়ত সত্তর গজ দূরে বসে পাঁচ দশ মিনিট ধরে জঙ্গলটা জরিপ করবে; তারপর আরও বিশ গজ হেঁটে আবার বসে পড়বে। 'মড়ি'র কাছে পৌঁছুবার শেষ পঞ্চাশ গজ যেতে তার

হয়ত পুরো একটি ঘণ্টা লাগবে ; প্রতিটি পদক্ষেপেই তার সর্বদা বিষম সন্দেহ আর ভয়। বাঘ সাধারণত এই প্রাথমিক তদন্তকালেই শিকারী আর তার মাচার খোঁজ পেয়ে যায়। গরু-চোর বাঘ নির্ঘাৎ আপনার গাছের দিকে তাকাবে এবং আশেপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলবে। আপনি কতকটা আড়ালে আছেন, কিন্তু ভুলেও যেন একচুল নড়বেন না।

বাঘ অবশ্য যেকোনো কোণ থেকে 'মড়ি'র দিকে এগোতে পারে ; আরও সেইজন্যেও আপনার উচিত একেবারে চুপচাপ থাকা। বাঘ যদি পেছন থেকে কিংবা পাশ থেকে আসে আপনি হয়ত তার আওয়াজটা ঠিক পাবেন ; কিন্তু বাঘ যখন 'মড়ি'র কাছে যাবে তখনই আপনি তাকে প্রথম দেখতে পাবেন ; তার আগে বড় একটা নয়।

পেছনে মট্ মট্ করে কাঠি ভাঙল, শুক্‌নো পাতায় মুচ মুচ করে শব্দ হল—এ থেকে আপনি বুঝতে পারলেন কেউ এসেছে এবং ঘুরছে ফিরছে—কিন্তু খবর্দার, পেছনে তাকাবেন না ; আপনাকে নজর রাখতে হবে 'মড়ি'র ওপর, সেখানে বাঘের যাওয়া পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। কষ্টকর আর রোমহর্ষক এই প্রতীক্ষার মধ্যে গায়ে ম ত্যকার খঁটি রোমাঞ্চ, হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হবে আর তারপর যখন সে চোখের সামনে এসে দাঁড়াবে, সে এক পরমাশ্চর্য দৃশ্য !

মড়ি'র ক্ষেত্রে যদি রাত্তির ন'টার মধ্যেও বাঘের টিকি দেখা না যায়, তাহলে এ বিষয়ে প্রায় ধরেই নিতে পারেন যে, বাঘ হয় আপনার গুপ্ত আশ্রয়স্থলে আপনাকে দেখে ফেলেছে আর তা না হলে তার অস্তুত সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে. আপনি যতক্ষণ ও-জায়গায় বসে থাকবেন, ততক্ষণ আপনার সামনে সে সুড় সুড় করে গিয়ে হাজির হবে এমন কোনো আশা নেই। আপনি সেখান থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ার পর সে আসতে পারে ; ও আগে নিজের চোখে দেখবে আপনি আপনার ব্যর্থতা আর অযোগ্যতার বোঝা ঘাড়ে করে গুটি গুটি পায়ে চলে যাচ্ছেন, তবেই সে আসবে ; তার আগে নয়।

কিন্তু জ্যান্ত টোপে বসার ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। সেক্ষেত্রে বাঘের দেখা দেওয়ার কোনো সময় অসময় নেই। যে কোনো সময় সে এসে পড়তে পারে, আবার আদৌ না আসতেও পারে। কিন্তু এতে যেমন অসম্ভব মজা আছে, তেমনি অনেক কিছু জানাও যায়। আপনার লুকোবার জায়গার সামনে দিয়ে বাঘ যদি নাও যায়, রকম রকম জানোয়ারের আনাগোনা দেখতে পাবেন। গহন বনের মধ্যে একা বসে আপনি রাত জাগছেন, আপনি যেন মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে থেকে প্রাকৃতিক পরিবেশে জঙ্গলের জীবন দেখছেন ; তাতেই আপনার বাঘ না পাওয়ার দুঃখ বেমালুম ঘুচে যাবে।

বিকেল চারটেয় আমরা সেই নির্বাচিত স্থানে এসে গেলাম। আমাদের গোপন আশ্রয়স্থল থেকে হাত তিরিশেক দূরে নালার বালিয়াড়িতে একটা কাঁচ মোষ বাঁধা হল। আমাদের জায়গাটা যেমন বড়সড় তেমনি বেশ আরামপ্রদ ; গাছ থেকে টাটকা টাটকা পাতায় চারপাশ সাজানো হল। চোখকে ফাঁকি দেবার সব রকম উদ্যোগ আয়োজন শেষ করে আমরা নিশ্চিন্তে পাহারা দেবার জন্যে গ্যাঁট হয়ে বসলাম।

আমাদের দুজনেরই হাতে ·৩৭৫ এইচ. অ্যাণ্ড এইচ. ম্যাগনাম রাইফেল ; তাতে ২৫ এক্স দূরবীক্ষণ যন্ত্র বসানো। বন্দুকের দৃষ্টিসহায়ক এই কলটি এমন কি রাত্তিরে গুলি ছোঁড়ার পক্ষেও খুব কাজের। মানুষের খালি চোখে যেসব আলো সাধারণত দৃষ্টিগোচর হয় না, এই যন্ত্রে সেসব আলোও ধরা পড়ে এবং এর ভেতর নিশানার বিন্দুতে লক্ষ্যবস্তু নিকটতম হয়ে দেখা দেয়। লক্ষ্যবস্তু আর মাছিটাকে সমতলে এনে যন্ত্রটি চোখের কষ্ট দূর করে আর তার ফলে অনেক সহজে ঢের নিখুঁত লাগসইভাবে গুলি করা সম্ভব হয়।

অস্ত্রশস্ত্রগুলো ঠিক আছে কিনা চূড়ান্তভাবে যাচাই করে দেখে নিয়ে, রাইফেলে কার্তুজ ঠুসে দিয়ে, সেফ্‌টি ক্যাচ খুলে রেখে

রাইফেলগুলো সামনের পাল্লায় আমরা ঠেস্ দিয়ে রাখলাম। থার্মস বোতল থেকে দু কাপ চা ঢেলে নিয়ে দুই বন্ধুতে খেলাম; তারপর দিনের শেষ সিগারেটে সুখটান দিয়ে যখন আমরা তৈরি হয়ে বসলাম, তখন আমাদের কানে মধু ঢালছে জঙ্গলের ঘনায়মান সন্ধ্যার বিচিত্র সুর আর চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছে চারপাশে রং-বদলের জমকালো ছবি।

পশ্চিমের দিক্‌চক্র আড়াল করা পর্বতশ্রেণীর একপাশে সরে গিয়ে সূর্যদেব এইমাত্র পাটে বসলেন।

জঙ্গলটা থমথম করছে। এমন সময় এসে গেল মুখপোড়া হনুমানদের একটা দঙ্গল। এ ডাল থেকে ও ডালে, এ গাছ থেকে ও গাছে ওদের লম্ফঝম্পের ঠেলায় ধারেকাছের গাছগুলো থরহরি কম্পমান হচ্ছে। একজন দু জন করে গাছ থেকে ধুপধাপ নেমে পঞ্চাশ জনের পুরো দলটা গিয়ে নদীর শুক্‌নো খাতে ভিড় করল। মা-হনুমানদের কোলে বাচ্চা আক্‌ড়ে রয়েছে; বুড়ো হনুমানগুলোর বেজায় হাঁড়িমুখ, তাদের ল্যাজগুলো আকাশের দিকে উঁচানো—সভাসমিতিতে এসে রাষ্ট্রমন্ত্রীরা যে রকম ভাব করে, হুবহু সেইরকম আমিরীচালে তারা ঘুরছে ফিরছে; দুষ্টু ছেলেপুলের দল অনবরত তাদের বাপমায়ের চোখ এড়িয়ে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করছে। মায়ের দল বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়াতে শুরু করল আর হনুমান ছোঁড়াগুলো তাদের নিষেধমুক্ত জীবনের ধারা অনুযায়ী কামাত্মক ভঙ্গিতে নিজেদের সমবয়সী ছুঁড়িগুলোকে ঠেসে ধরতে লাগল।

বন জুড়ে বিরাজ করছে শান্তি; জঙ্গলের স্তব্ধতায় কানায় কানায় ভরে উঠেছে সন্ধ্যার প্রাণ-জুড়ানো প্রশান্তি—তার উপরতলায় কোনো ঢেউ নেই, তলদেশে কোনো ঘর্ণা নেই। অন্ধকার যত ঘনিয়ে আসছে অরণ্যের নৈঃশব্দ্যও তত গভীর হচ্ছে; আমাদের চারপাশে হাজার হাজার কীটপতঙ্গের ঝিঁচিরমিচির শব্দে আর আকাশে একা এক নিশাচর পাখির ভৌতিক পাখা-ঝাপ্‌টানিতে সেই নৈঃশব্দ্য আরও ভারী হচ্ছে।

আমাদের ডানদিকে পাহাড়ের পাশ অবধি টানা অন্ধকার গিরিখাতে একটা শম্বর হঠাৎ তীক্ষ্ণস্বরে ডেকে উঠল—'ট্যাঁক'। সঙ্গে সঙ্গে খান খান হয়ে ভেঙে গেল সেই স্তব্ধতা। হনুমানের দল তাড়াতাড়ি শশব্যস্ত হয়ে নিরাপদে গাছের ডালে উঠে বসল। কঠিন টান পড়ায় সন্ধেটা যেন অবসাদে নেতিয়ে পড়ল। শম্বরটা আবার একবার বিপদ্‌জ্ঞাপক আওয়াজ করতেই আধো-অন্ধকারের ফিনফিনে আবরণটা আরেকবার অস্বস্তিতে কেঁপে উঠল। শম্বরটা এবার আর স্থির থাকতে না পেরে বার বার সমানে ডাকতে শুরু করে দিল; তার দেখাদেখি আমাদের দিকের আরেকটু নিচু জায়গা থেকে চিতল হরিণের একটা দল ডাকতে লেগে গেল। আমরা বুঝতে পারলাম বড়-মিঞা নৈশ অভিযানে বেরিয়েছেন এবং ধীর পদবিক্ষেপে আমাদের দিকেই আসছেন। আমার ঘড়িতে তখন সাতটা বেজে পঁয়তাল্লিশ। আমরা যে যার রাইফেল শক্ত করে বাগিয়ে ধরলাম; আমার বন্ধুটির খুব শখ ছিল বিশেষ করে এই গোখাদক বাঘটিকে মারবার; ঠিক হল, প্রথম গুলি সে-ই ছুঁড়বে।

বিপদ্‌সঙ্কেত যখন এইভাবে পরের পর ধ্বনিত হতে হতে চলেছে, তখন উল্টোদিক থেকে ভেসে এল অন্য একটি ভীতসন্ত্রস্ত শম্বরের ডাক। সাধারণ হুঁশিয়ারি হিসেবে এই ডাকেও সবাই সাড়া দিয়ে উঠল। দ্বিতীয় আরেকটি বাঘের উপস্থিতি ঘোষণা করল প্রথমে একটি কুটরা এবং তার পর চিতলের দল।

এ তল্লাটে দু দুটি বাঘ শিকারে বেরিয়েছে; আমাদের সামনে কোন্‌টির প্রথম উদয় হবে আমরা জানি না; যাকে মনে করে ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আমাদের সেই বাঞ্ছিত অতিথির পায়ের ছাপ চ্যাটালো এবং এবড়ো-খেবড়ো। আর অযাচিত অতিথিটির পায়ের ছাপ স্ত্রীসুলভ অপ্রশস্ত এবং সমতল, তার প্রতি আমাদের দুজনেরই কারো কোনো আগ্রহ ছিল না। এখন দুটির মধ্যে কোন্‌টি প্রথমে আসবে কে জানে।

চারদিকের আবহাওয়ায় একটা কী-হয় কী-হয় ভাব। অধৈর্যের

নিরেট কষ্টিপাথরের নিশ্চল মূর্তির মত আমরা টান টান হয়ে বসে আছি—পড়ন্ত আলোর ভেতর আমরা সঞ্চালিত করেছি আমাদের প্রখর সন্ধানী দৃষ্টি।

দুই বিভিন্ন দিক থেকে দুটি বাঘের অগ্রসর হওয়ার খবর বিপদ্-সঙ্কেতে ক্রমাগত ধ্বনিত হচ্ছে। আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছি, যে বাঘটা আমাদের ডানদিক থেকে আসছিল, সে এখন এসে পৌঁছেছে নদীটা যেখানে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে সেইখানে। দ্বিতীয় বাঘটি এখনও পাহাড়ের সেই ঢালেই রয়েছে; সেখানে একটা কুট্‌রা 'হাঃ-হাঃ' শব্দ করে আকাশটাকে ফাটিয়ে ফেলতে চাইছে।

নদী যে জায়গায় দুভাগ হয়েছে তার মুখের কাছের চিতলের দল হুড়মুড় করে পাগলের মত ছুটতে শুরু করল; নালার ভেতর দিয়ে একদল এল আমাদের দিকে, বাকি সবাই ভাটিমুখো ছুটে নদীর ওপারের খোলা জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। আমরা রাইফেল বাগিয়ে ধরে থাকলাম—ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়নপর চিতলগুলোর পিছু নিয়ে বাঘ এই-আসে এই-আসে ভেবে। কাছেই একটা ঝোপে সশব্দ হুটোপাটি শোনা গেল আর পরক্ষণেই ভারি সুন্দর একটা চিতল হরিণ হুড়দাড়িয়ে ঝোপ ভেঙে নালার ভেতর লাফিয়ে পড়ল। তার পেছন পেছন বেরিয়ে এল কয়েকটা হরিণী আর গোটা দুই হরিণশিশু: ওরা বালির ওপর যেখানে গিয়ে দাঁড়াল, তার অদূরে আমাদের মোষটা পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে। ওরা টান টান হয়ে দাড়িয়ে, ঘাড়গুলো নদীর দিকে ফেরানো এবং ক্ষীণতম আওয়াজ যাতে শুনতে পায় তার জন্যে ওদের ঘণ্টার মত কানগুলো খাড়া হয়ে আছে। ওদের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব খুব বেশি হলে পঁচিশ গজ।

নদী আর নালার মধ্যে যে ঘন ঝোপঝাড়, সেটা ছাড়িয়ে দুধারা হওয়ার জায়গা থেকে আরেকটু ভাটির দিকে একটা ভীতসন্ত্রস্ত শেয়াল থেকে থেকে 'ফে-উ' 'ফে-উ' করে ডাকছিল। আরও নিচের দিকে কিছুক্ষণ পর চিতলের দল 'ট্যাউ' 'ট্যাউ' করে চিৎকার জুড়ে

দিল—মদ্দা চিতলদের ভরাট হেঁড়ে গলা আর মাদী চিতলদের খ্যানখেনে কর্কশ স্বর।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম বাঘ ভুল রাস্তায় গেছে। নালার দিকে ঘুরে না গিয়ে সে গেছে ভাটির দিকে—আমরা এদিকে তার জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে আছি।

অন্য বাঘটিও আমাদের এদিকে ঘেঁষে নি; সে গেছে ও-বাঘটির চেয়েও আরও বেশি তফাৎ দিয়ে, টিলা পার হয়ে—যেখানে কুট্‌রা আর শম্বরের দল পর্যায়ক্রমে চিৎকার করে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছিল কখন কোন্ পথে সে যাচ্ছে।

আমাদের মনে হল, আমরা বেজায় বেকুব বনে গিয়েছি। নদীর ক্যাকড়ার কাছে না বসে আমরা বোকামি করেছি—কেননা বন্দুক ছোঁড়ার অনুমোদিত সময়-সীমার মধ্যেই তো বাঘ বেরিয়ে এসেছিল। বাঘকে পাবার এখন একমাত্র সম্ভাবনা থাকছে, সারা রাত জঙ্গল চুঁড়ে কাল খুব সকালের দিকে যখন সে ফিরে আসবে—তাও আবার অন্য কোথাও যদি সে শিকার খুঁজে পায় এবং অন্য কোনো ঝোপে ঘুমোবার ব্যবস্থা করে, তাহলে আর তাকে পাবার আশা নেই। অগত্যা ডাণ্ডার গায়ে আমাদের রাইফেলগুলো ঠেকো দিয়ে রেখে, পিঠের কাছে হেলান দেবার জন্যে রাখা পাথরে ঠেস্ দিয়ে আমরা আরাম করে বসলাম।

জঙ্গলে আবার সেই চিলেঢা। নিঝুম ভাব ফিরে এল। একটানা ঝিঁঝির সেই ডাক আর হাজার হাজার কীটপতঙ্গের কিচির-মিচির করা বিচিত্র সে নিস্তব্ধতা। চিতল হরিণ তার হারেমসুদ্ধ সুন্দর ভঙ্গিতে হেঁটে ঘনায়মান সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের ভেতর মিলিয়ে গেল।

মোষটি আর আগের মত নিস্পন্দ নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে নেই। দিব্যি উঠে বসে এখন সে নিশ্চিন্তে জাবর কাটছে কেননা সে জানে বনের মধ্যে এখন যখন কোথাও বিপদ্‌জ্ঞাপক কোনো ডাক শোনা যাচ্ছে না, তখন বিপদ্ কেটে গেছে। আমি আমার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালাম। অন্ধকারে ঘণ্টার কাঁটাটা জ্বল জ্বল করছে—লক্ষ্য

করে দেখলাম কাঁটাটা আটটা থেকে ন'টার মধ্যে, আটটার চেয়ে বরং নটার কাছাকাছি। পরিতৃপ্ত রমণীর স্বপ্নহীন ঘুমের মত একেবারে শান্ত নির্বিকার রাত্রি। থেকে থেকে আমাদের মোষটার গলার ঘণ্টির ঠুন্ ঠুন্ শব্দ আর সঙ্গমের কাছে ছায়া-ছায়া বুড়ো গাছের মগডালে বসা একটা লম্বকর্ণ প্যাঁচার ক্রমাগত কুস্বর ছাড়া অন্য কোথাও আর একটাও বেতালা আওয়াজ ছিল না।

হাত আর পা কম্বলের ভেতর চালান করে দিয়ে পাথরে পিঠ ঠেকিয়ে দিব্যি আরাম করে বসে আমি আকাশের তারা দেখছিলাম। খুঁজতে খুঁজতে পাহাড়ের এক কোণে আমি সপ্তর্ষি-মণ্ডলকে পেয়ে গেলাম, তার শেষের দুটো তারা পাহাড়ের আড়ালে পড়ে গেছে। তারা দুটো দেখতে পেলে মনে মনে একটা রেখা টেনে এগিয়ে গেলে শেষকালে সোজা লাইন বরাবর পেয়ে যেতাম প্রথম উজ্জ্বল নক্ষত্রটিকে। তাহলে সেটাই হত ধ্রুবতারা; জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেললে ধ্রুবতারাই দিশারীর কাজ করে থাকে। আমি সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম—লুকানো তারা দুটো কতক্ষণে ফুটে ওঠে দেখার জন্যে। আস্তে আস্তে তারাদুটি উঠে এল; দক্ষিণের দিকের তারাটি প্রথম দেখা দিল এবং প্রথমটির চেয়ে একটু নিচে সমান্তরাল রেখায় দেখা দিল আরেকটি। তারাদুটো তখনও পাহাড়ের এত কাছ দিয়ে রয়েছে যে, আমি তারাদুটোর ভেতর দিয়ে লাইন টানতে পারছিলাম না। নির্দিষ্ট ধ্রুবতারাটির অবস্থান কল্পনা করবার চেষ্টা করছিলাম, এইভাবে মজা করে সময় কাটাচ্ছি, এমন সময় নালার ভেতর বেশ্যায় হৈ হল্লা শুরু হয়ে গেল।

আধশোয়া অবস্থায় ছিলাম। আস্তে আস্তে নিঃশব্দে আমি উঠে বসলাম। টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে দৃশ্যটি খুঁটিয়ে পরখ করবার জন্যে রাইফেলটা কাঁধে বসিয়ে নিলাম। জঙ্গলের একটা ফাঁক দিয়ে চাঁদের ক্ষীণ আলো এসে পড়ায় শুধু আমার সামনের বালিয়াড়িটাই যা একটু অন্ধকারমুক্ত এবং ফুটফুটে পরিষ্কার দেখাচ্ছে। নালার এই আলোকিত অংশটা আপনা থেকেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং

আমার টেলিস্কোপ তার বিষয়মুখী লেন্সে সেখানকার যাবতীয় আলো কুড়িয়ে নিল।

আমার ঠিক সামনেই, খুব বেশি হলে বারো গজ দূরে, মোষটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে বাঘ দাঁড়িয়ে আছে; মোষটা প্রাণপণে চেষ্টা করছে উঠে দাঁড়াতে। বাঘের হাত ছাড়িয়ে পালাতে। ব্যাপারটা এত কাছে এত স্পষ্টভাবে ঘটছে যে, আমার পুরো টেলিস্কোপ জুড়ে সেই দৃশ্য। শিকাররত বাঘটার ছবি আমার টেলিস্কোপের লেন্সের সূক্ষ্মরেখা উপ্‌চে কাঁচের গায়ে ভরপুর হয়ে রয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, বাঘের চোয়াল মোষটার ঘাড়ের ওপর বসানো; বাঘের দেহটা মোষের ঘাড়ের ওপর অর্ধেক গোটানো। মোষটা তখন তার পেছনের অংশ দিয়ে ধস্তাধস্তি করবার চেষ্টা করছে; কিন্তু বাঘ তার ঘাড়টাকে মোক্ষমভাবে কাম্‌ড়ে ধ'রে এমনভাবে মাটিতে ঠেসে ধরেছে যে, তার আর ঘাড় নড়াবার ক্ষমতা নেই। এরপর বাঘের চোয়ালের ভেতর থেকে কড়মড় কড়মড় করে একটা আওয়াজ ভেসে এল আর ঠিক তারপরই মোষটা নেতিয়ে পড়ল; তখনও অবশ্য তার পেছনের পাদুটোতে একটা খিঁচুনির ভাব দেখা যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে সেই খিঁচুনির ভাবটাও শেষ পর্যন্ত থেমে গেল। মোষের নিষ্প্রাণ নড়নড়ে শরীরটার ওপর ঘাতকের দেহভার চেপে বসল।

বন্দুকের দূরবীক্ষণ কাঁচের একেবারে মধ্যস্থলে বাঘের ঘাড়ের ঠিক তলদেশটি এতক্ষণ আমার নিশানা করা ছিল। বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল জড়িয়ে প্রাথমিক টানটা এমনভাবে আমি দিয়ে রেখেছিলাম যে, আরেকটু চাপলেই তৎক্ষণাৎ গুলিটা ঠেলে বার করে দেবে।

আমাদের আগে থেকেই কথা হয়ে ছিল যে, বন্ধুটি প্রথম গুলি ছুঁড়বে। আমি অধীরভাবে অপেক্ষা করে আছি কখন সে গুলি ছোঁড়ে। এদিকে আমার বন্ধুটি তার আগেকার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পুরো ব্যাপারটাই উল্টো বুঝে বসে আছে। হুটোপাটি শুনে সে ভেবেছে মোষটি বুঝি খুঁটির দড়ি খুলে ঝোপের মধ্যে পালিয়েছে— দিন দুয়েক আগে ঠিক যেমনটি ঘটেছিল। সেদিন বেচারাকে তার

কেটে-পড়া টোপের খোঁজে গোটা এলাকাটা বেফয়দা চষে ফেলতে হয়েছিল।

জঙ্গলবিদ্যায় আমরা খুব সেয়ানা—এই মনগড়া ধারণা নিয়ে যখন আমরা সম্পূর্ণ মশগুল হয়ে আছি, সেই ফাঁকে বাঘ যে কখন কোথা দিয়ে এসে হাজির হয়েছে আমরা টেরই পাই নি। যখন সব ঠিক হ্যায় ভেবে আমরা ডগমগ হয়ে আছি, বুদ্ধির লড়াইতে তাহা হেরে যেতে হল। উপ্‌চে-পড়া গাছপালার রাজত্বে অনধিকার প্রবেশকারী শহরবাসী আমরা জঙ্গলবিদ্যার এই ওস্তাদের কাছে বোকা বনলাম। শুধু আমরাই নয়, যারা বনের জীব তাদেরও একই হাল হল। চিতল বলুন, কুট্‌রা বলুন, বনের দ্বিতীয় কোনো প্রাণীই তার উপস্থিতির বিন্দুমাত্র আঁচ পায় নি। বাঘ তাদের সবাইকেই এমনভাবে অসতর্ক করেছে এবং এমনভাবে ভুলিয়েছে, যাতে তারা সবাই এটা মনে করে যে, বাঘ এখন আর এ তল্লাটেই নেই।

পরদিন ভোরবেলায় বাঘের পায়ের ছাপ দেখে দেখে পুরো ঘটনাটার একটা ছক তৈরি করে ফেললাম। বাঘ তার লক্ষ্যসাধনের জন্যে এমন সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল যে, দেখেশুনে আমরা তো একেবারে থ'। আমরা মানুষেরা আমাদের বুদ্ধির কত যে বড়াই করি—কিন্তু সে গর্ব ক্ষুণ্ণ করেও একথা আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, ঐ জানোয়ারটি যে নিপুণতা আর বোধশক্তি দেখিয়েছিল তা আমাদের অহমিকার উচ্চাসন থেকে টেনে নামিয়ে ঠিক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

বাঘ যখন প্রায় সিকি মাইল দূরে, তখন সে আমাদের মোষটার গলার ঘন্টির ক্ষীণ আওয়াজ পায়। দাঁড়িয়ে পড়ে ঘাড় ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ সে বোঝবার চেষ্টা করে আওয়াজটা ঠিক কোন্‌দিক থেকে আসছে। সে জায়গায় তার পায়ের ছাপ মাটিতে বেশ দাবানো এবং আমাদের গোপন আস্তানাটার দিকে ছেত্‌রানো। মোষটা ছায়া-ঢাকা যে জায়গাটায় দড়িবাঁধা অবস্থায় বেমালুম বসে ছিল, ঝোপের ঠিক বাইরের এই জায়গাটা তার চেয়ে অনেকখানি নিচে।

সেখান থেকে মোষটাকে চোখে পড়া সম্ভব নয়। এমন কি দিনের বেলায়ও আমরা দেখবার চেষ্টা করে পারিনি; তাও তো দাঁড়িয়ে থাকার দরুন বাঘের চেয়ে ঢের উঁচু থেকে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারছিলাম। এখানে বাঘ ছিল খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে এবং একদল চিতল আর একটা শেয়াল সমানে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছিল। শিকারমুখো হওয়ার আগে তার এই ক্যাচাংগুলোকে ছেঁটে ফেলা দরকার। বাঘ রাস্তা বদলে ফেলল; সোজা ভাটিমুখো না গিয়ে তার বদলে ঘুরে সোঁতার পুবপাড়ে যে বন, সেই বনের দিকে চলে গেল। খোলাখুলিভাবে সোঁতা পেরিয়ে এমনভাবে সে হেঁটে গেল, যেন চারপাশের সতর্ক প্রহরারত জন্তুজানোয়ারগুলোর মনে হয় যে, তাদের প্রতি বাঘের কোনো আশক্তি নেই, বাঘ চলেছে অন্য কোনো শিকারের খোঁজে—সুতরাং তারা নির্ভয়ে থাকতে পারে। যে জানোয়াররা সোঁতার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের চোখের সামনে বাঘ পাড় বেয়ে ওপরে উঠল; জঙ্গল পর্যন্ত তার রাস্তার দুপাশে বড় বড় পাথরের চাঁই আর ঝোপঝাড় ছিল, বাঘ ইচ্ছে করলে অনায়াসে তার আড়ালে গা ঢাকা দিতে পারত—কিন্তু তার বিন্দুমাত্র চেষ্টা সে করল না। কিন্তু পাড়ের ওপর ওঠার পর যে মুহূর্তে প্রথম মোটামুটি ঘন ঝোপ পেল, সঙ্গে সঙ্গে তার আড়ালে গিয়ে চুপচাপ মাটিতে লম্বা হয়ে পড়ে থাকল। ঝোপের নিচে বালির ওপর আমরা তার গোটা দেহের স্পষ্ট ছাপ দেখতে পেলাম। বাঘ সেখানে নিশ্চয়ই বেশ অনেকক্ষণ ঘাপটি মেরে পড়ে ছিল, কমপক্ষে আধ ঘণ্টা তো বটেই; ততক্ষণে সোঁতার মধ্যে একে একে বিপদ্‌জ্ঞাপক ডাক থেমে গেছে, জন্তুরা যে যার চলে গেছে নিশ্চিন্তমনে চরতে।

বাঘ আরও খানিকটা সময় দিয়েছে জানোয়ারগুলোকে থিতিয়ে বসতে; তারপর গুটি গুটি ফিরে এসেছে সোঁতার মধ্যেকার ঝোপগুলোতে; আসবার সময় এসেছে গুড়ি মেরে মেরে, হয় ঝোপেঝাড়ে নয় পাথরের চাঁইগুলোর পেছনে গা ঢাকা দিয়ে;

সেইসঙ্গে নিজের গতিবিধি গোপন রাখার জন্যে জমির ওপর খানাখন্দ, ঢিবি আর যাবতীয় সুবিধেসুযোগ সে পুরোমাত্রায় কাজে লাগিয়েছে। বাঘ সারাক্ষণ হাওয়া উজিয়ে চলায় মোষটা তার গায়ের গন্ধ পায় নি এবং জঙ্গলের মধ্যিখানে হেঁটে গেছে দু পা অন্তর মাটিতে লম্বা হয়ে বসে প'ড়ে প'ড়ে। এই যে সিকি মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়ে সে ফিরেছে, তার মধ্যে কোনো একটা জায়গা থেকেও মোষটা নজরে পড়া সম্ভব ছিল না ; এ সত্ত্বেও চোখে না দেখে ঘণ্টির টুং টুং আওয়াজটা এমন নিখুঁতভাবে সে তাক করেছিল যে, একবার সিধে সেইমুখো হওয়ার পর প্রায় চোখ বুজে যে ঝোপটায় সে এসে পড়ল, সেখান থেকে মোষটার দূরত্ব বোধহয় পুরো দশ ফুটও হবে না।

সেখান থেকে ঝিলিক-দেওয়া বিদ্যুতের মত বাঘটা লাফিয়ে পড়েছিল। তার আগে অবধি মোষ বেচারা জানতেই পারে নি তার অদৃষ্টে কী ঘটতে যাচ্ছে। বাঘ যখন তার ঘাড়টা কপাৎ করে চোয়ালের ভেতর নিয়েছে, হতভাগ্য প্রাণীটির একমাত্র তখনই সেই প্রথম এবং সেই শেষবারের মত বাঘের উপস্থিতি মালুম হয়েছে।

প্রচণ্ড একটা কামড়ে মোষের ঘাড়টা কড়মড় করে ভাঙার পর মোষের দেহটা যখন নিষ্প্রাণ হয়ে নেতিয়ে পড়েছে, বাঘটা তখন তাকে মুখে করে উঠে দাঁড়িয়েছিল। দড়িটা সামান্য একটু টানতেই সশব্দে ছিঁড়ে গিয়েছিল এবং তখনই আমার বন্ধুটি তার কারণ অনুসন্ধানে প্ররোচিত হয়। কিন্তু ততক্ষণে বাঘ—বেড়াল যেমন মুরগি মুখে করে নিয়ে পালায়—ঠিক সেইভাবে মৃত মোষটার ঘাড় ধরে আধা তুলে আধা হেঁচড়ে গোটা দুই কদম এগিয়ে যায়।

এগিয়ে এসে যেখানে দাঁড়ায়, সেখান থেকে বড় জোর আট গজ দূরে ছিল আমার রাইফেলের নলের মুখ এবং আমার রাইফেলের মাছিটা ঠিক বাঘের কল্‌জে-সই তাক-করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একটা গাছের ডাল সামনে পড়ে যাওয়ায় আমার বন্ধুটি ভালোরকম দেখতে পায় নি। আমার রাইফেলের দূরবীনে বাঘ তার কল্‌জেটাকে মেলে

ধরে কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল; আমিও স্থাণু হয়ে অপেক্ষা করে আছি আমার বন্ধু এইবার, বোধহয় এইবার গুলি ছুঁড়বে ভেবে; আমি কি ছাই তখন জানি যে, আমার বন্ধুর পক্ষে সেই প্রতিবন্ধকতার মধ্যে গুলি ছোঁড়া একেবারেই অসম্ভব ছিল।

বাঘ আমাদের সামনেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। তুনিয়ায় কাউকেই সে পরোয়া করে না, এমনি একটা ভাব নিয়ে সে স্পর্ধায় টান টান হয়ে আছে।

চোখের সামনের ডালটা এড়াবার জন্যে আমার বন্ধু একটু সরে গিয়ে জুতসই ভাবে রাইফেলটা তাক করবার চেষ্টা করল। তার টেলিস্কোপের কাঁচ জুড়ে ফুটে উঠল বাঘের পেছনের অংশ; বাঘের শরীরের মোক্ষম জায়গাগুলো তার সঙ্কুচিত দৃষ্টিপথের বাইরে থেকে গেল। ফলে, আমার বন্ধুটিকে আবার সরে বসতে হল। বাঘ এইবার আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে এবার সে সোজা আমাদের দিকে তাকাল। মুহূর্তের জন্যে তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ল। তার চোখেমুখে মদমত্ত 'এস, লড়ে যাও' ভাব—রাইফেলের ঘোড়া স্পর্শ-করা আমার আঙুলের ডগায় তৎক্ষণাৎ আমার সমস্ত শরীরের রক্ত আছড়ে পড়ল। চল্‌কানো রক্তে সিঁটিয়ে উঠল আমার আঙুলের বাঁক, তবু আমি বন্ধুর গুলি ছোঁড়ার অপেক্ষায় থাকলাম। আমার মনে হল, আমাদের চারদিকের বনভূমি যেন আর স্থির থাকতে না পেরে থর থর করে কাঁপছে: মনে হল, রাত্রিরটা কী-হয় কী-হয় ভাব নিয়ে যেন দম বন্ধ করে আছে।

বাঘ আস্তে আস্তে মড়িটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে তারপর নিঃশব্দে সাঁ করে একটা ঝোপের আড়ালে সরে গেল। প্রতিবন্ধক ডালটি এড়াবার জন্যে আমার বন্ধু তার আসনে উঠে বসবার চেষ্টা করছিল; আমি তৎক্ষণাৎ একহাতে তার পায়ে চাপ দিয়ে তাকে চুপচাপ বসে থাকতে ইশারা করলাম। আমরা পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম: আমাদের পাঁজরের নিচে যেন

একজোড়া হাপর ঘন ঘন ওঠাপড়া করছিল আর তার ফলে দমকে দমকে নিশ্বাস ছাড়ার জন্তে আমাদের মুখ হাঁ করে থাকতে হল।

এমন সুযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমাদের মন তখন বেজায় খারাপ; উত্তেজনার ভারে আমরা যেন মাথা তুলতে পারছি না। এই রকমের মনের অবস্থায় নিঃশব্দে আমরা আমাদের ওৎ পাতার গুপ্ত জায়গায় একেবারে স্থির হয়ে বসে রইলাম।

হতাশার বিমূর্ত ছবির মত ঐ অবস্থায় আমরা ছিলাম দশ মিনিটের বেশি নয়; হঠাৎ ঝোপ থেকে বাঘ আবার বেরিয়ে এসে প্রবল এক টান মেরে মড়িটাকে ঝট্ করে আমাদের চোখের আড়াল করে ফেলল। তারপর আবার মড়িটাকে তুলে নিয়ে টেনে হেঁচড়ে ঝোপের ভেতরে নিয়ে গেল; ঝোপের মধ্যে মরা মোষের গলার ঘন্টির শব্দে আমরা ধরে ফেললাম বাঘ ঠিক কোন্ জায়গায় আছে। আমি আর আমার বন্ধু, আমরা দুজনেই আমাদের রাইফেলের দূরবীন সেইদিকে নিশানা করলাম। আমি বাঘের মস্ত ঢাউস মাথাটা মোটের ওপর ঠাহর করতে পারছিলাম; বাঘ ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দিকে দেখছিল—ঝোপের মধ্যিখানে একটা গাছের গুঁড়িতে বাঘের মুণ্ডুর খানিকটা অংশ ঢাকা পড়েছিল।

আমি আর স্থির থাকতে না পেরে আমার বন্ধুকে গুলি ছুঁড়তে বললাম। এটা আমার খেয়ালই হয় নি যে, ও এমন একটা বেয়াড়া জায়গায় বসে আছে যেখান থেকে বাঘকে গুলি করে মারাটা শুধু দুরূহ নয় প্রায় অসম্ভবও বটে।

সামনে থেকে বাঘের মাথায় গুলি করা খুবই কঠিন কাজ। বাঘের মাথার খুলি একটু খুঁটিয়ে পরখ করলেই দেখা যাবে যে, তার কপাল বলে কিছু নেই।

বাঘের অঙ্গসংস্থানের এই বিশেষত্ব আমার বন্ধুর জানা ছিল এবং বেশ পাকা হাতে সে রাইফেল ছুঁড়েছিল। বাঘের নাকের মাঝখানটাতে টিপ করে সে ঘোড়া টেপে। জায়গাটা গাছের গুঁড়িতে কিছুটা আড়াল পড়েছিল। রাইফেলে গুড়ুম করে

আওয়াজ হল, কিন্তু বাঘের তরফ থেকে কোনোরকম সাড়া পাওয়া গেল না; গুলি লাগলে সাধারণত বাঘ গর্জে ওঠে। আমরা বুঝতে পারলাম বাঘ অক্ষত দেহে পালিয়েছে। পরদিন সকালে দেখা গেল, গুলিটা গুঁড়ির গায়ে লেগে ছট্‌কে গেছে—আরেকটু হলেই গুলিটা বাঘের মাথায় গিয়ে লাগত।

৩

পরের বছর সেই ডোরাকাটা ডাকাতটার খোঁজে আবার আমি গেলাম। এবার আমার আরেক বন্ধু—শ্রীযুক্ত এস্‌—আমার সঙ্গী হলেন। তরুণবয়সী এই ভদ্রলোক জীবিকায় ছিলেন স্বাধীন; তাঁর স্বভাবে সাবেকী আদবকায়দার সঙ্গে মিলেছিল আজকালকার হিসেবী দিলদরিয়া ভাব: ইদানীং তাঁকে শিকারের বাতিকে ধরেছিল। শিকারে তাঁর ছিল অভিজ্ঞতার অভাব; কিন্তু এ কাজে সব রকমের দুঃখকষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ করে সে অভাব তিনি সুদে আসলে মিটিয়ে নিয়েছিলেন। গরু-মারা বাঘটার সন্ধানে জঙ্গলে ঢুঁড়বার সময় এই ভদ্রলোক সঙ্গে থাকায় সময়টা আমার খুব ভালো কেটেছে। সব সময় হাসিখুশি ভাব—এমন তোফা সঙ্গী খুব কম পাওয়া যায়।

তখন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি; গরম হাওয়া লেগে তেষ্টায় প্রত্যেকটা গাছগাছড়ার বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তাপিত ক্লান্ত গাছগুলো দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে দেখছে তাদের পায়ের কাছে স্তূপাকার হয়ে জমছে হল্‌দে ঝরা পাতা আর মাঝে মাঝে সাঁই সাঁই করে ঘূর্ণীহাওয়া এসে পাতাগুলোকে টস্‌কি দিয়ে উড়িয়ে উড়িয়ে বেধড়ক ফেলছে। এ সময় বাঁচার পক্ষে খাবারের চেয়েও বড় জিনিস হল জল: এ তল্লাটে সেই জলেরই একান্ত অভাব। এখানে সেখানে জল-জমা যে গর্তগুলো ছিল, সেগুলোও চটপট শুকিয়ে যাচ্ছে; এখন তলায় থিক থিক করছে শুধু কাদা।

গ্রামের তহসিলদারের মত গরুচোর বাঘও নিয়মিত টহল দিয়ে বেড়ায় এবং তারই মত যে পথ দিয়ে যায়, সে পথে তার হৃদয়হীন

অত্যাচারে শোকের রোল ওঠে। গরুচোর বাঘ রীতিমত নিয়মমাফিক ক্ষেতখামারে আর গাঁয়ে হানা দেয়; কারণ, সামান্য কিছুকাল এক জায়গায় চুরিচামারি করবার পর সেখানে তার পক্ষে আর টেঁকা দুষ্কর হয়ে পড়ে। গ্রামের লোকে দেখতে দেখতে সেয়ানা হয়ে যায়; তাদের একটা দুটো গরুমোষ টেনে নিয়ে যাবার পর বাঘ নতুন এলাকায় পাড়ি দেয়—যেখানে সে হবে অপ্রত্যাশিত অতিথি। তারপর সেখানকার ভালোটা মন্দটা গিলেকুটে আবার রওনা দেবে। এমনিভাবে পূজারী বামুনের মত ঘুরে ঘুরে ঘণ্টা নেড়ে বেড়াবে। গরুমারা বাঘ ঠিক একজন রাজনীতিবিদের মত তার এলাকায় নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকবে, যতক্ষণ না তার কপাল পুড়ছে ততক্ষণ তাকে সেখান থেকে নড়ানো যাবে না।

শুধু গরুখেকো কেন, মানুষখেকো বাঘদেরও এক ডেরা থেকে অন্য ডেরায় যাওয়ার ব্যাপারটা এত নিয়মিত যে, ম্যাপে তাদের এই যাত্রাপথ প্রায় নিখুঁতভাবে ছকে দেওয়া যায়। বাঘ যখন কোনো আস্তানায় ফিরে আসে তখন এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, অন্তত একটি 'মড়ি' না মেলা পর্যন্ত সেখান থেকে সে নড়বে না; যদি তাকে জ্বালাতন করা না হয়, তাহলে শিকারটি খেয়ে ফুরোতে তার তিন চার দিন লেগে যাবে এবং ঠিক ততদিনেরই বিরতির পর সে তার কর্মসূচী অনুযায়ী পরবর্তী অস্থায়ী আস্তানার দিকে এই আশায় রওনা হবে যে, এটির তুলনায় সেটি হবে আরও অতিথিবৎসল জনপদ।

বনের মধ্যে জন্তুজানোয়ারদের যাতায়াতের এমন কিছু পথ আমরা বেছে নিলাম যা জল খাওয়ার জায়গায় গিয়ে পড়ছে। সে জায়গায় আমরা বাঘের জন্যে টোপ বেঁধে রাখলাম। এমন কি জঙ্গলের যেখানটা দিয়ে সে বেরিয়ে আসত, সেখানে শুকনো নালার মধ্যে জ্যান্ত টোপ নিয়েও আমি ওৎ পেতে বসলাম। এই জায়গাটাতেই আগের গল্পের সেই বাচ্চাগুলোকে আর তাদের মাকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। রাতের পর রাত আমরা এই হানাদার বাঘটাকে

বেশ মুখরোচক বাছুরের টোপ দিয়ে গাঁথবার চেষ্টা করেছি, রাতের পর রাত আমাদের সে বুড়োআঙুল দেখিয়েছে। বাঘটি রীতিমত দুরন্ত; জঙ্গলে নির্জনে মোষ বেঁধে রাখার যে কী অর্থ, স্পষ্টতই তা সে জানে। বাঘটি এতই দিগ্‌গজ যে, বাছুর বলুন, বাড়ন্ত কচি মোষ বলুন—যাই বেঁধে রাখা হল, কোনো টোপের কাছেই সে ঘেঁষল না; অথচ ছাড়া জানোয়ার একবার দেখতে পেলে হয়, বিনা বাক্যব্যয়ে সে মেরে দেবে। নালার মাঝখানে বালিতে আমি চার রাত্তির টোপ বেঁধে রাখলাম, একদিনও সে মুখে নিল না—যদিও তার পায়ের ছাপ দেখে বুঝতে পারলাম যে, মাত্র কয়েক গজ দূর দিয়ে সে চলে গেছে। পঞ্চম রাত্রে দাবানলের রেখা বরাবর বাঘের ঠিক যাতায়াতী রাস্তার ওপর টোপ বেঁধে আমি বসে থাকলাম। সেদিন ছিল ফুটফুটে চাঁদনি রাত; ন'টা নাগাদ দেখতে পেলাম বাঘ সেই রাস্তা দিয়ে মোষটার দিকে এগোচ্ছে। আমি তখনই গুলি করতে পারতাম—বাঘ তখন গজ আশি দূরে—কিন্তু যেহেতু সে আমার দিকেই এগিয়ে আসছিল, সেইজন্যে ও আরও কাছে আসুক ভেবে আমি অপেক্ষা করে থাকলাম। দাবানলে তৈরি রাস্তাটি এক জায়গায় বেঁকে গিয়ে আমার সামনে প্রায় বিশ গজ দূরে এসে আবার সিধে হয়েছে। বাঁকটাতে চলে আসার পর বাঘকে আমি আর দেখতে পেলাম না; আমি অপেক্ষা করে রইলাম বাঁক ঘুরে সিধে রাস্তার মুখে আসুক। বাঘ সেই প্রত্যাশিত জায়গায় এসে গেল এবং মাঝরাস্তায় বসে থাকা মোষটা এই প্রথম তার নজরে পড়ল। পাজির পা-ঝাড়া সেই ধূর্ত বাঘ সেখানে দাঁড়িয়ে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ধাঁ করে ঘুরে টোপটা এড়াবার জন্যে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। আমি তার দিকে তাক করবার সময়ই পেলাম না। আবার সে বনের রাস্তায় ফিরে এসেছিল, আমার ওৎ পেতে বসার জায়গাটা পেরিয়ে প্রায় পঞ্চাশ গজ পেছনে। আমি পড়ে গিয়েছিলাম মোষ আর বাঘের ঠিক মাঝখানে। আমি দেখিনি, তবে অবশ্যই জানতাম—ওকে বোকা বানাবার আমার বেকার চেষ্টাকে

যেন উপহাস করে, যাওয়ার সময় ছুয়ো দিয়ে যাওয়ার ওর একটা বিশ্রী অভ্যেস ছিল।

আমার বন্ধু আগের বছর ওকে যে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিল, তার কিছুমাত্র সে ভোলে নি। বরং বলা যায়, আরও হাত পাকিয়ে বাঁচার বিদ্যেয় সে একেবারে পারঙ্গম হয়ে উঠেছে। জবরদস্ত আমলার মত তুচ্ছজ্ঞান করে দিনের পর দিন বাঘটা আমাদের সমানে ঘোল খাওয়াতে লাগল আর আমরা বেহায়া ভোট-কুড়ুনিদের মত সমানে ওকে মুখরোচক টোপে গাঁথবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম। টোপের কাছে বসলাম, আশেপাশে বসলাম, তফাতে গিয়ে বসলাম, তবু বার বারই সে আমাদের চোখে ধুলো দিল; যদিও. বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, সে ঠিক এসে হাজির হল এবং ধারেকাছে ওর উপস্থিতির খবরটা আমাদের জানিয়ে দিল।

আমাদের পারমিটের মেয়াদ ক্রমশ ফুরিয়ে আসতে লাগল; গত দশ দিনের নিস্ফল চেষ্টায় আমাদের শরীর অবসাদে এমন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে, গায়ের ব্যথায় আমরা নড়তে পারছিলাম না। মাটিতে পা ফেলাটা একটা যন্ত্রণার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। ফোস্কা পায়ে দিনের পর দিন লেংচে চলা—জেগে থাকার সময়টা যেন এক দুঃস্বপ্ন। কাছাকাছি একটা খামারে থাকতেন বন্ধুভাবাপন্ন এক ঠাকুর সাহেব; তাঁর নিজের হাতি ছিল। তাঁর কাছ থেকে হাতিটা ধার নিয়ে, তার পিঠে চড়ে আমরা জঙ্গল চুঁড়তে লেগে গেলাম। এতে আমরা রাস্তা ঠেঙানোর হাত থেকে যদিবা বাঁচলাম, গায়ের ব্যথা গেল বেড়ে এবং সারা শরীরটা পাকা ফোড়ার মত দপ্‌দপ্‌ করতে লাগল। তবু আমরা থামলাম না, ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের মতন ফাঁকা দম্ভ নিয়ে চলতে থাকলাম। অস্থিমাংসের অত বড় একটা বিরাট লাশ অমন বেঢপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে কি রকম অবলীলাক্রমে পাকখাওয়া বাঁকা সরু পথ পাড়ি দিচ্ছে, উঁচু পাহাড় আর গভীর গিরিখাতের খাড়া গা বেয়ে উঠছে আর নামছে—দেখলে চোখ ট্যারা হয়ে যায়। যখন একটা টিলা টপ্‌কে তার লম্বালম্বি ঢাল বেয়ে তাকে আমি গড়গড়িয়ে

নামতে দেখলাম, ভয়ে আর বিস্ময়ে আমার শ্বাসরোধ হয়ে গিয়েছিল। থেবড়ে বসে পাগুলো সটান সামনের দিকে তুলে ধস্ নামার মত হুড়মুড় করে ধপাস্ করে নিচে গিয়ে পড়ল—তার পিঠের ওপর তখনও আমরা সবাই বসে। জঙ্গলে হাঁটবার সময় শুঁড় দিয়ে সমানে ডাল আর গাছ ভেঙে ভেঙে পথের সমস্ত বাধা দূর করবে—দেখবে যেন ডালপালায় লেগে আমরা পড়ে না যাই। কিন্তু এ সত্ত্বেও, হাতির পিঠে চড়াটা আমার কাছে খুব ক্লান্তিকর এবং পান্‌সে বলে বোধ হল। একদিন দুদিন যেতেই আমি বললাম—আর নয়। ঢের হয়েছে, বলে হাঁফ ছেড়ে আবার পায়ে হাঁটা আর রাত জেগে পাহারা দেওয়া শুরু করে দিলাম।

একদিন আমি এক গিরিখাতে ওৎ পেতে বসব বলে ঠিক করলাম। জায়গাটা আমাদের তাঁবু থেকে মাইল চারেক দূরে। অনেকখানি লম্বা নলখাগড়ার একটা পেল্লায় বন পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। ঠাকুর সাহেবের হাতিটা তখনও আমাদের কাছে রয়েছে: মাইলের পর মাইল উলুঘাসের জট ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে যাওয়া খুব হাঙ্গামার ব্যাপার বলে হাতিতে চড়ে পথটা পার হলাম। স্থানীয় দুজন শিকারীর সঙ্গে আমার বন্ধু এলেন আমাকে পৌঁছে দিতে। গিরিখাতে আমরা বেলা চারটে নাগাদ পৌঁছুলাম। হাতির পিঠ থেকে নেমে পড়ে আমি একটা বড় গোল পাথরের পেছনে পাড়ের ওপর বসবার ব্যবস্থা করলাম। আমার বন্ধুটি হাতির পিঠে চড়ে আরও এাগয়ে গেলেন; মাইলখানেক উজিয়ে গেলে গরুর গাড়ির একটা রাস্তা পড়বে; তারপর বাঁদিকে ঘুরলে ঘাসের একটা জঙ্গল মিলবে; বন্ধুর উদ্দেশ্য সেখান থেকে রান্নার জন্যে কিছু মাংস শিকার করা।

বনচ্ছায়ার মাথার ওপর জ্বল জ্বল করছে নিষ্করুণ দিন, গিরিখাতের চারপাশে ঘাসের প্রত্যেকটি ডগা নীরস বাদামী রঙে জটলাবদ্ধ হয়ে তৃষ্ণায় আকণ্ঠ শুকিয়ে আছে। বেশ কিছুদিন আগে গরুখেকো বাঘটা একটা মোষ মেরেছিল, তার কঙ্কালটা আমার সামনে পড়ে।

শকুন আর বনের উচ্ছিষ্টভোজীর দল এমন চেটেপুটে খেয়েছে যে, কঙ্কালের গায়ে একটুও আর মাংস লেগে নেই। সুতরাং কঙ্কালের ওপর কারো আর লোভ থাকার কথা নয়। তা সত্ত্বেও আমি দেখলাম খোসপাঁচড়াগ্রস্তের মত দেখতে একটা শেয়াল বন থেকে বেরিয়ে এসে কঙ্কালটার চারদিকে ঘুরতে লাগল। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করতে লাগলাম; ওকে দেখতে আমার বেশ মজা লাগছিল। শেয়ালটা যে রকম ভয়-ভয় ভাব করে হাড়গোড়ের চারপাশে ডিং মেরে বেড়াচ্ছিল আর ছ্যাথ্-না-ছ্যাথ্ নাক তুলে তুলে বাতাসে গন্ধ শুঁকছিল, তাতে আমার হাসি পাচ্ছিল। চারদিকে কড়া দৃষ্টিতে দেখে নেবার পর শেয়ালটা এবার তার গণ্ডিটা কেন্দ্রের দিকে ছোট করে আনল। কিছুক্ষণ পর পর বেশ কয়েকবার মিথ্যে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়ে তারপর সন্ধানী দৃষ্টি মেলে কঙ্কালটাকে পাক দিয়ে আবার ফিরে এসেছে। শেষ পর্যন্ত গুট গুট করে এগিয়ে একটা হাড় ছোঁ মেরে টেনে নিয়ে আবার সে ছুটে কাছের একটা ঝোপের ভেতর পালিয়ে গেল। সেখানে কিছুক্ষণ থেকে ঝোপের পেছন থেকে অনবরত মুখ বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখতে লাগল। শেষকালে আরেকটু সাহসে ভর করে তুল্‌কি চালে এগিয়ে এসে শিরদাঁড়ার আস্ত হাড়টা দাঁত দিয়ে কুট্‌ কুট্‌ করে কাটতে শুরু করে দিল এবং সেইসঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে নজর রাখতে লাগল। সমানে আধঘণ্টা ধরে হাড়টাতে কামড় বসাতে বসাতে একবার হঠাৎ শেয়ালটা মাঝপথে থেমে গিয়ে গিরিখাতের ওপারে ঘাসঝোপের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল। আর তারপরই ভয়ে চম্‌কে উঠে ছুট লাগাল।

পাশের একটা ঝোপের ছায়ার ভেতর থেকে বেহেড মাতালের মত টলতে টলতে বেরিয়ে এল একা একটি দাঁতাল শুয়োর। সে সোজা চলে গেল মোষের স্তূপাকার হাড়গোড়ের দিকে। শিরদাঁড়া থেকে একটা হাড় ভেঙে নিয়ে শুয়োরটা দেখলাম দিব্যি তারিয়ে তারিয়ে কড়র মড়র করে খাচ্ছে। আমি তো অবাক! পাঁজরার

হাড় খসিয়ে নিয়ে হাড়ের ওপরকার প্রান্তটা স্বচ্ছন্দে ঠিক মুলো চিবোনোর মত করে খাচ্ছে। শেয়াল বেচারাকে খেতে খেতে উঠে যেতে হয়েছে এবং সে এখন ঝোপের পেছনে দাঁড়িয়ে অনধিকার প্রবেশকারীকে বিষদৃষ্টিতে দেখছে। শেয়ালও দেখলাম আমার মতই অবাক হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর শেয়ালটা সাহস সঞ্চয় করে সন্তর্পণে কঙ্কালের দিকে এগিয়ে গেল। দাঁতাল শুয়োর তার মুখ থেকে হাড়টা ফেলে দিয়ে বাঁকা চোখে তাকাল আর তারপরই হঠাৎ দাঁত খিঁচিয়ে শেয়াল বেচারার দিকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ছুটে গেল। শেয়াল বেশ চতুরভাবে বনশুয়োরকে কাটান দিয়ে ঝোপের পেছনে লুকিয়ে পড়ে কিছুক্ষণ পর আবার দেখা দিতেই বনশুয়োর ঠিক আগের মতই আবার তার দিকে তেড়ে গেল। এই ব্যাপার বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল। এমন সময় গিরিখাতের ভেতর ফার্লং খানেক দূর থেকে একটা গুলির শব্দ ভেসে এল। আমার বন্ধুটি ছুঁড়েছেন। ওঁর কাছে আছে ৩৭৫ ম্যাগনাম রাইফেল; নিশ্চয়ই একটা সুন্দর মাথার শিঙেল হরিণ দেখে বন্ধু আর লোভ সংবরণ করতে পারেন নি।

আমার বসবার জায়গার এত কাছ থেকে গুলি করার জন্যে মনে মনে বন্ধুটির মুণ্ডপাত করলাম; কেননা শয়তান বাঘ যদি ধারেকাছে থেকে থাকে, তাহলে এতে সে উত্ত্যক্ত হবে। রাইফেলের আওয়াজে সাবধান হয়ে দাঁতাল শুয়োর এক ছুটে পালিয়ে গেল। শুয়োরটার ছত্রভঙ্গ অবস্থা দেখে খুশি হয়ে শেয়াল কিন্তু তক্ষুনি ফিরে এল এবং হাড় খসিয়ে কড়র মড়র করে চিবোনোর কাজে মহাউৎসাহে লেগে গেল।

সূর্যদেব তখনও আমার পেছনকার শৈলশ্রেণীর মাথার অনেকটা ওপরে; গাছগুলোর মাথা ফুঁড়ে রোদ্দুর যেন বর্শাফলকের মত নিচেকার ছায়াগুলোকে গেঁথে দিয়েছে। ডালপালা আর পাতার ফাঁক দিয়ে গলে আসা আলো বিকীর্ণ হয়ে গাছতলায় যেখানে চিতাবাঘের চামড়ার মত নক্সা ফুটিয়ে তুলেছে, সেখানে প্রত্যেকটা

গাছ আর ঝোপের নিচে খুব চুপিসাড়ে দিনের বিদায়বার্তা অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠছিল। বনমুরগির দল তাদের গুপ্ত আশ্রয়স্থল থেকে হাঁক-পাক করে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছিল; ঠোঁট ফাঁক করে তৃষ্ণার্ত গলায় হাঁফাতে হাঁফাতে তারা গিরিখাতের নিচের দিকে কাদাগোলা জলের খোঁজে দল বেঁধে ছুটে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে ছিল এইটুকু এইটুকু বেশ কিছু মুরগির ছানা, মা তার ছানাগুলোকে চারপাশে সাম্‌লে নিয়ে সমানে কঁকর কঁকর করতে করতে, সকলে মিলে সটান ডোবার দিকে চলেছে। মোষের কঙ্কালের কাছে শেয়ালকে দেখতে পেয়ে তারা 'ক্লা-ক্লা-ক্লাক্‌' শব্দে এমন হল্লা জুড়ে দিল যে, তাই শুনে মুরগির ছানাগুলো তক্ষুনি ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারপাশের পাতার স্তূঁইয়ের মধ্যে থেব্‌ড়ে বসে নিঃসাড়ে গা ঢাকা দিল। শেয়াল তখন এত ব্যস্ত যে, মুরগিগুলো তার চোখেই পড়ল না; কিছুক্ষণ পর মুরগিগুলো সেখান থেকে কেটে পড়ল।

আমার বন্ধুটির গুলির শব্দের প্রায় ঘণ্টাখানেক পর আমার কানে এল—কাছাকাছি ঝোপগুলো থেকে কেউ একেবারে গায়ে গায়ে দুবার শিস্‌ দিল। এটা আমাদের মধ্যেকার একটা জরুরী বিপদ-সঙ্কেত; আমি খুব চিন্তায় পড়লাম। আবারও একেবারে গায়ে গায়ে দুবার শিস্‌ দেওয়ার শব্দ পেলাম এবং আমিও সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তরে শিস্‌ দিয়ে সাড়া দিলাম। শিস্‌ দিচ্ছিল একজন স্থানীয় শিকারী; ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে সে আমাকে বলল যে, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে—আমার বন্ধুটি বাঘকে গুলি করেছেন।

শুনে আমি তো বেজায় খুশি, কোনো কিছু আর জিগ্যেস না করে আমি পত্রপাঠ তার পিছু পিছু চললাম।

আমার বন্ধু যেখানে অপেক্ষা করেছিলেন, সেখানে যখন আমি পৌঁছুলাম তখন দিনের আলো নিবে এসেছে। আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি; কিন্তু বাঘ দেখতে পাচ্ছি না। তখন আমার বন্ধু পুরো ঘটনাটা বললেন।

আমাকে আমার নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিয়ে গিরিখাত পেরিয়ে

ওঁরা তো নিম্নভূমির দিকে রওনা হলেন। কার্লিং খানেক গিয়েছেন কি যান নি, এমন সময় নিম্নভূমির শেষপ্রান্ত থেকে কয়েকটা চিতল হরিণ ভয় পেয়ে ডেকে উঠল। শালগাছের নতুন-চারা-লাগানো পত্তনী জমিটা যেখানে ফাঁকায় এসে মিশেছে, ওঁরা দেখলেন যত হৈ-হল্লা সেইখান থেকে ভেসে আসছে। ওঁরা ভাবলেন, চিতলগুলো হাতিটাকে দেখে ভয় পেয়েছে; ওঁরা তখন হরিণের মাংসের লোভে নিম্নভূমিটা বেড় দিয়ে একেবারে ওপাশ থেকে শালবনের দিকে এগোলেন। বড় জোর পঞ্চাশ গজ ওঁরা এগিয়েছেন, এমন সময় দেখেন দু-সারি চারাগাছের মধ্যবর্তী চওড়া খোলা এক ফালি জায়গার মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড কেঁদো বাঘ পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে নির্বিকারভাবে ওঁদের দিকে তাকিয়ে আছে।

বন্ধুটি অভ্যেসবশে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাইফেল কাঁধে তুলে নিয়েছেন; কিন্তু জায়গাটা শিকারের এলাকায় পড়ছে কিনা ঠিক জানেন না বলে পরক্ষণেই নিজেকে তিনি সাম্‌লে নিলেন। হাতির দিকে ঠায় তাকিয়ে থেকে বাঘ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল; হাতি তো এদিকে ভয়ে উসখুস করছে। হাতির পিঠে একদল লোক; বাঘ তাদের চোখের ওপর হাত বিশেকের ব্যবধানে পল্লীবালার মন্দাক্রান্তা ছন্দে যাচ্ছি-যাব ভাব করে ফালি জায়গাটা পেরিয়ে চলে গেল। গাছের সারির কাছে গিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে পেছনে ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখে নিয়ে পরের সারির গাছগুলোর মধ্যে আস্তে আস্তে বাঘটা মিলিয়ে গেল।

শালবাগিচার বাইরে কয়েক শো গজ দূরে বনপুলিশের চেকপোস্ট। ওঁরা ঘুরে সেইদিকে চললেন। রেঞ্জ অফিসারের সঙ্গে সেখানে ওঁদের দেখা হয়; তিনি বললেন, যে জায়গায় ওঁরা বাঘ দেখেছেন, সে জায়গাটা গুলি করার অনুমোদিত এলাকার মধ্যেই পড়ছে। শুনে ওঁরা তক্ষুনি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রেঞ্জ অফিসার হেসে বলেছিলেন—সহযোগিতা করার ব্যাপারটা বাঘের তেমন ধাতে নেই; বিশেষ করে এটি তো আবার পাজীস্য পাজী।

এটা যেন ওঁরা মনেও স্থান না দেন যে, বাঘ ওঁদের আশায় বসে থাকবে; এতক্ষণে সে মাইলের পর মাইল পার হয়ে গেছে।

অফিসারটি খুব অমায়িক। তিনি ধরে বসলেন আমার বন্ধু আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের চা খেয়ে এবং জলযোগ করে যেতে হবে। তরুণ ফরেস্ট অফিসাররা মেশবার লোক পায় না বলে, আশ্চর্য, একদম অচেনা লোকের সঙ্গেও একমাত্র নাগরিক জীবনের যোগসূত্রে সত্যিকারের ভাব জমিয়ে ফেলতে পারে। চা-পান সংক্রান্ত যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাট চুকিয়ে যখন ওঁরা উঠলেন তখন দিনান্তের দিকে আরও এক ঘণ্টা গড়িয়ে গেছে।

ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁবুতে ফিরে যাবেন বলে ওঁরা যাত্রা করেছিলেন। রাস্তায় ওঁদের মনে পড়ল, ভাঁড়ারে মাংস বাড়ন্ত; কাজেই সকালবেলার খাওয়ার কথা ভেবে ওঁরা আবার গেলেন সেই শালপত্তনে। সকালে যেখানে ওঁরা চিতলগুলোর ডাক শুনেছিলেন, সেইখানে গিয়ে ঠেলে উঠলেন। গোটা দুয়েক বীথি পেরোবার পরই তাঁরা তাজ্জব হয়ে গেলেন—দেখলেন দু-সারি শালচারার মাঝখান দিয়ে আবার সেই বাঘ হেলেদুলে চলেছে। বাঘ বিশ গজের বেশি দূরে ছিল না। এবং সে তখন পেছনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়েছিল—গুলি বেঁধানোর পক্ষে সেটা ছিল চমৎকার সুযোগ। হতভাগা হাতি আবার উসখুস করতে লাগল এবং তার অস্থিরতার জন্যে হাত ঠিক রেখে তাক করা যাচ্ছিল না। হাতি যেমন যেমন পাশ ফিরছিল, হাতিটাকে পাশ ফিরে দেখবার জন্যে বাঘও তেমনি ঘুরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল। আমার বন্ধু শরীরটাকে যথাসম্ভব বেঁকিয়ে চুরিয়ে কোনোরকমে তো গুলি ছুঁড়লেন। প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় বাঘ পেছনের দিকে ডিগবাজি খেয়ে অসহায়ভাবে পা ওপরদিকে তুলে মাটিতে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। ততক্ষণে হাতিটা চলে গেছে আয়ত্তের বাইরে এবং ক্রমাগত পাক খেতে খেতে এমন বৃংহিত নাদ ছাড়ছে যে, আমার বন্ধুর পক্ষে দ্বিতীয়বার আর গুলি ছোঁড়া সম্ভব হল না। মাহুত অনেক কষ্টে হাতিকে খানিকটা বাগে

এনে যখন তাঁকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাল, তখন সখেদে নজরে পড়ল—বাঘ উঠে পড়ে সুরসুড় করে ঝোপের আড়ালে চলে যাচ্ছে।

জখমী বাঘকে খুঁজে বেড়ানো, কাজটা সব সময়ই অপ্রীতিকর—এ কথা আগেই আমি বলেছি। অথচ চোট-খাওয়া অবস্থায় বাঘকে ছেড়ে দিলে সেটা হবে আরও খারাপ একটা ব্যাপার—মানুষ আর জানোয়ারদের প্রতি জঘন্য একটা অপরাধ; কিন্তু বন্ধুর মুখে ঘটনার বিবরণ শোনবার পর—বাঘ যে বহালতবিয়তে আছে, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না। মাত্র আধ ইঞ্চি হেরফের হওয়ার জন্যে বাঘ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে। আমার হিসেবে, বাঘের শিরদাঁড়া ঘেঁষে বুলেটটা চলে গেছে—তাতে শিরদাঁড়া জখম হয় নি। স্নায়ুকেন্দ্রে ধাক্কা লাগায় বাঘ সাময়িকভাবে মাটিতে উল্টে পড়েছিল মাত্র।

এ বিষয়ে আমার ধারণার কথা বন্ধুকে বললাম। তাতে ওর তেমন মন উঠল না। বাঘকে খুঁজে পাওয়ার তেমন সম্ভাবনা না থাকলেও, হাতির পিঠে চড়ে আমরা ঘটনাস্থলে গেলাম। হতচ্ছাড়া হাতি কিছুতেই জায়গাটার কাছে যেতে চাইল না। বাঘের গায়ের সামান্য গন্ধ পেয়েছে কি, ভয়ে তার নাড়ি ছেড়ে যাওয়ার যোগাড় হল। কাঁপতে কাঁপতে, চেঁচিয়ে চিল্লিয়ে সে চেষ্টা করল দ্রুত পায়ে ছুটে পালাতে।

ভয়-পাওয়া হাতির পিঠে সসেমিরা অবস্থায় বসে—স্বীকার না করে পারছি না যে, মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল--যদি বলি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম তাহলে খুব মিথ্যে বলা হবে না। যখন জানছেন হাতির পিঠে সাময়িক উচ্চাসনে বসে থেকে আপনি মুশকিলে পড়ে যেতে—আক্ষরিক অর্থেই, পড়ে যেতে—পারেন, তখন মনে মনে কখনই স্বস্তি অনুভব করা যায় না। কেননা বাঘ সামান্যতম হুমকি দিলেই অনেক হাতি বোকার মত ল্যাজ তুলে পালাবার চেষ্টা করে। গাছের ডালে ধাক্কা খেয়ে তখন আপনি ভয় পেয়ে ছোটা হাতির পিঠ থেকে অনায়াসে পড়ে যেতে পারেন—আর পড়বি তো পড়, একেবারেই হয়ত তাড়া করে আসা বাঘের মুখে।

বাঘের সহজাত ধূর্ততা আর হিংস্রতার সঙ্গে টেক্কা দেবার মধ্যে শিকারীর তবু একটা আত্মতৃপ্তি থাকে; কিন্তু এক্ষেত্রে আমি অন্যের খেয়ালের বশবর্তী নিছক কলের পুতুল; ফলে, হাতির চেয়েও আমি বেশি ঘাবড়েছিলাম। আমি আমার বন্ধুকে বললাম, এর চেয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘের মুখে পড়া ঢের ভালো, তাতে খুন হওয়ার ভয়ও যদি থাকে, তবুও—কেননা সেক্ষেত্রে আমি বাঁচার জন্যে অন্তত খানিকটাও লড়তে পারব; হাতির কাপুরুষতার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে, তার ল্যাজ তুলে পালানোর চোটে কলঙ্ককর মৃত্যু বরণ করার চেয়ে সে ঢের ভালো।

হাওদা থেকে আমি নেমে পড়লাম। তারপর গোটা জায়গাটাই বাঘের খোঁজে ঢুঁড়লাম; কোথাও পায়ে চলার একটা রাস্তা অবধি দেখতে পেলাম না। অন্ধকারে আর কিছু আমাদের করবার ছিল না। আমরা ঠিক করলাম পরদিন সকালে এসে আবার খোঁজাখুঁজি করা যাবে।

আমরা বেশ সকাল সকাল এসে পড়ে দেখলাম আমার অনুমান বিলকুল ঠিক। হাতির ওপর আমার বন্ধুটি স্থির হয়ে বসতে না পারায় এবং আহাম্মক হাতিটি কেবলি এপাশ ওপাশ করায় বুলেটটি সামান্য উঁচু দিয়ে ছুটে গিয়েছিল। বুলেটে শিরদাঁড়ার চামড়া ছড়ে গিয়ে স্নায়ুতন্ত্রে ধাকা লাগার ফলেই বাঘ কিছুক্ষণের জন্যে কুপোকাৎ হয়ে পড়েছিল। তলা দিয়ে যাবার সময় ঘাসের ডগায় রক্তের যে ক্ষীণ আভাস লেগেছিল, তাই থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা গেল। পিছু হটবার সময় বাঘ কোনোরকম তাড়া না করে ধীরে সুস্থে রয়ে সয়ে হেঁটেছে; বাঘ যে রাস্তা দিয়ে এসেছিল হুবহু সেই রাস্তা দিয়েই, প্রায় নিজের পায়ের ছাপে পা মিলিয়ে ফিরে গেছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, বাঘ কোনোরকম ব্যথা বা সে রকম কিছু ভয়ও পায় নি। খুব সম্ভবত দুর্ঘটনাটার কথা সে জানতেই পারে নি। গুলির শব্দটা বোধহয় সে শুনতেই পায় নি। বুলেটের (২৭০ গ্রেন, রুপোর ডগা) গতিবেগ ছিল সেকেণ্ডে ২,৭০০ ফুট—অর্থাৎ, শব্দের চেয়েও

বেশি দ্রুতগতি ; গুলির শব্দ তার কানে পৌঁছুনোর আগেই ধাক্কা খেয়ে তৎক্ষণাৎ পড়ে গিয়ে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। বিনা শশব্যস্তে গয়ংগচ্ছ ভঙ্গিতে তার পিছু হটার কারণ এ থেকেই বোঝা যায়।

শালবনের ভেতর দিয়ে বাঘটা একটা মজা নদীর খাতের মধ্যে চলে আসে; সেখানে রুপোলি বালির গায়ে, কা জ্বালা, আমাদের জন্যে সে পায়ের ছাপ রেখে গেছে; তার সেই পায়ের ছাপের মর্মোদ্ধার করে আমার একেবারে মাথা কাটা গেল।

এ যে সেই, ঘাগী গরুমারা বাঘ, তাতে কোনো সন্দেহই নেই; গত দু বছর ধরে বার বার আমরা ওকে ঢুঁড়ে বেড়িয়েছি আর ও
আমাদের সমানে ধোঁ· ... র আমরা ওর দিকে
ছুঁড়ে দিয়েছি মৃত্যু— ... নিয়ে দু দুবার সে
মৃত্যুকে কলা দেখাল।

আরও দু বছর কেটে ( ... চ কব্জা করবার আশা
আমাকে প্রায় ছেড়েই ... আমি ওর পিছু নেবার
চেষ্টা করেছি, ততবা ... আমাকে হারিয়ে ভূত
করেছে। জঙ্গলবিদ্যা ... রের সুচতুর প্রয়োগে
এবং পশ্চাদ্ধাবনকারীর চোখে ধুলো দেবার সূক্ষ্ম কায়দায় বার বার দেখা গেছে, আমি ওর পাশে দাঁড়াতেই পারি না।

দুদিন আগে কি দুদিন পরে, প্রত্যেক শিকারীই এমন এক এলেমদার বাঘের দর্শন পাবে, যে হয় তার 'মড়ি'র কাছে ফিরে যাবে না আর নয়ত টোপের কাছে ঘেঁষবেই না। এইসব বাঘের খুঁটিয়ে ইতিবৃত্ত নিলে মোটামুটি দেখা যা· কোনো না কোনো সময়ে হয় 'মড়ি'র ওপর, নয় টোপের ওপর, বসা অবস্থায় তারা বন্দুকের গুলি খেয়েছিল।

এইসব বাঘ শিকারে প্রচুর সময় যাবে, প্রচুর ধৈর্যের দরকার

হবে; তাছাড়া এ কাজে অবশ্যই শিকারীর মানসিক আর কায়িক ক্লেশও কম হবে না।

এই ধরনের ফিচেল জানোয়ারকে ঢিট করতে গিয়ে আমি দেখেছি একটি পন্থা খুব কাজের হয়। সেটি হল: কার কি রকমের খাত খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে তাকে সেইমত টোপ দেওয়া। যতক্ষণ না তার সন্দেহ যাচ্ছে, ততক্ষণ তাকে একটার পর একটা টোপ দিয়ে যেতে হবে। খোঁটার-সঙ্গে-বাঁধা টোপ মুখে নিতে যদি দেখি সে ভয় পাচ্ছে, তাহলে আমি তাকে সে জায়গায় দেব পায়ে-ভার-বাঁধা টোপ। টোপটাকে যখন সে মেরে রেখে দেবে, আমি একদম ঘাঁটাব না— 'মড়ি'টাকে নিয়ে সে যা খুশি তাই করুক; এবং আমি দেখব আমার দলের কেউ যেন টানাহেঁচড়ার দাগ ধরে অনুসরণ না করে। বাঘ হয়ত সে রাত্রে সেখানে নাও ফিরে আসতে পারে, কিন্তু তার পরের রাত্রে এসে সে যে আশেপাশে ঘুরঘুর করবে, এ প্রায় অবধারিত; এবং 'মড়ি'টা দেখে নিশ্চয়ই তার জিভে জল আসবে, কিন্তু সম্ভবত কাছে ঘেঁষবে না।

এবার আমি তার জন্যে ঐ একই জায়গায় হুবহু আগেরটারই মত হয় খোটায় বেঁধে, নয় পায়ে ভার বেঁধে আরেকটা 'মড়ি' রেখে দেব। পরদিন সকালে মাটিতে ঘেঁষটানির দাগ অনুসরণ করে, শেষ 'মড়ি'টা যেখানে সে রেখে চলে গেছে তার পঞ্চাশ ষাট গজ দূরত্বের মধ্যে সেই রাত্রেই একটা তাজা টোপ বাঁধব এবং সেই জ্যান্ত টোপ সামনে রেখে ওৎ পেতে বসব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমার এই মতলবে কাজ হাসিল হয়েছে এবং আমি গুলি করার সুযোগ পেয়েছি।

সে ধরনের বাঘ যদি বাঁধা টোপ বা এমন কি ছাড়া টোপও মারতে গররাজী থাকে, তবু দেখা যাবে লোভ সম্বরণ করতে না পেরে অন্তত চোখে দেখে যেতেও একবার সে আসবে। বাঘ যেখান দিয়ে সাধারণত চলাফেরা করে, সেখানে নালায়, রাস্তায় বা দাবাগ্নি-রেখায় জ্যান্ত টোপ রেখে পঞ্চাশ গজ মতন তফাতে ওপরে বা নিচেয় কেউ

যদি মাচা বাঁধে, তাহলে শত সতর্কতা আর কলেকৌশলে গা-বাঁচানোর শত চেষ্টা সত্ত্বেও বন্দুকের পাল্লার মধ্যে বাঘের এসে পড়বার খুবই সম্ভাবনা থাকে।

৮ এই গরুখেকোর বেলায় আমি এ সমস্তই করে দেখেছি, এ হারামজাদা একের পর এক আমার প্রত্যেকটা চাল একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছে।

তখন ডিসেম্বর মাস। কালাগড়ের ওপর দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম অন্য একটা শিকার এলাকায়। ব্লকের নাম মণ্ডল। রাস্তায় আমার কানে এল গরুখেকো বাঘটির নতুন নতুন দৌরাত্ম্যের খবর। ইদানীং সে প্রকাশ্য দিবালোকে রাখাল ছোকরাদের ভড়কি দিতে শুরু করেছে; ওর আলগোছে থাবা চালানো দেখে রাখালরা তো ভয়ে মরে আর সেই ফাঁকে সে দেখে শুনে মনের মতন একটা শিকার উঠিয়ে নিয়ে কেটে পড়ে। গোটা এলাকাটাকে বলতে গেলে সে দাবিয়ে রেখেছে; মানুষ দেখলে ওর মারকুটো ভাব এমন বেড়ে যাচ্ছে যে, এলাকার তামাম লোক ওর ভয়ে ট্যাঁ ফোঁ করতে পারছে না।

কিন্তু আমার হাত পা বাঁধা, ঐ ব্লকে আমার বন্দুক ছোঁড়বার পারমিট তো নেই। যদিও আগেকার চেষ্টার জের টেনে বাঘটার সঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে লড়ে যেতে মনে মনে আমার বেদম ইচ্ছে হচ্ছিল।

রাতটা আমি ফরেস্ট রেস্ট-হাউসে থেকে গেলাম। শেষ রাত্তির অবধি সমানে আমি শুনলাম বাঘের রোমহর্ষক গর্জন। তার অসম্ভব গলার জোর জাহির করে সারা রাত একটি গোয়ালঘরের কাছে সে পায়চারি করে বেড়ালো। এটা তার অনেকদিনের রপ্ত করা একটা পুরনো কৌশল; লোকে এতে ঘর ছেড়ে বেরোতে ভয় পায় আর হুটোপাটির ফলে গরুবাছুরেরা দড়িদড়া ছিঁড়ে ছত্রখান হয়ে পড়ে।

সকালবেলায় বনবিভাগের কর্তৃপক্ষের কাছে স্পেশাল পারমিট চেয়ে আমি একটা চিঠি দিলাম। তারপর আমার শিকারের ব্লকে রওনা হলাম।

বড় সুন্দর জঙ্গল এই মণ্ডল শুটিং ব্লক। জঙ্গলটাকে ছুটকরো করে একটি পাহাড় এখানে অতর্কিতে ৯,০০০ ফুট উঁচুতে ঠেলে উঠেছে ; দক্ষিণপ্রান্তে কাকচক্ষু জল নিয়ে বেড় দিয়ে আছে রামগঙ্গা নদী। ডিসেম্বরে এ-জায়গায় সে-বার পড়েছিল হাড়-কাঁপানো দুরন্ত শীত ; চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টাই ছিল ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা। তাছাড়া, বুনো হাতির একটা বড় দঙ্গল সে সময় দিনরাত দাপাদাপি করে, গাছ ভেঙে, বাঁশঝাড় উপড়ে জঙ্গলটা ভয়ঙ্কর রকমের বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এ সত্ত্বেও সেখানে শিকার আমি বেশ ভালোভাবেই করতে পেরেছিলাম। এক তো একটা বাঘ, তাকে গাঁথতে আমায় বিশেষ বেগ পেতে হয় নি ; একটা সাংঘাতিক হিমালয়ী ভাল্লুক, জোড়া খুন তো সে করেইছিল, তাছাড়া এক ডজনের ওপর মানুষকে সে খুব খারাপভাবে জখম করেছিল। সেবার আরেকটু হলে একটা হাতির পায়ের নিচে আমি গুঁড়িয়ে যেতাম অথবা হাতিটা আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো একটা একটা করে টেনে ছিঁড়ে ফেলত, সেটা ছিল একটা কুখ্যাত মারমুখো খ্যাপা হাতি, না খোঁচাতেই সে আমার ওপর চড়াও হয়েছিল। থাক এখন সে গল্প. কালুশহীদ ফরেস্টের গরুখেকো বাঘের প্রসঙ্গে সেটা নয় সে না।

জঙ্গলে আমার এক পক্ষকালের পারমিটের মেয়াদ যখন অর্ধেক উত্তীর্ণ, তখন লোক-পরম্পরায় শুনলাম ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার ( ডি এফ ও ) কাছেপিঠে কোথাও এসেছেন. পরিদর্শনের কাজে। আমি তড়িঘড়ি তার কাছে চলে গিয়ে বললাম, গরুখেকো বাঘটা মারার ব্যাপারে আমি আরেকবার ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাই—উনি যেন আমাকে অনুমতি দেন। ভদ্রলোকের দরাজ দিল আছে এসব ক্ষেত্রে যত রকমের নানা ফিতের বাঁধন আছে, সবগুলোই কেটে ছুটে দিয়ে তিনি সাগ্রহে আমার অনুরোধে সম্মত হলেন। সেদিনই সন্ধেবেলায় চটপট জিনিসপত্র বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে আমি আমার জীপে করে সটান কালুশহীদ ব্লকের ফরেস্ট রেস্ট-হাউসের দিকে রওনা হলাম—জায়গাটা মাইল কুড়ি দূর বটে, কিন্তু রাস্তা বেজায় খারাপ।

পরদিন খুব সকালবেলায় উঠে পড়লাম; কোথায় কী আছে দেখতে সকালবেলায় এমনিতেই আমি বেরোই। এলাকার ফরেস্ট গার্ড আমি বেরোবার আগে এসে আমায় ধরল; লোকটা আমার পুরনো দোস্ত, কেননা এর আগেও অনেকবার আমি এখানে এসেছি। লোকটা এসে আমাকে বলল যে, আগের দিন সন্ধেবেলায় কাছেই এক জঙ্গলে গরুখেকো বাঘটা একটা মোষ মেরেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে আমি সেই গোশালায় গিয়ে হাজির হলাম, যেখানে মোষটা থাকত। গোশালাটি হল একজন গুজরের। গুজর হল একটি যাযাবর উপজাতি; বেশ কয়েক পুরুষ আগে এরা থাকত কাশ্মীরে। সেখান থেকে এদের পূর্বপুরুষেরা বিতাড়িত হয়ে চলে আসে। দুধ আর দুগ্ধজাত সামগ্রী বিক্রি করে কায়ক্লেশে এরা দিন গুজরান করে; গোচারণের জন্যে জঙ্গলের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় অনবরত ঠাঁইনাড়া হয়ে হয়ে এরা যাযাবর জীবন যাপন করে। গুজরদের মত কঠোর পরিশ্রমী জাত খুব কমই আছে, অথচ এদেশের সমাজে এরা সবচেয়ে দরিদ্র এবং সবচেয়ে শোষিত মানুষ। রাত পোহানোর সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে, গুজর মেয়েপুরুষেরা গাছের মগডালে উঠে গিয়ে মোষদের খাওয়াবার জন্যে পাতা কাটতে লেগে গেছে এবং গভীর রাত অবধি তারা মোষদের খাওয়াতে আর দেখাশুনো করতে ব্যস্ত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এদের যে কী কষ্টের জীবন, কল্পনা করা যায় না। বাঘের হাতে খুন হওয়া মোষটা ছিল একজন বিধবার একমাত্র সম্পদ। গোশালার মালিক তার আত্মীয়; স্বামীর মৃত্যুর পর মোষটাকে নিয়ে তার কাছে সে এসেছিল বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবার জন্যে। বিধবা মেয়েটির সে এক অবর্ণনীয় অবস্থা; বাঘের হাতে মার খেয়ে সে কেমন যেন ধন্দ মেরে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে বলে কয়ে ঠেলে ঠুলে তাকে তো আমি নিয়ে গেলাম মোষটা কোথায় পড়ে আছে দেখিয়ে দেবার জন্যে। আরও আধ মাইলটাক আমাকে একটা খাড়া টিলা বেয়ে উঠতে হল; উঠে দেখি ওপাশের গিরিদরিতে একটা প্রমাণ-সাইজের

মোষের লাশ পড়ে আছে। বেশ একটা নিচু গিরিগর্তে বাঘ তাকে মেরে ফেলে পেছনের দিকের খানিকটা অংশ খেয়েছে। মোষটা ছিল প্রকাণ্ড দশাসই এবং তাকে পেড়ে ফেলে যমের বাড়ি পাঠাবার আগে তার হাঁটুটা ভেঙে খোঁড়া করে নিতে হয়েছিল।

মোষটার ঘাড়ে দাঁত বসানোর গভীর ক্ষত ছিল; ঘাড়টা ভাঙা হয়েছিল মোচড় দিয়ে। বাঘের পিঠে ছিল নখ দিয়ে আঁচড়াবার দাগ। দেখে বোঝা গেল, বাঘ অল্প দূরত্বে পেছন থেকে তেড়ে এসেছিল। দাঁত বা নখ বসিয়ে মোষের ঠ্যাং খোঁড়া করে নেবার পর বাঘ তার পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পিঠের ওপর বসে বড় বড় কাস্তে আকারের নখ দিয়ে কোণাচে করে ঠেসে ধরে মুণ্ডুর দিকের ঘাড়ে গভীরভাবে দাঁত বসিয়ে দিয়ে সেইসঙ্গে পিঠের ওপর ভারী দেহের চাপ দিয়ে মোষটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলেছিল।

একটু বড় আকারের জানোয়ারকে বাঘ এমনিভাবে মারে। লোকের ধারণা, বাঘ অনেকটা দূর থেকে তার শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সামনের থাবা দিয়ে এক ঘা বসিয়ে তাকে মেরে ফেলে অথবা নখ দিয়ে তার টুঁটি ছিঁড়ে রক্ত পান করে। আসলে এটা দেখার ভুল। এদেশের প্রত্যেকটি মাংসাশী প্রাণীই তার শিকারকে মারে দাঁত দিয়ে—সামনের থাবা মেরে নয়। নখ দিয়ে পাকড়ানো বা আঁকড়ে ধরা ছাড়াও, দাত বসিযে মারবার আগে বাঘ কখনও কখনও নখ দিয়ে তার শিকারকে পঙ্গু করে নেয়। বাঘ সাধারণত পা টিপে টিপে কাছে এসে তারপর শিকারের মাথা, ঘাড় বা কাঁধের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই বাঘ তার শিকারকে মাটিতে পেড়ে ফেলে নিজের ওজনের ভারে আর তার সঙ্গে যুক্ত থাকে তার লাফ দিয়ে পড়ার বেগ: শিকার যখন মাটিতে ধপাস্ করে পড়ে যায়, তখনই তার ঘাড়ে বসে বাঘের মরণ কামড় দেবার সময়।

বাঘ যে সর্বদাই তার শিকারের ঘাড় ভাঙে, এটা ঠিক নয়। যে কেউ বাঘের চোয়াল ফাঁক করে তারপর নখরকান্তি একটা ডাগর

মোষের ঘাড়ের দিকে তাকাতে পারেন। মোষের ঘাড়ের একগোছা মাংসপেশীর বেশি বাঘ তার হাঁয়ের মধ্যে ধরাতে পারবে না এবং তাতে তার পক্ষে বাগিয়ে ধরে সেভাবে ঘাড় মট্‌কানো সম্ভব বলে মনে হয় না। আমি ঘাড়-ভেঙে-যাওয়া অনেক শিকার দেখেছি; তা সত্ত্বেও, শিকারের ঘাড় ভাঙাই যে বাঘের দস্তুর—এ যুক্তি ধোপে টেঁকে বলে আমার মনে হয় না।

হ্যাঁ, তারপর, যে গল্পটা বলছিলাম।

আচমকা ঘুরে শেষ হয়ে যাওয়া সেই সরু গভীর গিরিখাতে গরুখেকো বাঘের শেষতম শিকারটি পড়ে ছিল। প্রায় সাড়ে আঠারো মণী সেই মোষটাকে ঐরকম কঠিন বাঁকের মুখে মেরে টেনে নিয়ে যাওয়া বাঘের পক্ষে সম্ভব হয় নি। গিরিখাতের দুই দেয়াল একেবারে খাড়া নাকের সোজা প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে উঠে গেছে, মাঝখানে প্রায় দশ গজ মতন ফাঁক। পাড়ের মাথায় বসলে কোনো কোণ থেকেই বাঁকের মধ্যেকার মোষটাকে ঠাহর করা যাবে না; আবার খাতটা এত সরু যে, সেখানে মাটিতে কেউ ওৎ পেতে বসলে বাঘের পক্ষে আর যাতায়াতের জায়গা থাকবে না। পাহাড়ের গায়ে এমন কোনো শৈলশিরা বা ফাঁকফোকর নেই যেখানে কোনোরকমে কায়-ক্লেশে বসে বাঘ ফিরে আসা অবধি অপেক্ষা করা যায়।

এই অখদ্যে জায়গাটাতে একটু শুধু বাঁচোয়া ছিল এই যে, পাড়ের ওপর গজ তিরিশেক দূরে 'মড়ি'টার সত্তর আশী হাত উঁচুতে ছিল একটা গাছ। গাছটাতে আমি উঠে পড়লাম এবং দেখলাম এমন কি গাছের মগডাল থেকেও 'মড়ি'টা নজরে পড়ছে না। বাঁকের ভেতর সেটা সম্পূর্ণভাবে আড়াল পড়ে গেছে। তাছাড়া দুদিকের দেয়ালের ছায়ায় তলাটা এমন অন্ধকার হয়ে আছে যে, এমন কি সূর্য মাথার ওপর থাকলেও তলায় কী আছে না আছে ঠাহর করা শক্ত। গাছের একটা ডাল বেরিয়ে গিয়ে গিরিখাতের ঠিক মাথার ওপর প্রস্থের সিকিভাগ জুড়ে ঝুলছে; এই একটিমাত্র জায়গা যেখান থেকে 'মড়ি'র

খানিকটা অংশ তাও দেখা যায়। আমি আস্তে আস্তে সেই ডাল বেয়ে নিজের ভার সাম্‌লে একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে শঙ্কটাপন্নভাবে কোনোরকমে বসবার একটা জায়গা খুঁজে পেলাম। ঘোড়ার পিঠে চড়ার মত দু'পা ফাঁক করে কোনোরকমে তো ডালের ওপর বসলাম; ঠেস দেবার কিছু না থাকায় আমার পা দুটো শূন্যে ঝুলে রইল। ডালটি খুব মোটা না হলেও আমার ভার বহন করার পক্ষে যথেষ্ট শক্ত; কিন্তু হলে কি হয়, আমি পড়লাম বিশ্রী অবস্থায়—কেননা একটু নড়লে চড়লেই এবং সামান্য হাওয়া হলেই ডালটা অমনি দুলতে থাকে। আমার মতন অধম পদাতিক শিকারীর পক্ষে বেমানান এই উচ্চাসন থেকে যখন আমি 'মড়ি'টা নজরে আনবার চেষ্টা করছিলাম, মনে হচ্ছিল যেন নিচে কোন্ এক রসাতলের দিকে আমি তাকিয়ে আছি। খুব সাবধানে নিজের ভার সাম্‌লে বসে আছি, একে তো সেটাই খুব ভয়ের; কিন্তু তার ওপর, ঘাড়টাকে প্রায় বার করার মত ঝুঁকে কোমর থেকে গোটা শরীরটা প্রায় ছাড়িয়ে নিয়ে, দুম্‌ড়ে, মুচ্‌ড়ে আমাকে যদি এখন বন্দুক ছুঁড়তে হয়—আমার ভয় হচ্ছিল, আমার '৪৭০ কর্ডাইট রাইফেলের ধাক্কায় আমি হয়ত নিচের রাক্ষুসে গর্তটার মধ্যে গিয়ে ছিট্‌কে পড়ব।

ঐরকম একটা হতচ্ছাড়া জায়গা থেকে গুলি করে বাঘ মারার চেষ্টা নিতান্তই যেন আহাম্মকির কাজ; অথচ আর কোনো উপায়ও ছিল না। হয় এই সুযোগ নেব, নয় নেব না। ঠিক করলাম, নেব।

আমাকে দেখতে হল, এরই মধ্যে তবু কতটা কী করা যায়। ভেবে দেখলাম একমাত্র যা করা সম্ভব, তা হল রাইফেলটা বদলানো। এমন একটা রাইফেল নেওয়া যাতে ধাক্কা মারবে কম, অন্তত মনে এটুকু ভরসা থাকবে যে গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিট্‌কে পড়ব না। বাংলোয় আমার একটা ডাক করার মাছিওয়ালা '·৩৭৫ এইচ অ্যাণ্ড এইচ ম্যাগনাম' বাড়তি রাইফেল আছে। '৪৭০ রাইফেলের জায়গায় সেটা আমি ব্যবহার করতে পারি। যদিও '৩৭৫ ম্যাগনাম তার সাড়ে বত্রিশ ফুট পাউণ্ডের ধাক্কায় চাট মারে খচ্চরের মত। তবু

'৪৭০-এর প্রাণান্তকর ঠেলার কাছে সেটা মনে হবে যেন ভালবাসার টুস্‌কি।

ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ করে বাংলোয় ফিরে গিয়ে বিকেল তিনটের মধ্যে এসে প'ড়ে যথাসময়ে আমি তো গিয়ে সেই মট্‌কায় চড়ে বসলাম। বনের অতটা ভেতরে অমন নির্জন জায়গায় 'মড়ি'টা যখন পড়ে আছে, বাঘ আসতে নিশ্চয়ই বেশি দেরি করবে না—এ বিষয়ে আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, তাছাড়া তাড়াতাড়ি এলে আমিও বাঁচি—এমন কষ্টকর অবস্থায় আমাকে আর বসে থাকতে হয় না। আমার হিসেব ছিল, বাঘ যখন পেট ভরে খায় নি, নিশ্চয়ই ওর ক্ষিধে পাবে—'মড়ি'টার কাছে সকাল সকাল তাহলে ও ফিরে আসবে। কোনো দিক দিয়েই পাঁচটার বেশি অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়: কেননা তারপর খাদের মধ্যে এমন অন্ধকার হয়ে যাবে যে, তখন আর গুলি করা সম্ভব হবে না। মাচা তো নয়, যেন আমাকে শূলে চড়ানো হয়েছে—তা সত্ত্বেও, এই দেড়টি ঘণ্টা সময় নিশ্চয় আমি মরি-বাঁচি করে কাটিয়ে দিতে পারব।

আমিও গাছে উঠে বসেছি, আর তার ঠিক কুড়ি মিনিটের মাথায় আমার পেছনদিকে জমির ওপর আমার প্রায় দশ গজ তফাতে একটা আওয়াজ পেলাম—কেউ যেন শুকনো পাতাগুলোর মধ্যে গা আঁচড়াচ্ছে। আসবার সময় ওদিকটাতে কয়েকটা কালিজ তিতিরকে ত্রস্ত পায়ে আসতে দেখেছিলাম; আমি ভাবলাম ওরা হয়ত খাবার খুঁটে খুঁটে বেড়াচ্ছে, তার শব্দ। আমি আর ঘাড় ঘুরিয়ে কী ব্যাপার দেখবার চেষ্টা করলাম না।

খানিক পরে আবার সেই আচড়ানোর আওয়াজ; এবার সেই সঙ্গে ভারী পায়ের তলায় মট্ করে একটা শুকনো কাঠি ভাঙার শব্দ পেলাম। তিতির নিশ্চয় এমন ভারী জীব নয় যে, তার পায়ের নিচে কাঠি পড়লে অমন সশব্দে মড়মড় করে ভাঙবে?

কী তাহলে? শেয়াল নাকি? শেয়াল হলে মাটিতে অমন আঁচড়াবার শব্দ হবে কেন? ও শব্দ একমাত্র বেড়ালের জাতই করে

থাকে—মেনি আর বাঘা—হয় ও চাপা দেবার জন্যে, নয় মাঝে মাঝে নখ সাফ করবার জন্যে। তবে কি বাঘ?

কিন্তু ইনি যদি তিনি হন, তাহলে এত কাছে এবং এত আগে এসে পড়ে নিশ্চয়ই আমাকে গাছে উঠতে দেখে থাকবে। তা যদি দেখে থাকে, তাহলে সে এখান থেকে চলে যেত। উঁহু, এ আমার অনেকদিনের চেনা সদাসতর্ক ধূর্তের শিরোমণি সেই গরুখেকো বাঘ হতেই পারে না। তবু আমার প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছিল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে; শেষ পর্যন্ত কিছুতেই আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। খুব সন্তর্পণে আমার গোটা শরীরটা নিঃশব্দে যতদূর সম্ভব ঘোরালাম—আর একচুল ঘুরলে বেসামাল হয়ে একেবারে খাদের মধ্যে উল্‌টে পড়ব, এইরকম অবস্থা। কিছুই আমার চোখে পড়ল না, এদিকে আমার নড়ার দরুন গাছের হতভাগা ডালটা দুলতে আরম্ভ করল। যতক্ষণ না সেই দুলুনি থামল, আমি ত্রিভঙ্গমুরারী হয়ে ঠায় একভাবে বসে থাকলাম—পিঠে খিল ধরার টনটনে ভাবটা ক্রমশ ব্যথায় দপ্‌দপ্‌ করতে লাগল। আর ঠিক তখনই আমি দেখতে পেলাম আমার অনুসন্ধানের বস্তুটি ঘাসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে খুব ধীরে-সুস্থে নির্বিকারভাবে আমার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিগোচর এলাকাটি পার হয়ে যাচ্ছে। জালার মত মুখ, আর সেই মুখের আশেপাশে ফোলানো কেশরের মত ঝাঁকড়া গোঁফ, প্রকাণ্ডকায় মোটাসোটা ভারি সুপুরুষ দেখতে একটি বাঘ আকাশে ল্যাজ উঁচিয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাচ্ছে। ওর লম্বা গড়নের সুশ্রী চিকন-চাকন শরীরটা ছায়ার ভেতর রোদের ফালির মতন আমার চোখের সামনে দিয়ে যখন হেলেদুলে চলে গেল, চারপাশের ঘাসগুলো সোনার রঙে ঝলমলিয়ে উঠেছিল।

নড়া ডালটা দুহাতে আঁক্‌ড়ে ধরে নিজের ভার সাম্‌লে ত্রিভঙ্গমুরারী হয়ে আমি কোনোরকমে বসে। আমার কিছু করবার ক্ষমতা নেই। হাত ছাড়লেই রসাতলে পতন। অথচ বন্দুক চালাতে গেলে হাতদুটো ছাড়াতেই হবে। আট গজেরও কম দূর দিয়ে গোটা শরীরটা পেতে দিয়ে বাঘ এমন রয়ে সয়ে চলে গেল যে, তার মধ্যে

অনায়াসে ভালোভাবে তাক করে একটার বদলে পাঁচ পাঁচটা গুলি ছুঁড়ে বাঘকে ঝাঁঝরা করা যেত। খানিক পরে বাঘ আমার দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল, আর আমি যে-কে সেই ত্রিভঙ্গমুরারী হয়ে গাছের ডালে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলে রইলাম।

হা কপাল! বরাতে শেষে এই ছিল! বাঘটার হাতে না জানি আরও কত জীবনহানি হবে!

এবার আমি ঘুরে সোজা হয়ে বসলাম। দুহাতে রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে থাকলাম, বাঘ এবার নিশ্চয় খাদের নিচে 'মড়ি'টার কাছে যাবে—তখন আমি আরেকবার ওর সঙ্গে বহুদিনের বকেয়া হিসেব চুকিয়ে ফেলার সুযোগ পাব। আমি একেবারে ঘাড় বার করে যতদূর সম্ভব চোখে টান পড়িয়ে 'মড়ি'টা নজরে রাখবার চেষ্টা করলাম। কতক্ষণ আমি ঐভাবে ছিলাম জানি না। শরীরে চাড় লাগার দরুন আমার সারা শরীর থর থর করে কাঁপছিল এবং তার ফলে আমার কাঁপা-কাঁপা দেহের ভারে গাছের হতচ্ছাড়া ডালটাও সমানে দুলছিল। ঘড়িতে তখন সাড়ে চারটে বেজে গেছে, খাদের নিচে ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। খালি চোখে তখন আর 'মড়ি'টাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বন্দুকে লাগানো দূরবীন দিয়ে তখনও 'মড়ি'টা বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। দিনটা ছিল বেশ কনকনে ঠাণ্ডা এবং আমার গায়ে থাকার মধ্যে শুধু একটা খাকিরঙের সুতির শার্ট আর খাকিরঙের সুতির পাতলুন। ডিসেম্বরের মারাত্মক শীতের রাত্তির বে আগতপ্রায়, আমার গায়ে তার হিমকরস্পর্শে বিলক্ষণ তা মালুম হচ্ছিল। শীতে আমি হি হি করে কাঁপতে শুরু করে দিলাম; তাতে হল আরও মুশকিল, গাছের ডালটা আরও বেশি দুলতে শুরু করে দিল।

এইভাবে জ্বালাতন পোড়া হয়ে যখন আমি প্রায় ঠিকই করে ফেলেছি যে, বাজি চটিয়ে দিয়ে উঠে চলে যাব—ঠিক সেইসময় 'মড়ি'র আশপাশে একটা নড়চড়া লক্ষ্য করলাম। সঙ্গে সঙ্গে দুপায়ের ফাঁকে ডালটা যথাসম্ভব মজবুত করে ধরে বন্দুকটা সিধে করে

দূরবীনের ভেতর দিয়ে তাকালাম। দেখি কি, বাঁকটার একপ্রান্তে পাহাড়ের বেরিয়ে-আসা একটা খোঁচের আড়ালে অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে গিয়ে বাঘের বিরাট পাছার দিকটা দেখা যাচ্ছে—বন্ধ কোণের দিক থেকে পাথরে আর দেয়ালে ঠাসা 'মড়ি'টাকে সে সরাবার চেষ্টা করছে। বাঘের মোক্ষম জায়গাগুলোর একটাও আমার দৃষ্টিপথের মধ্যে পড়ছে না। এমন কি পেছনের দুটো পায়ের ঠিক সামনে শিরদাঁড়ার কাছেই থাকে যে কিডনি, তাও কার্নিসের প্রায় ছ ইঞ্চি আড়ালে ঢুকে থাকায় আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

বাঘ ঠাঁইনাড়া না হওয়া অবধি আমার পক্ষে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। দূরবীনে চোখ লাগিয়ে বাঘের দেহের দৃশ্য অংশটা তাক করলেও, গাছের ডালটা অবিরাম দুলতে থাকায় নিশানাটা কেবলি নড়ে নড়ে যাচ্ছে। রাইফেলটা সিধে রাখতে এবং বন্দুকের মাছিটা বাঘের শরীরের একই জায়গায় স্থির করে রাখার যতই চেষ্টা করি না কেন, গাছের ডালের দুলুনিতে এবং অতিরিক্ত চাড়-লাগা আমার মাংসপেশীর কাঁপুনিতে আমার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল। মাংসপেশীর টান টান ভাব ছাড়িয়ে নেবার জন্যে রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখলাম এবং খানিক পরে বাঘের খচর-মচর আওয়াজের দিকে লক্ষ্য করে রাইফেলটা আবার কাঁধে চড়িয়ে নিলাম। এবার আমার রাইফেলের দূরবীনে বাঘের পুরো শরীরটা ধরা পড়ল! লম্বালম্বি হয়ে পাশ ফিরে বাঘ তার শিকারের ল্যাজের দিকটা থেকে খাচ্ছে। আমি চেষ্টা করলাম বাঘের ঠিক ঘাড়ের গোড়ায় টিপ করতে, কিন্তু দেখলাম রাইফেলের মাছিটা বাঘের সারা শরীরে নেচে বেড়াচ্ছে। রাইফেলটা এবার তার পাঁজরা বরাবর সরিয়ে আনলাম; তাতে ঘাড়ের গোড়ার চেয়ে ঢের বড় জায়গা আমার পাল্লার মধ্যে পাব। এরপর যেই সামান্য ক্ষণমুহূর্তের জন্যে নড়ন্ত মাছিটা কাঁধের মাঝ বরাবর এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমি আলতো-ভাবে রাইফেলের ঘোড়াটা টেনে দিলাম।

সবনাশের মাথায় বাড়ি, ইস্! গুলিটা ফুটল না।

আমি কী আর করব, কপাল চাপড়ালাম আর যে দোকানদার তাজা বলে আমাকে পুরনো কার্তুজ গছিয়েছে মনে মনে তার মুণ্ডপাত করলাম।

গুলির মুখে ঘা-মারা কলটার আওয়াজে বাঘ কান খাড়া করল। কিন্তু ভয় পাওয়ার বদলে রেগে গিয়ে এমন এক ডাক ছাড়ল যা কানে গেলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। ঐভাবে নড়বড়ে ডালের ওপর বসে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব অকেজো গুলিটা ফেলে দিয়ে একটা নতুন কার্তুজ বন্দুকে ভরে নিলাম। ফেলে দেওয়া কার্তুজটা খাদের মধ্যে পড়ায় বেশ জোর আওয়াজ হল। গুলির ঠুং করে আওয়াজ, রাইফেলে গুলি ভরতে গিয়ে শব্দ এবং আমার নড়াচড়া— সব মিলিয়ে বাঘকে এমন ক্ষেপিয়ে তুলল যে, আমার গাছের তলায় গাঁক গাঁক করতে করতে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সে তেড়ে এল। বোধহয় ওঠবার চেষ্টায় আমার নিচেকার দেয়ালটা সে নখ দিয়ে পাগলের মতন আঁচড়াতে লাগল; কিন্তু ওভাবে তার পক্ষে দেয়াল বেয়ে ওঠা সম্ভবই নয়। আমাকে সে দেখতে পেয়েছে এবং আমি যে তার অমন বাড়া ভাতে ছাই দেবার চেষ্টা করেছি তার জন্যে ও আমাকে দেখে নিতে চায়। কিন্তু এ পর্যন্ত আসতে গেলে খাড়াভাবে ওকে একশো পঞ্চাশ ফুট উঠতে হবে; আমি জানতাম, ও কিছুতেই তা পারবে না। এক ও যদি পাড়ের ওপর দিয়ে উঠে এসে আক্রমণ করে, একমাত্র তাহলেই ও আমাকে চিট করতে পারে। বেড়াল জাতের প্রাণীদের মধ্যে একগুঁয়ে ভাবটা যেরকম সহজাত, তাতে অতটা বুদ্ধি তার মাথায় খেলবে না— আমার সেটাই ভরসা।

বাঘ সমানে দেয়ালে গোঁত্তা মারতে লাগল আর নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগল, আর সেইসঙ্গে গর্জনের পর গর্জনের ভয়ে আর বিভীষিকায় পুরো গহ্বরটা কা‍ কানায় ভরে তুলল। আমার নিচে বাঘটা একই সরল রেখায় থাকায় আমার পক্ষে তাকে হেঁট হয়ে তাক করা সম্ভব নয়---কেননা ওভাবে তাক করতে গেলেই আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাব।

আমি পড়ে গেলাম মহা ফাঁপরে। এদিকে মাথার ওপর খাঁড়া উঁচিয়ে আছে হিমশীতল রাত্রি, ওদিকে পায়ের নিচে রুদ্রমূর্তি বাঘের সঘন গর্জন। বাঘ তেড়ে আসবে, এই ভয়ে গাছ থেকে নামতেও পারছি না; আবার শেষটায় কখন পা ফস্‌কে বাঘের হাঁ-করা মুখের মধ্যে গিয়ে পড়ি, সেই ভয়ে গাছে বসে থাকতেও পারছি না। পড়েছি উভয়সঙ্কটে।

মাঝরাত্তির নাগাদ বাঘ তার শিকারের কাছে সরে গেল; আমি তার হাপুস-হুপুস করে খাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি ভাবলাম, জানোয়ারটা এখন মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে গিলতে লেগে গেছে, যদি আমি টুঁ শব্দটি না করে গাছ থেকে চুপচাপ কেটে পড়তে পারি, তাহলে ফিরে গিয়ে দিব্যি গরম ভাত আর গরম বিছানার সুখ ভোগ করতে পারি—এখনই তার সুযোগ। কিন্তু গাছ থেকে নামতে গিয়ে বাঘ যদি টের পায়? ··

তাহলে মরেছি। একে এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার আর তার ওপর কে জানে কোন্ মান্ধাতার আমলের কার্তুজ। বিনা বাক্যব্যয়ে ক্রুদ্ধ বাঘ আমাকে নিঃসন্দেহে কড়মড়িয়ে খাবে।

কী করব না করব, তার ভালমন্দ মনে মনে আরেকটু তোলপাড় করে দেখার জন্যে আরও খানিকক্ষণ রয়ে গেলাম এবং শেষকালে গা-গতরের টনটনানি দপ্‌দপানির ঠেলায় ও-জায়গাটা ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম। ঠাণ্ডায় হাতপা জমে গিয়ে অথবা খাদের মধ্যে পড়ে ঘাড় মট্‌কে গিয়ে মরার চেয়ে বাঘের মুখে পড়ে মরাটা এমন কিছু অপ্রীতিকর হবে না।

রাইফেলটা কাঁধ বরাবর ঝুলিয়ে নিয়ে আমার ঝিঁঝি-ধরা অসাড় অবশ পা দুটোকে আড় করে গিরগিটির মত গাছের ডালের ওপর দিয়ে টেনে নিলাম। খুব সাবধানে এগিয়ে গাছের গুঁড়িতে খালি পায়ে খুব সন্তর্পণে পা রাখলাম; এ সত্ত্বেও অযত্নে ডালটার দুলুনি কাঁপুনি রদ করতে পারি নি। এই একটু নড়াচড়াতেই খাদের নিচে বাঘ সঙ্গে সঙ্গে আবারও ফুঁসে উঠল, বাজ পড়ার মত হাঁকডাক

আর ক্রোধোন্মত্ত গাঁক গাঁক আওয়াজে অন্ধকারের আচ্ছাদনটাকে সে যেন কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। গাছের শক্ত হিম ডালটা পা আর হাত দিয়ে প্রাণভয়ে চেপে ধরে মরা কেঁচোর মত নিশ্চল টান টান হয়ে পড়ে রইলাম। আমার নিচে খাদের মধ্যে বসে বাঘ সমানে তার অবরুদ্ধ রাগ প্রকাশ করে চলেছিল এবং পুঁচকে প্রাণী মানুষের হঠকারিতা আর অপদার্থতার কথা গলা তুলে উর্ধ্বলোকে রটনা করতে চাইছিল।

ঐ রকম অসম্মানজনক অবস্থায় আমি যে কতক্ষণ সটান লম্বা হয়ে পড়েছিলাম আমার মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে যে, যতবারই আমি এতটুকু সরে যাবার চেষ্টা করেছি বা এতটুকু নড়েছি—বাঘটা সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে এসে পাগলের মত দেয়ালে নখ বসিয়েছে আর হিংস্রভাবে গর্জেছে।

এই সময় ওপরদিকের জঙ্গলে শন্‌শন্‌ শন্‌শন্‌ করে প্রচণ্ড একটা আওযাজ উঠতে শুনলাম—ঠিক যেন সাঁই সাই করে পাশ দিয়ে মেলগাড়ি ছুটে চলেছে। একে রামে রক্ষে নেই সুগ্রীব দোসর—বাঘের হুঙ্কারের ওপর এই আরেক আপদ। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, কিসের শব্দ হতে পারে। বেশিক্ষণ আমাকে বিস্ময়ের ঘোরে থাকতে হল না। প্রচণ্ড এক ঝড়ের দম্‌কা বেগে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার সেই বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেল। দেখতে দেখতে ঝড় পুরোদমে আমার গাছটার গায়ে এসে সজোরে আছ্‌ড়ে পড়ল। যে ডালটা আমি ধরে ছিলাম, সেট. এমন জোরে দুলতে লাগল যে, আরেকটু হলেই ঝাঁকুনি খেয়ে আমার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ নাড়া খেয়ে আমি ছিট্‌কে পাশে পড়ে গেলাম এবং হাতে আর পায়ে ডালটা কোনোরকমে আঁকড়ে ধরে আমার গোটা শরীরটা নিচের দিকে ঝুলে রইল। ঐ অবস্থ.য় শক্ত করে ধরে শরীরটাকে একটু একটু করে কচলাতে কচলাতে মূল গুঁড়িটার দিকে আমি এগিয়ে চললাম। বাঘের গর্জন ততক্ষণে থেমে গেছে—নাকি চাপা পড়ে গেছে? —কিন্তু ঝড়ের শব্দে ক্রমশ কানে তালা ধরে যাচ্ছে। আর ঠিক সেই

সময় চিড়িক্ করে একটা ছোট্ট আওয়াজ হল, আর তারপরই কিছুটা সময় নিয়ে মড়মড় করে একটা আওয়াজ ; যে ডালটায় আমি বসে আছি, সেটা আমার ভারে হেলে পড়ছে।

ডালটা ছিঁড়ে পড়ছে, আমিও সেইসঙ্গে এবার সটান নিচে বাঘের হাঁ-করা মুখের মধ্যে গিয়ে পড়ছি।

গাছের মূল কাণ্ডটার দিকে হুড়মুড় হুড়মুড় করে আমি এগিয়ে গেলাম, ততক্ষণে ক্যাকুড়াটার কাছ থেকে সেই ডাল ছিঁড়ে কুটে আধখানা হয়ে গেছে। দোলায়মান গাছটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চটপট আমি আরেকটু উঁচু ডালে উঠে গেলাম। মাটি থেকে প্রায় বিশ ফুট উঁচুতে গাছের মাঝবরাবর এমন একটা জায়গা পেলাম যেখানে পা ফাঁক করে আরাম করে বসা যায়। গাছটা ছিল বেশ মজবুত শালগাছ, নিচে আদত গুঁড়িটার বেড় দশ ফুটের মত এবং চওড়া ডালের ওপর আমার আসনটা হয়েছে বেশ আরামপ্রদ। পেছনের একটা ডালে আমি দিব্যি ঠেস দিতে পারি আর নিচের একটা ডালে পা রাখতে পারি ; আবার এর ওপর সামনে আছে আরেকটা ডাল, যেটা ধরে থেকে ক্রুদ্ধ ঝড়ের খামখেয়ালীপনায় হাত থেকে নিজেকে আমি সামলাতে পারি। ভোর রাত অবধি একটানা চলল ঝড়ের হুড়মাতুনি।

অবশেষে ভোরের আলো দেখা দিল—একেবারে অবসন্ন, পাণ্ডুর, ভীতসন্ত্রস্ত ভোর। নিঃশেষিত ঝড়ঝঞ্ঝার অবসানে যেন টেনে টেনে দম নিচ্ছে।

হার মেনে ভারগ্রস্ত মন নিয়ে আমি রেস্ট-হাউসে ফিরে গেলাম ; তারপর সারাটা দিনমান পরাজয় আর অপমানের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমোলাম।

পরদিন সন্ধেবেলায় আবার গিয়ে বসলাম ; তারপর সারাটা সপ্তাহ ধরে সমানে চেষ্টা করে গেলাম। কিন্তু বাঘকে আর একবারও আমি আমার বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পেলাম না, আশপাশে থেকে

যদিও সমানে সে গাঁক গাঁক করে তার রাগ আর বিরক্তি প্রকাশ করে যেতে লাগল।

শিকারে বরাত জিনিসটার খুব বড় একটা ভূমিকা থাকে। এটা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, গরুখেকো বাঘটার কপাল অসাধারণ রকমের ভালো ছিল।

কিন্তু একদিন ওরও কপাল পুড়ল। এক শিকারী বেরিয়েছিল খাবার জন্যে কিছু বনমুর্গ মারতে; না জেনেশুনে সে গুলি ছুঁড়েছিল, আর সেই গুলিতেই ওকে পটল তুলতে হল…

ভাগ্যের কী পরিহাস!

## মানুষখেকো

হিমাচল প্রদেশের সিরমুর জেলার দুন উপত্যকার বনজঙ্গলগুলো এখন যে রকম আগে সে রকম খাঁ-খাঁ করত না। আগে ছিল গহন বন, যেমনি বড় তেমনি শ্বাপদসঙ্কুল। একদিকে বনবিভাগের খাঁই আর অন্যদিকে তার চেয়েও বেশি কাঠের ঠিকাদারদের লোভলালসা—এই দুইয়ে মিলে বনগুলোকে তখন আজকের মত এমন উজাড় করে দেয় নি, তখনও জনসংখ্যার চাপ আজকের মত এমনভাবে বনগুলোকে গ্রাস ক'রে ক'রে কায়াটাকে ছায়ায় পরিণত করে নি। আর সবচেয়ে বড় কথা, যে নির্বিবেক শিকারী গোপনে গোপনে খেলাটাকে মহাজনী ব্যবসায় দাঁড় করিয়ে দুহাতে পয়সা লুটছে, তখনও রঙ্গমঞ্চে তাদের প্রবেশ ঘটে নি।

সুন্দর সুন্দর বনজঙ্গল ছিল তখন পশু আর পাখি, সব রকমের শিকারই তখন বনে বনে গিজগিজ করত। বনের বৃক্ষসম্পদেরও তখন খুব নামডাক ছিল। এমন কি বিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই ছিল অবস্থা, আমি তখন সবে বাঘ-হাতি শিকারে যেতে শুরু করেছি; প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে সবে তখন শিকারের অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাগুলি বানানোর কাজ ক্রমবর্ধমানহারে শুরু হয়েছে।

১৮৯১ সালে রোলাণ্ড ওয়ার্ড তাঁর বিখ্যাত 'দি স্পোর্ট্স্ম্যান্স্

হ্যাণ্ডবুক' বইতে এই বনজঙ্গলগুলোকে দুনিয়ার সবচেয়ে বাঞ্ছিত শিকারক্ষেত্রর অন্যতম বলে গণ্য করেছেন। আমি জন্মেছি এবং বড় হয়েছি এ তল্লাটে ; আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিনগুলো, আমার উদ্‌ভ্রান্ত যৌবনের গোড়ার দিনগুলো, এখানেই কেটেছে —পাহাড়ে পাহাড়ে মাঠে জঙ্গলে ঘুরে, কানে নিয়ে কুকুরের ঘেউ ঘেউ সঙ্গীত, আর নাকে নিয়ে পোড়া বারুদের সুঘ্রাণ।

যখন আমি সবে বন্দুক কাঁধে নিতে শুরু করেছি, এসব জঙ্গলের পূর্বগৌরব তখনই অনেকটা ম্লান হয়ে এলেও—এলাকাটাকে তখনও 'শিকারীর স্বর্গ' বলতে পারার মত ছিল অনেক কিছু, অনেক অনেক কিছু। যেমন ধরুন, এসব জঙ্গলে অবশ্য আমি কখনই বুনো হাতি দেখি নি, তবে মাটিতে খুঁড়ে রাখা প্রচুর গর্ত আমার নজরে পড়েছিল, যেসব গর্তে দশ বছর আগেও নাকি হাতি ধরা হত। কিন্তু সেকালে সংখ্যায় এত বেশি বাঘ আর বড় বড় জানোয়ারের আমি দর্শনলাভ করেছি যে, তার আর ইয়ত্তা নেই।

দর্শনীয় শিকারক্ষেত্র হিসেবে রোলাণ্ড ওয়ার্ড একটি জায়গার নাম করেছেন। সে জায়গাটি হল কিয়ারদা দূন, নাহান। এবার যে গল্পটি আমি বলতে যাচ্ছি, তার সঙ্গে এই জায়গাটির একটা যোগসূত্র আছে।

কিয়ারদা দূন। এর কাছাকাছি এই নামের একটা গ্রাম আছে। শিবলিক পর্বতমালার পাদদেশে পূব-পশ্চিমে বিস্তৃত সামান্তরিক ক্ষেত্রাকার এক পাললিক উপত্যকা এই কিয়ারদা দূন। দক্ষিণদিকে দৃষ্টি আড়াল করে রয়েছে শিবলিকের শেষ গিরিশ্রেণীর রোগা লিকলিকে শিখরদেশ, যদিও গাছের মাথা ছাড়িয়ে শিখরগুলো খুব বেশি উঁচু নয়। সেখান থেকে পাহাড়ের ঢালটি আস্তে নেমে এসে উপত্যকার মধ্যে পড়েছে ; দক্ষিণে শিবলিকের শীর্ষদেশ আর উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ—এই দুইয়ের মাঝখানে এই উপত্যকা।

উপত্যকার বেশির ভাগটাই সমতল, তবে দুই পর্বতমালার ক্যাকড়া থাকায় এখানে সেখানে উঁচুনিচু এবং পাহাড়িয়া। পূর্ব

প্রান্তে প্রায় বিশ মাইল দূরে এর বুকের ওপর দিয়ে হঠাৎ অতর্কিতে চলে গেছে যমুনা নদী; তার ওপার বরাবর প্রায় পঞ্চাশ মাইল সোজাসুজি গেলে আবার তাকে দুখানা করেছে বিরাট গঙ্গানদী। উপত্যকাটির উত্তর-পুব কিনার ঘেঁষে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়; গঙ্গার কাছে পৌঁছে এই হিমালয়েরই আবার আরেক চেহারা—মাথা উঁচু করা, দৃপ্ত, মহিমময় তার মূর্তি। হিমালয় আর শিবলিক পর্বতমালা, সেই সঙ্গে এই উপত্যকাও গহন অরণ্যসঙ্কুল; এইসব বনেজঙ্গলে বড় বড় জানোয়ারের বাস। এক সময়ে এখানকার জন্তু-জানোয়ারের প্রাচুর্যের কথা দুনিয়ার শিকারীদের মুখে মুখে ফিরত।

বড় সুন্দর জায়গাটি এই কিয়ারদা দূন। উপত্যকার উত্তর ধার বরাবর যে শ্যামপত্রশোভিত বনভূমি, তার ঠিক মাঝখানে জামবাটির মতন এই জায়গা। এই এলাকার মানুষ মোটামুটি মিলেমিশে শান্তিতে বেশ জমাট জীবন যাপন করত। সেখানে একদিন রাহুর মত দেখা দিল এক মানুষখেকো বাঘ, শ্যামল শান্তির নীড় দুঃখশোকের রোলে ভরে গেল।

প্রত্যেকটি ঝোপ আর গাছের ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে মৃত্যু যখন ঝাঁপিয়ে পড়ার ভয় দেখায়, মাঠ ময়দানে যখন বারবিক্রমে পাড়ি দিয়ে ফেরে গা ছমছম করা আতঙ্ক, তখন আশপাশের মানুষ না পায় দিনে বলভরসা, না পায় রাত্রে শান্তি। কিয়ারদা দূনের ছোট একটা জনপদের বুকে বিশের দশকের মাঝামাঝি বছরগুলোতে এই রকমের এক আপদ দেখা দিয়েছিল। একটা ঘন জঙ্গলের ভাঁজে ভাঁজে অগোছালোভাবে ইতস্তত ছড়ানো ডজনখানেকের মত ছোট গাঁ—সেই গাঁগুলোতে থাকত ছোট একটি সম্প্রদায়ের মানুষ।

ডোরাকাটা সেই আততায়ী এক ডজনেরও বেশি জান্ কোতল করেছে; তার হাতের শেষ বলি তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকা এক থুত্থুরে বুড়ি। আগে আগে এখানে যখন এসেছি, তখন থেকেই বুড়িকে আমি চিনতাম; আমি তাঁকে 'দাদী' বলতাম। ভারতললনা

বলতে যা বোঝায়, দাদী ছিলেন তারই প্রতিমূর্তি; দুঃখে ভেঙে পড়তেন না, মুখ বুজে সব কিছু সয়ে যেতেন। দাদী বিধবা হয়েছিলেন খুব কম বয়সে; স্বামীকে হারিয়ে তিনি সংসারে হয়ে পড়লেন একেবারে নিরুপায় নিঃসম্বল। তার ওপর তাঁর কোলে তখন ছ'মাসের এক ছেলে; তাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করা, সব ভার তাঁর একার ওপর। কুটো ভেঙে দুখানা করে দেবারও তাঁর কেউ নেই।

এই সন্তানকে ঘিরে তাঁর জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ। তাকে মানুষ করে তুলতে সারা যৌবন কী কষ্টটাই না তিনি করেছেন। তাঁর সেই ছেলে বড় হল; ভাবলেন এইবার বোধহয় তাঁর জীবনের আকাশ থেকে দুঃখের কালো মেঘ কেটে যাবে। একদিন গাঁয়ের এক কুমারীর দিকে চেয়ে ছেলেকে খুশিতে ডগমগ হতে দেখে, দাদী সেই মেয়েকে ছেলের বউ করে ঘরে তুললেন। দাদীর নিজের বলতে ছিল ছোট্ট এক টুকরো জমি আর গহনা বলতে ছিল স্বামীর দেওয়া রুপোর একজোড়া বালা, ছেলের বিয়ের জন্যে জমিটা বেচে দিতে হল আর বালাজোড়া বন্ধক দিতে হল

আর তারপরই একটা দিন এল, যখন দাদীর এই সুখের সৌধ খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়ল। তাঁর জোয়ান ছেলে সাপের কামড়ে প্রাণ হারাল; দাদী আবার সেই দুঃখের অতল গহ্বরের কিনারে এসে ঝুলে রইলেন। ছেলের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই দাদীর পুত্রবধূ নতুন একজনকে বিয়ে করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। সংসারে আবার তিনি একা পড়ে গেলেন; হাতে তাঁর থাকার মধ্যে একটি দুধের বাচ্ছা—যাকে মানুষ করতে হবে। নিষ্ঠুর নিয়তি এক আঘাতে তাঁকে বসিয়ে দিয়ে গেল।

গ্রামে যখন আমি প্রথম দাদীকে দেখি, তখন তাঁর নাতি বেশ ডাগর; বছর চোদ্দ পনেরো তার বয়েস। তার নাম রাখা হয়েছিল মঙ্গল। ভারি টরটরে ছেলেটি; ওর সঙ্গে আমার আইরিস কুকুর প্রিন্সের খুব দোস্তি হয়ে গিয়েছিল। মঙ্গল আর প্রিন্সের ছিল হলায়

গলায় ভাব ; যখনই আমি সে আমলে ও-অঞ্চলে যেতাম, খুব মজা হত—আমি গুলি করে জংলা মোরগ মারতাম আর ওরা দুটোতে মিলে ছুটে খোঁজাখুঁজি করে কুড়িয়ে নিয়ে আসত।

প্রিন্সের সুবাদে মঙ্গলের সঙ্গে আমার দোস্তি হয় আর মঙ্গলের সুবাদে আমি হই দাদীর স্নেহের পাত্র। দাদী আমাকে খুবই পছন্দ করতেন ; দাদীর কাছে যখনই যেতাম, আমাকে কিছু না কিছু খেতেই হত—কচি ভুট্টা, সদ্য গাছ থেকে পাড়া শশা, এক টুকরো তাল মছরি, এক গেলাস ঘোল, কিংবা তাঁর কুঁড়েঘরে যখন যা থাকবে।

একদিন পড়ন্ত বেলায় মাঠ পেরিয়ে দাদী গেছেন কাঠকুটো কুড়োতে। সারাদিন এক মোড়লের বাড়িতে দাদী ধান ভেনেছেন। ঢেঁকিতে পাড় দিতে গিয়ে ধানের যে চালগুলো ভেঙে কুটি খুদ হয়ে যায়, তারই খানিকটা দাদী পেয়েছিলেন মজুরি হিসেবে। গাঁয়ের মোড়ল কী একটা কাজে মঙ্গলকে পাঠিয়েছিল কাছের এক গাঁয়ে, যেকোনো সময়ে তার এসে পড়ার কথা। মঙ্গল খেয়ালী ছেলে ; ওকে দেখা যাবে [illegible] –গান গাইতেও খুব ভালবাসে।

সন্ধে ছটা নাগাদ মঙ্গল ফিরে এল, স্বভাবসুলভ গান গাইতে গাইতে, তার ছোট্ট মুঠোয় [illegible] মোড়লের ফরমাশ খেটে পেয়েছে। দাদী বাড়ি [illegible] করেছে ক্ষিধেয় ; তাছাড়া দাদীর [illegible] না। [illegible] মনে তার শান্তি নেই। [illegible] দাদীর কোনো পাত্তা না পেয়ে [illegible] হল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায়, তবু দাদা আসে না। [illegible] হল ; ছোট্ট মঙ্গলের মনে [illegible]।

কুঁড়েঘরের দরজার [illegible] লাগা শ্রান্তক্লান্ত মঙ্গল দাদীর [illegible] বসে আছে। [illegible] না থাকা শূন্য ঘর ; ছিটেবেড়ার দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে থাকতে এক সময়ে করুণাময় নিদ্রার পক্ষপুটে তার দুচোখ বুজে এল।

রাতদুপুরের পর হাতপা ধরে আসায় আর শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগায় মঙ্গলের ঘুম চমকে ভেঙে গেল। ভয়ে-ময়ে মঙ্গল অসহায়ভাবে এমন করুণ সুরে রাত্তিরটাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে কেঁদে উঠল যে, তাই শুনে পাড়াপড়শীর সবাই ছুটে এল।

সে রাত্রে গাঁয়ে কেউই দুচোখের পাতা এক করতে পারে নি, কেননা দাদীর হাওয়া হয়ে যাওয়ার কারণটা মনে মনে সকলেই আঁচ করতে পেরেছিল।

সকালবেলায সারা গাঁয়ে খোঁজ-খোঁজ র ব পড়ে গেল। শেষটায একমাত্র জিনিস যা পাওযা গেল, তা হল দাদীর রক্তমাখা ওড়না আর কাঁটাঝোপের এখানে সেখানে বেঁধা তার কামিজ, সেটাও রক্তমাখা— দাদীর শোকাবহ ভাগ্যবিডম্বনার নীরব সাক্ষী। সবাই এত ভয় পেয়েছিল যে, দাগ দেখে দেখে আর এগোতে ভরসা পায় নি ; আর তাছাড়া সে দলে দাদীর এমন কোনো আপনজন ছিল না, যার কাছে মৃতদেহ উদ্ধার করে সংকার করাটা অবশ্যকর্তব্য বলে মনে হবে। থাকার মধ্যে এক মঙ্গল ছিল, কিন্তু সে তো নেহাত নাবালক।

ব্যর্থতার ভারী বেদনা বুকে নিয়ে আর মনের মধ্যে এক নিদাকণ জুজুর ভয নিয়ে সবাই গ্রামে ফিরে গেল। ভীত সন্ত্রস্ত শেয়ালের গা-ছমছম-করা ডাক তাদের ফোঁপরা জীবনে প্রতিধ্বনি করে ফিরতে লাগল আর অলক্ষুণে পাঁচার ভুতুড়ে ডাক বাড়ির দোরগোড়া অবধি নাছোড়বান্দাভাবে তাদের পিছু লেগে থাকল।

গাঁযের পাকামাথা বিজ্ঞের দল ভাগ্যের দুর্নিরীক্ষ্য গতিপথ সম্পর্কে লম্বা লম্বা ব্যাখ্যান করার পর ব্যাপারটাতে ওখানেই ইতি টানলেন এবং অদৃষ্টের হাতে নিজেদের সঁপে দিলেন। কিন্তু এর কিছুই মঙ্গলের মাথায় ঢুকল না। দাদীর জন্যে কষ্টে তার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে এবং অব্যক্ত ব্যথায় গাঁযের লোকদের জনে জনে সে জিগ্যেস করে বেড়াচ্ছে তার দাদী এখনও ফিরছে না কেন। কেউই তার মুশকিলের আশান করতে পারছে না ; কারো সান্ত্বনাবাক্যে যদি একথা ফুটে ওঠে যে, সত্যিই দাদীকে সে জন্মের মত হারিয়েছে—তাহলেই তার বুকের

মধ্যে যেন গরম লোহার ছ্যাঁকা লাগে। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে গ্রাম ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়ে আমাদের খামারবাড়ির রাস্তায় রওনা হয়। প্রায় দশ মাইল হেঁটে সকালবেলায় মঙ্গল যখন এসে পৌছল, তখন ক্ষিধেয় ক্লান্তিতে আর শোকে তার ভেঙে-পড়া অবস্থা। মঙ্গল কাঁদতে কাঁদতে আমাকে সেই মর্মান্তিক খবরটি দিল। খবরটা শুনে আমি মুষড়ে পড়লাম—আমার মনে হল আমি একজন আপনার জনকে হারিয়েছি।

২

তখন আমার কম বয়েস; যৌবনে সবে পা দিয়েছি। বন্দুক, ঘোড়া আর কুকুর—কেবল এই নিয়েই ছিল আমার জীবন। বাবা ছিলেন দিলদরিয়া মানুষ; নিজে নামকরা শিকারী হওয়া ছাড়াও, বাইরে থেকে যখনই যে শিকারী আসত, তাঁর বাড়িতে ছিল অবারিত দ্বার; বছরে বারো মাসই আমাদের বাড়িতে লেগে থাকত অতিথির ভিড়। কিয়ারদা দূনে যখন সেই শোকাবহ ঘটনাটি ঘটে, আমি তখন বাড়িতে একা—বাবা তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে গিয়েছিলেন শিকারের সফরে। বাবার এক বন্ধুর আসতে দেরি হওয়ায় তাঁর অপেক্ষায় আমাকে থেকে যেতে হয়েছিল; কথা ছিল, তিনি এলে তাঁকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

মঙ্গল যেদিন তার দিদিমার মৃত্যুসংবাদ নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে ভেঙে পড়ল, বাবার বন্ধু মাঝবয়সী শিখ ভদ্রলোক এসে পৌছেছেন তার ঠিক আগের দিন। ঠিক করলাম, বাবার শিকারের দলে না গিয়ে যেখানে এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে, সেখানে আমরা যাব।

শিখ ভদ্রলোকটি সম্পর্কে বেশি কিছু আমার জানা ছিল না। 'মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার' গোছের ভাব নিয়ে তিনি শুধু সারাক্ষণ গায়ে কাঁটা দেওয়া সব গল্প বলে যেতেন। কত সব মারাত্মক মারাত্মক জানোয়ার নাকি তিনি শিকার করেছেন।

আচ্ছা, কেউ কখনও 'হান্টাইটাস্' বলে কোনো রোগের নাম শুনেছে কি? উঁহু, উঁহু—ডাক্তারী কোনো অভিধান হাতড়াবার দরকার নেই; রোগের তালিকায় সেখানে ও-নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। মনুষ্যজাতির জন্মাবধি যদিও এটি একটি পুরনো সর্বজনীন ব্যাধি, তাহলেও কোনো শল্যচিকিৎসই একে চিকিৎসাগারের কামরায় টেনে আনতে পারেন নি বা কোনো আভিধানিকই একে তাঁর শব্দ-কোষগ্রন্থে ঠাঁই করে দিতে পারেন নি। 'হান্টিং বাগ' বলে এক রোগজীবাণু দংশালে এই দুষ্টব্যাধি দেখা দেয়। যাকে এ রোগ আক্রমণ করে, কিছুতেই সে চার দেয়ালের মধ্যে থাকতে পারে না—কেবলি সে খোলা জায়গায় বেরিয়ে পড়ে। ইট-কাঠের বন্ধ জগতের চেয়ে বনে-জঙ্গলে সে ঢের বেশি আরামে নিশ্বাস নেয়।

শিকারে আমার এই ভাগীদারটিকেও, বুঝলেন, এই 'হান্টাইটাস্' রোগে ধরেছিল। কিন্তু ভদ্রলোকের স্বভাবটি ছিল অমায়িক; তাঁকে আমার ভারি ভালো লেগেছিল। সে বয়সে অতশত আমি বুঝতে শিখি নি; ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি পুলকিত হতাম—তিনি যা বলতেন আমি হাঁ করে থেকে গিলতাম। আমি যত বেশি শোনবার আগ্রহ দেখাতাম, ভদ্রলোক ততই এক কাহিনকে আরও সাত কাহন করে বলতেন। তখন পাঞ্জাবী ভাষা আমি বুঝতাম না। আর ভদ্রলোক সমানে পাঞ্জাবী ভাষাতেই কথা বলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাতেই বোধহয় তাঁর গল্পগুলো আমার কাছে আরও বেশি রোমহর্ষক বলে মনে হত, কেননা না-বোঝা অংশের ফাঁকগুলো আমি নিজের কপোলকল্পনা দিয়ে পূরণ করে নিয়েছিলাম।

তাঁকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে আমি খুবই ডগমগ হয়েছিলাম এবং তিনি সঙ্গে থাকায় মানুষখেকো বাঘকে ঢিট করার ব্যাপারে খুবই আশ্বস্ত বোধ করেছিলাম।

সে আমলে হয় পায়ে হেঁটে, নয় ঘোড়ায় চড়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হত; ও এলাকায় তখন রাস্তাঘাট বলতে কিছু ছিল না। জীপ কেউ চোখেই দেখে নি। ভদ্রলোককে আমার

ঘোড়ায় চড়তে দিয়ে, আমায় এক ভৃত্য এবং মঙ্গল বেচারাকে নিয়ে আমি তাঁর পাশে পাশে হেঁটে চললাম। কিয়ারদা দূনে যাওয়ার সময় সারা রাস্তা তিনি তাঁর গল্প শোনাতে শোনাতে গেলেন; তার ফলে, রাস্তার ক্লেশ আমার একটুও বোধ হল না।

বেলা দুটো নাগাদ আমরা সেই বাঘে-হানা-দেওয়া গ্রামে পৌঁছুলাম। দক্ষিণ দিকে ছাড়া গ্রামের আর সবদিকেই ঘাসের জঙ্গল আর ফসলের ক্ষেত; একমাত্র দক্ষিণ দিকেই জঙ্গলের একটা প্রান্ত গ্রামের দুশো গজের ভেতর এসে গেছে। গ্রাম আর জঙ্গলের মাঝামাঝি জায়গাটাতে দু-কামরার একটা পাকা বাড়ি; আগে সেটা ছিল বনবিভাগের চেকপোস্ট। পরিত্যক্ত সেই বাড়িটি আমি থাকবার জন্যে বেছে নিলাম। জঙ্গলের ধার বরাবর সামান্য একটু ঢালু হয়ে গেছে, তার ফলে দক্ষিণের দিকে খানিকটা দূর অবধি গাছপালার জায়গাটা গ্রামের তুলনায় খানিকটা নিচু হয়ে আছে।

পুবদিকে আধ মাইলটাক দূরে খুব ঘন জঙ্গল; চাষের ক্ষেতের কাছাকাছি জায়গায় দাদীকে মেরে বাঘ তার লাশটা টেনে নিয়ে গেছে সেই ঘন জঙ্গলে।

দাদীর হাড়গোড় খুঁজে বার করবার জন্যে তৎক্ষণাৎ আমি রওনা হতে চেয়েছিলাম। তাই আমি গ্রামে চলে গেলাম পথ দেখিয়ে দেবার লোকের সন্ধানে। দেখলাম কেউই আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত নয়; আমার কেমন যেন মনে হল, মানুষখেকো বাঘের সঙ্গে পাঞ্জা লড়বার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে আমার গ্রামে আসাটাকে কেউ ভালো মনে নিতে পারছে না। আমার প্রতি তাঁদের মনোভাবের মধ্যে কেন যে এমন একটা চাপা রাগের ভাব ফুটে উঠেছে, মরে গেলেও কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছিল না। নানা-না-না-না করে আমাকে ওরা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, এক সময় আমি নাছোড়বান্দা হয়ে ওদের চেপে ধরলাম। গোড়ায় তো কিছুতেই মুখ খুলবে না; অনেক সাধ্য-সাধনার ফলে, শেষকালে আমাকে ওরা ব্যগ্রতা করে বলল আমি যেন আমার মতলব ত্যাগ করি এবং নরখাদক বাঘ

শিকারে জড়িত করে ওদের যেন প্রাণসংশয় না করি। ওরা আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করল, এই নরখাদকটি হেঁজিপেঁজি জীব নয়। ও হল এক গুণীনের প্রেতাত্মা ; সেই গুণীনই ওই বাঘের কলেবর ধারণ করে আছে। ওকে মারবার কারো সাধ্যি নেই। যে ওর প্রাণনাশের চেষ্টা করবে কিংবা ওকে মারবার নিষ্ফল চেষ্টায় নিজেকে জড়াবে, তার আর নিষ্কৃতি নেই ; তার ধ্বংস অনিবার্য।

যে জায়গাটাতে দাদীর ওড়না আর ছেঁড়া কামিজের টুকরো পাওয়া গেছে, গ্রামের একেবারে ধার থেকে সেই জায়গাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যে ওদের একজনকে অনেক কষ্টে আমি রাজী করালাম।

লোকটার বুকের পাটা আছে। ওর নাম পুন্নু। মেথরদের ছেলে। বস্তাপচা কুসংস্কারে বিশ্বাস করে করে ওর চিন্তাশক্তি বাড়তে পারে নি, তার ওপর চারদিক থেকে ওকে দমানোর চেষ্টা হয়েছে—তা সত্বেও যে জায়গায় সেই গুণীনের অবিনাশী আত্মা দাদীর প্রাণ সংহার করেছে, সে জায়গাটা দেখিয়ে দেবার জন্যে আমার সঙ্গে সে চলে এসেছে। আমার শিখ বন্ধুটিও আমার সঙ্গে এসেছেন এবং খানিক পরে আমাদের দলে গ্রামের আরও একজন জুটে গেল—সে পুন্নুর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

গ্রামের উপকণ্ঠে এসে আমরা থামলাম। প্রায় এক ফার্লং দূরে পুন্নু আঙুল দিয়ে সেই জাগয়াটা দেখিয়ে দিল, যেখানে বাঘ জঙ্গলের কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে দাদীকে টানতে টানতে নিয়ে গেছে।

পুন্নু আর তার বন্ধুকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি সর্দারজীকে নিয়ে সনাক্ত করা জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমরা পঞ্চাশ গজ গিয়েছি কি যাই নি, এমন সময় মে মাসের বৈকালিক ঈষদুষ্ণ হাওয়ায় ভেসে এল এক ভয় পাওয়া শেয়ালের আতঙ্কিত 'ফে-উ ফে-উ' ডাক ; আর সেই বিভীষিকাগ্রস্ত এলাকার সমস্ত আকাশ-বাতাস যেন জঙ্গলের গুরুভার নৈঃশব্দ্যের মধ্যে অশুভ পূর্বলক্ষণের সূচনা করে আর্তনাদ করে উঠল।

আমি নিজের অজান্তে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখবার চেষ্টা করছিলাম, ঠিক কোন্ জায়গাটা থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে আসছে—কেননা আমি বুঝেছিলাম এ ডাকের অর্থ হল, খুব কাছাকাছি ভয়ঙ্কর কিছু সে দেখেছে এবং দেখার ফলে সে ভয় পাচ্ছে।

আমি তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঁচ করবার চেষ্টা করছি কোন্ জায়গা এবং কোন্‌দিক থেকে শেয়ালটা ডাকছে; পুন্নু আর তার বন্ধু ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে ধরল। ওরা আমাকে অনেক কাকুতি মিনতি করে বলল আমি যেন মানুষখেকোর পিছু নেওয়ার সিদ্ধান্ত পরিহার করি। দাদীর হাড়গোড়গুলো আমি যে খুঁজে পেতে নিয়ে আসব, তাও তারা আমাকে যেতে দেবে না।

আমাকে ওরা মনে করিয়ে দিয়ে বলল—শুনছ না, শেয়াল কাঁদছে? কাজেই লক্ষণ একেবারেই ভালো নয়; এই অশুভ লক্ষণ দেখে আমার ফিরে যাওয়া উচিত। তারপর ধরা গলায় ওরা আমাকে জানাল, দাদী যেদিন কাঠ কুড়োতে বেরিয়েছিল সেদিনও এমনিভাবে শেয়ালের কান্না শোনা গিয়েছিল। দাদী সেই বারণ গ্রাহ্য করে নি; ফলে, তাকে আর ঘরে ফিরতে হল না।

সর্দারজী ওদের যুক্তিতে রীতিমত কাত হলেন। উনি চাইলেন, এরপর আর একপাও আমি যেন অগ্রসর না হই। আমি ওঁকে বললাম, শেয়ালের আর্ত স্বর থেকে শুধু এইটুকুই বুঝতে হবে যে সে ভয় পেয়েছে; তাতে সুলক্ষণ বা কুলক্ষণ বলে কিছু নেই। এমন হতে পারে যে, শেয়াল যেখান থেকে ডাকছে তার আশেপাশে মানুষ-খেকো বাঘ আছে; অথবা এও হতে পারে যে, ধারে-কাছেই সে কোনো চিতাবাঘ দেখেছে।

সর্দারজীর কাছে আমার কোনো যুক্তিই খাটল না। উনি পই-পই করে বলতে লাগলেন গ্রামে ফিরে যাবার জন্যে। আমি ফিরে যেতে অস্বীকার করায়, উনিও বলে দিলেন আমার সঙ্গে আর এক-পাও উনি এগোবেন না। আমাকে মুখের ওপর গোঁয়ার-গর্দভ ব্লাডি-ফুল্ বলে দিয়ে, বুকের রক্ত হিম করা, গায়ের লোম খাড়া করা

একোত্তরশত গল্পের মহা-পালোয়ান এবং এক চুলের জন্যে বেঁচে-যাওয়া নায়ক সর্দারজী গ্রামের পথে পাড়ি দিলেন।

সর্দার চললেন এক রাস্তায়, আমি চললাম তার উল্টো রাস্তায়; গাঁয়ের সরল-হৃদয় ছোকরা দুটো ভয়-সঙ্কটের মধ্যে দোটানায় পড়ে দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় যেখানে ছিল সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তাদের দিকে পিছন ফিরে বললাম বাড়ি চলে যেতে এবং কথা দিলাম যথাশীঘ্র খবর নিয়ে যাব।

জঙ্গলের দিকে পুরো দশ গজও এগিয়েছি কিনা সন্দেহ, ছেলে-দুটো আবার ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে ধরে ফেলল। বলল ওরাও আমার সঙ্গে যাবে। ওদের এই মহানুভবতায় আমি স্তম্ভিত হলাম এবং ওদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মাথা নুয়ে এল।

আরও শতখানেক গজ যাবার পর আমরা জঙ্গলের বাইরের দিকটায় এসে পৌঁছলাম, ওরা আমাকে জমাটবাঁধা এবং রং বদলে যাওয়া রক্তের চিহ্নগুলো দেখাল। নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসার আর মুখ বুঁজে মানুষকে প্রাণ দিয়ে মালিককে সেবা করার অধিকার ছাড়া জীবনের কাছে যে আর কিছুই চায় নি, এ সেই বড়াইবুড়ির রক্ত।

আমি কিছুক্ষণ মাটির ওপর বসে থাকলাম। তারপর গ্রামের ছোকরা দুটিকে বাড়ি চলে যেতে বললাম। দিনের এমন একটা সময়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়াটা আমাদের তিনজনের পক্ষে যে নিরাপদ হবে না, এটা আমি ওদের বুঝিয়ে বললাম। তাছাড়া ওদের উপস্থিতিতে, বেশির ভাগ সময় ওদের নিরাপত্তার কথাটাই আমার মন জুড়ে থাকবে বলে, প্রধান কাজটা থেকে আমার দৃষ্টি সরে যাবে। এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না যে, ভয় পেয়ে শেয়ালটার চেঁচিয়ে ওঠার মূলে ছিল মানুষখেকো সেই বাঘ এবং বাঘটি কাছেপিঠেই কোথাও আছে। আমি ঝাড়া-হাতপা হয়ে বাঘটির পিছু নিতে চাই—আর কারো দায়িত্ব নিতে গিয়ে আমি আমার মন বিক্ষিপ্ত করতে চাই না। তাছাড়া, হয়ত আমি রাত্তিরে জঙ্গলে থেকেও যেতে

পারি। সেক্ষেত্রে যথারীতি মাচার ব্যবস্থা না থাকলে, এক জায়গায় তিন জনে একসঙ্গে বসবার মতন নিরাপদ জায়গা পাওয়া সম্ভব হবে না। আমি হয়ত একা কোনো গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে যেতে পারি, কিন্তু একত্রে তিন জনের স্থান সংকুলান করা খুবই কঠিন হবে।

ছেলে দুটি বুঝল। বুঝে গ্রামে ফিরে গেল। বেলা পাঁচটা বাজে; তখনও বেশ কটকটে ঝাঁঝালো রোদ। পাহাড়ের মাথায় তির্যক হয়ে পড়েছে রশ্মিরেখা। এসব জঙ্গল আমার অচেনা নয়; আগেও অনেকবার এসেছি হরিণ আর শুয়োর এবং অন্যান্য জীবজন্তু শিকার করতে, এসব জঙ্গলের ঘাঁৎ-ঘোঁৎ সমস্তই আমার জানা। ঘোর অমাবস্যার রাত্রেও আমাকে যদি এই জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়, ঝোপঝাড় বনবেতসের মধ্যে হারিয়ে না গিয়ে আমি নির্বিকারভাবে ঠিক রাস্তা চিনে হেঁটে যেতে পারব।

যদি ভয়ের কথা ওঠে তাহলে বলতে হয় যে, বনজঙ্গল বা বন্য প্রাণী অথবা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার—এর কোনোটাতেই আমার তেমন ভয়-ডর নেই। আমার পিতৃদেবের কল্যাণে, ছেলেবেলাতেই আমি অনেক কষ্টে এই ভয় জয় করতে শিখেছিলাম। বাবা ছিলেন কড়া রাজপুত; ছেলেপুলে মানুষ করার ব্যাপারে তাঁর অদ্ভুত সব নিজস্ব ধারণা ছিল; সেই তত্ত্বগুলো আমার ওপর এবং পরে আমার দুই ভ্রাতার ওপর তিনি হাতেকলমে প্রয়োগ করেছিলেন। যখন আমার বয়স বড়জোর ছয় কি সাত, মাঝরাত্রে বাবা আমাকে ডেকে তুলে, গোড়ায় গোড়ায় টাট্টুঘোড়ায় চাপিয়ে. চাকর সঙ্গে দিয়ে এবং পরে একা একা পায়ে হাঁটিয়ে, পাঠিয়ে দিতেন ছোট্ট একটা জঙ্গল পেরিয়ে প্রায় এক ক্রোশ দূরে শ্মশানে অথবা কবরখানায়। আমার দশ বারো বছর বয়স অবধি এবং নিজের মনের ভয় জয় না করা অবধি বাবা এই 'ভয় তাড়ানোর অভিযান' চালিয়ে যান।

বাবার কাছ থেকে এই ধরনের তালিম পেয়েছি বলেই ভয় আমাকে সহজে কাবু করতে পারে না এবং আমি অনর্থক বিচলিত না

হয়ে বা ঘাবড়ে না গিয়ে যে-কোনো অবস্থায় ভেতর বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারি। বনজঙ্গলকে দুঃসাহসিক অভিযান আর আনন্দের ক্ষেত্র হিসেবে এবং বন্য প্রাণিকুলকে সৌন্দর্য আর বিস্ময়ের নির্ঝর হিসেবে আমার বাবাই আমাকে প্রথম দেখতে শিখিয়েছিলেন। বন দেখে কখনই আমার ভয় হয় নি এবং বনের প্রাণীরা কখনই আমার মনে ত্রাসের সঞ্চার করে নি। বনেজঙ্গলে পা দিলেই আমার মনে প্রশান্তির একটা ভাব নেমে আসে, যখন আমি দাদীর প্রাণহন্তারকের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলেছি এবং গাঁয়ের ছেলেদের বাড়ি চলে যেতে বলে নিজে একা থাকতে চেয়েছি, এমন কি তখন এবং তার পরেও আমার মনে এই সৌম্যভাব সমানে বিরাজ করছিল।

৩

পুনু আর তার বন্ধু চলে যেতে আমার একটু একা একা লাগছিল বৈকি, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার ঝাড়াহাতপা হয়ে নিজেকে হালকা বোধ করলাম। বিপদে পড়লে নিজে বুক ঠুকে দাঁড়ানো যায় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো উপায়ে প্রাণ নিয়ে পালানো যায়। আর যদি তেমন চরম কিছু ঘটেও—তার জন্যে যত চড়া মূল্যই দিতে হোক, তাতে সান্ত্বনা এই যে, সে তো নিজেরই সাধা জিনিস। কিন্তু কোনো কাজ হাতে নিয়ে যদি তার ওপর আবার অন্য পাঁচজনকে বিপদ থেকে সামলে চলাব দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হয়, তাহলে সে এক বিশ্রী ছরকট অবস্থা দাঁড়ায়—কিছু একটা করতে গেলেই ভয় ভয় করে আর নিজের হাতপা বাঁধা বলে মনে হয়। নিজের জীবন নিয়ে খেলা করা যায়, তাতে বিবেক-দংশনের কোনো বালাই থাকে না; কিন্তু অন্য কাউকে বিপদের মধ্যে টেনে এনে তার জীবন নিয়ে খেলা করার কারো অধিকার নেই।

আমি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ওদের চলে যাওয়ার দিকে নজর রাখলাম। যখন দেখলাম ওরা ঘাসের রাস্তা পেরিয়ে চাষের ক্ষেতে গিয়ে পড়েছে, তখন আমি উঠে পড়লাম। আমার কাছে ডবল

ব্যারেলের শট-অ্যাণ্ড-বল ১২-বোর-প্যারাডক্স ম্যাগনাম। বন্দুকটা আরেকবার আমি দেখে নিলাম সব ঠিকঠাক আছে কিনা। দুটো ব্যারেলেই বর্তুলাকার গুলি ভর্তি আছে।

গাছপালার ঘন আবরণের মধ্যে বড় বড় জানোয়ার শিকারে প্যারাডক্স বন্দুক খুবই কাজের ছিল। এই বন্দুককে 'এক্সপ্লোরা গান'ও বলা হত। বন্দুকটির আবিষ্কর্তা একজন ইংরেজ—কর্নেল ফস্‌বেরি, ভি. সি। এই ধরনের বন্দুকে নলের রোধক অংশটি—অর্থাৎ, শেষের দিকে ইঞ্চি তিনেক—শঙ্খলতার আকারে গভীরভাবে খাঁজ-কাটা গর্তের বাকি অংশটি মসৃণ। বুলেটটি খুব ভারী মোচা আকারের ; নলের ভেতর পাক খেয়ে ছুটে বেরোয়। এর ফলে গুলিটা সটান ছুটে গিয়ে নিখুঁতভাবে লক্ষ্যবেধ করে। সাধারণ ব্যবহারে ছট্‌রাও এতে ছোঁড়া যেত এবং তাতে মোটের ওপর ভালো ফলই পাওয়া যেত।

রোধকযুক্ত বোরওয়ালা বন্দুকে বর্তুলাকার গুলি ব্যবহারের যে বাধা ছিল, এই আবিষ্কারের ফলে সে বাধা দূর হয়ে গেল। আগে নলে যদি এতটুকুও রোধকতা থাকত, তাহলে গোলাকার গুলি ভরলে নল হয় ফুলে উঠত, নয় ফেটে যেত। আর যদি রোধকের ভেতর দিয়ে গলে যাবার মত যথেষ্ট ছোট ব্যাসযুক্ত গুলি ভরা হত, তাহলে হাওয়া বেরিয়ে যাওয়ার ঝামেলা দেখা দিত। অর্থাৎ, গুলিটা নল দিয়ে ঠেলে বেরোতে বেরোতে গুলির চারপাশ দিয়ে গ্যাস নিষ্ক্রান্ত হওয়ার ফলে গুলির বেগ কমে যেত এবং লক্ষ্যও ঠিক অব্যর্থ হতে পারত না।

বড় বড় জানোয়ার-শিকারীদের এই মুশকিলের আশান হয়েছিল প্যারাডক্স বা এক্সপ্লোরা বন্দুক আবিষ্কার হওয়ার ফলে। সে সময় এই বন্দুকের খুব চাহিদা হয়েছিল। তার পরের ধাপে এল উচ্চবেগ-সম্পন্ন রাইফেল ; ছোট ছোট ছড় আকারের নাইট্রোগ্লিসারিন দ্বিগুণ-ভিত্তিক বারুদ অথবা পাতা বা দানা জাতীয় একক-ভিত্তিক নাইট্রোসেলুলোজ—এইসব ধরনের নির্ধূম বারুদ প্রবর্তনের ফলে এটা সম্ভব হয়।

গাছপালার জঙ্গলে ঢুকে আমি একটি গিরিখাতের দিকে হেঁটে গেলাম ; জায়গাটা প্রায় এক ফার্লং তফাতে জঙ্গলের একেবারে মধ্যে। শেয়ালটা সেখানে ভয়ে ডাক ছাড়ছিল। গিরিখাতটি আমার বিলক্ষণ পরিচিত। মাত্র মাসকয়েক আগে সেখানে আমার এক জবর অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছিল এ-গ্রামের মোড়ল। আমাকে সে বলেছিল, বুনো জন্তুজানোয়াররা গ্রামের ক্ষেতগুলো এমনভাবে উচ্ছন্নে দিচ্ছে যে, এর যদি বিহিত করা না যায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে অনাহারে সারা গ্রাম শুকিয়ে মরবে।

ক্ষেতের চারপাশে কাঁটাগাছের বেড়া দিয়েও বুনো জন্তু-জানোয়ারদের ঠেকানো যায় নি। রাতের অন্ধকারে লাফ দিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে তারা সমস্ত ফসল মুড়িয়ে খেয়ে যায়। কাঁটাঝোপের বেড়ার কাছে এক কোণে একটা গাছের ডালে আমি আরাম করে বসবার ব্যবস্থা করে নিলাম। বেড়ার ওপারে যতদূর দৃষ্টি যায় একটানা শুধু জঙ্গল—কোথাও কোনো ফাঁকা জায়গা নেই। শিবলিক পাহাড়ের মাথার ওপর ঝোপেঝাড়ে থাকে বাঘ আর চিতা, শম্বর আর চিতল, বনশুয়োর আর কাকর সামনের জমিটা আস্তে আস্তে সটান সেই ওপরে উঠে গেছে।

হরিণের পাল সেখানে থাকে, তাদের একমাত্র চেষ্টা কি করে নির্ঝঞ্ঝাটে নিরাপদে থাকা যায়। বাঘ আর চিতার দল সেখানে থাকে হরিণ শিকারের ধান্ধায় শাকপাতাভোজী আর মাংসাশী, সেখানকার এই দু দলই আবার একযোগে গরিব চাষাভূষোর পেট কেটে নিচ্ছিল। শাকপাতাভোজীর দল খেয়ে নিচ্ছিল তাদের জমির ফসল আর মাংসাশী জানোয়াররা খেয়ে নিচ্ছিল তাদের হাঁসমুরগি গরুছাগল। খুবই নিষ্ঠুর কাজ, কিন্তু এ কাজ তাদের করতে হচ্ছিল সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় এবং বেঁচে থাকার দায়ে পড়া বাধ্যবাধকতায়।

সেই একই প্রয়োজনে গ্রামবাসীদেরও আমাকে ডেকে নিয়ে

যেতে হয়েছিল। বুনো জানোয়ারেরা সদলবলে ফসলের ক্ষেতে নামে রাত্তিরবেলায়; আমি অনেক রাত্তির অবধি গাছের ওপর থেকে বেশ কিছু হরিণ আর শুয়োর মেরে মেরে চাষীদের মুশকিলের কিছুটা আশান করেছিলাম।

তখন বেজায় শীতের দিন। এত ঠাণ্ডা পড়েছিল যে, সকালে উঠে দেখা যেত চারিদিক বরফের সাদা চাদরে ঢেকে গেছে। একদিন রাত্তিরে রোজকার মতন গাছের ওপর উঠে বসে আছি; রাত বারো'টা নাগাদ অন্য দিনের চেয়েও এত প্রচণ্ড রকমের শীত পড়তে আরম্ভ করল যে, আমি ঠিক করলাম সেদিন আর সারা রাত গাছে বসে না থেকে গ্রামে চলে যাব। দুটো হরিণের গায়ে তারই মধ্যে গুলি বিঁধিয়েছিলাম, দুটোর মধ্যে একটি হরিণ চোট লাগা অবস্থায় পালিয়ে গিয়েছিল।

কাঁটাঝোপের বেড়ার পুব ধারে একটা ছোট ডোবা; সেই ডোবাটা বেড দিয়ে ঘুরে আমাকে [illegible] হবে। ডোবার ধারে এসে জ্যোৎস্নার আলোয় দেখছি দুটো জানোয়ার জল খেয়ে চলে যাচ্ছে। হরিণও নয়, শুয়োরও নয়; চলার ভঙ্গি আর দেহের আকার দেখে মনে হল বোধহয় একজোড়া হায়েনা। [illegible] ভাবলাম, মাঠে যে মরা হরিণটাকে রেখে এসেছি ওরা নিশ্চয়ই তাহলে টের পেয়ে সেটাকে সাঁটাবে। যাতে ওরা হরিণটাকে [illegible] করতে না পারে, তার জন্যে আমি ওদের [illegible] সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার কাছে ছিল ১১ বোরের দোনলা [illegible] বন্দুক, ডানদিকের নলে একটা সঙ্কোচনশীল বুলেট [illegible] আর বাঁদিকের নলে একটা বাকশট কার্তুজ ভরে নিলাম।

সোজা তাক করে দুটোর মধ্যে বড়টার গায়ে ডানদিকের নলটা থেকে গুলি ছুড়লাম। দুটো আওয়াজেই ছুটে পালাল; আমি ধরেই নিলাম গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। আমার বোধহয় পাল্লা ছাড়িয়ে একটু বেশি দূরে গুলি ছোঁড়া হয়ে গিয়েছিল, কিংবা হাত অসাড় হয়ে যাওয়ায় বন্দুকটা আমি বোধহয় শক্ত করে ধরতে পারি

নি। যে কারণেই হোক, আমার গুলি ছোঁড়া যে ঠিকমত হয় নি এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। সরেজমিন তদন্তের মধ্যে আর না গিয়ে আমি সিধে গাঁয়ে চলে গিয়ে ঘরের মধ্যে গরম বিছানায় সটান শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে গাঁয়ের একদল ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সেই জায়গাটাতে এলাম, যেখানে আগের দিন রাত্রে একটা হরিণকে আমি মেরে রেখে এসেছিলাম। মরা হরিণটাকে তুলে নিয়ে গ্রামে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর অন্য হরিণটাকে খোঁজ করতে লাগলাম। খানিকক্ষণের মধ্যেই রক্তের দাগ দেখতে পেলাম। দাগ দেখে দেখে এগোবার জন্যে সঙ্গে দুটি ছেলে নিলাম। আমার সঙ্গে যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে একটি ছেলের নাম ছিল জেন্দু; ছেলেটি বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা এবং খুব ক্যাট্‌কেঁটে রকমের সাজপোশাক পরত। রক্তের দাগ দেখে দেখে জেন্দুই সবার আগে চলছিল; যেখানে হরিণটাকে গুলি করা হয়েছিল, সেখান থেকে আমরা এক মাইলেরও বেশি দূরে চলে এলাম। আহত হরিণটা দু দুবার আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে পালিয়ে গেল। দুপুরের পর বেশ বেলা অবধি আমরা তার দাগ দেখে দেখে চললাম; একটিবারও সে আমাকে এমন কাছে আসতেই দিল না, যেখান থেকে তাকে আমি বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পাই। গোড়ার দিকে প্রচুর রক্ত পড়েছিল, কিন্তু ক্রমশ রক্তের ধারা ক্ষীণ হয়ে এল এবং শেষটায় রক্তের দাগ একেবারেই দেখতে না পেয়ে পুরোপুরিভাবেই আমরা তার পাত্তা হারিয়ে ফেললাম।

কোনো জানোয়ারের গা থেকে মাটিতে যদি গোড়ার দিকে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত হয়, এবং পরে যদি সেটা ছিটেফোঁটা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে নির্ভাবনায় ধরে নিতে পারেন যে, তার আঘাত তেমন গুরুতর নয়। হরিণটির চোট লেগেছে খুবই ওপর-ওপর, খুব সম্ভবত কাঁধের হাড়ে; আর যতদূর মনে হয়, হায়েনা বা কোনো হিংস্র জন্তু ওকে মেরে না ফেললে এ আঘাত সে সাম্‌লে উঠবে। যদি মাঝারি পরিমাণের রক্ত সমানে চুইয়ে পড়তে থাকে, তার রং

যদি ফিকে হয় এবং যদি তা ঘন হয়ে চাপ বেঁধে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে গুলিটা নাড়িভুঁড়িতে গিয়ে বিঁধেছে। সে ক্ষেত্রে আহত জানোয়ারটি অনেকটা সময় নিয়ে দগ্ধে দগ্ধে মরবে। তবে তেমন সম্ভাবনা খুব বিরল হলেও, জানোয়ারটি হয়ত বেঁচেও যেতে পারে। একটি ঘটনার কথা আমি জানি; একটা বাঘকে গুলি করে মারার পর দেখি ওর অন্ত্র ফুঁড়ে আগেকার একটা বুলেট পেটের ভেতর দিয়ে চলে গিয়ে ওপাশের চামড়ার তলায় আটকে আছে। অন্ত্রটি ফের জুড়ে গেছে এবং কাটা ঘা সম্পূর্ণভাবে সেরে গেছে।

রক্ত যদি ছোপ-ধরা ফেনা-ফেনা ধরনের হয় এবং তার রং যদি টকটকে লাল হয়, তাহলে বুঝতে হবে জানোয়ারটির বুকের ছাতিতে অথবা পাশে চোট লেগেছে অথবা তার ফুস্‌ফুস্‌ ফুটো হয়ে গেছে। কোনো জানোয়ার এভাবে জখম হলে দীর্ঘদিন আর কর্মক্ষম থাকতে পারে না এবং অদূরভবিষ্যতে নাড়ীর স্পন্দন বন্ধ হয়ে সে মারা যাবে।

টাটকা রক্তের রং দেখে বলা যায় মোটের ওপর কোন্‌ জায়গায় আঘাত লেগেছে। ফুস্‌ফুসের এলাকার যত কাছে চোট লাগবে, মাটিতে রক্তের দাগ তত বেশি লাল হবে এবং তার মৃত্যুও তত কাছে ঘনিয়ে আসবে। কাল্‌চে রক্ত হল পেছনের পায়ে আঘাত লাগার চিহ্ন। যেখানে জানোয়ারটিকে গুলি করা হয়েছে, সেখানে যদি জমির দুপাশেই রক্তের দাগ থাকে তাহলে বুঝতে হবে গুলিটা শরীরের এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে বেরিয়ে গেছে; দাগ যদি শুধু একপাশে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে জানোয়ারটির টগবগ করা শরীরের মধ্যেই কোথাও ঘা ঘেঁষে থেকে গেছে।

আমরা কোথাও সেই আহত হরিণটির টিক দেখতে পেলাম না। ওকে খুঁজে বেড়াবার আর আমাদের উৎসাহ হচ্ছিল না। ওর রক্তের দাগ দেখে বোঝা গিয়েছিল, খুব শিগগির ওর মরবার সম্ভাবনা নেই এবং এর পরও ওকে ধরবার যতই চেষ্টা করা যাক, এতাবৎকালের মতই তা নিষ্ফল হবে।

আহত হরিণটার জন্যে আমার কষ্ট হল এবং আমার ইজ্জত ঢিলে

হওয়ায় মনে মনে ক্ষুণ্ণও হলাম। গ্রামের অজ্ঞ লোকদের কাছে, বলতে গেলে আমি বিনা অধিকারেই, অব্যর্থসন্ধানী শুধু নয়, এক-গুলির-শর্মা বলে নাম কিনেছিলাম। একটি হরিণ খোয়ানো মানে এক্ষেত্রে আমার মাথা কাটা যাওয়া এবং আরও আমার অভিমানে ঘা লাগার দরুন সারা দিনের কিধে আর ক্লান্তির জ্বালা দুঃসহ হয়ে উঠল।

আগের রাত্রে যা যা ঘটেছিল তার পুরো ছবিটা মনে মনে আমি ভেবে নিলাম এবং যে অবস্থায় আমি হরিণের গায়ে গুলি ছুঁড়েছিলাম সেই অবস্থাটা ছকে নিলাম। আমি সমস্তই ঠিক ঠিক করেছি বলে মনে হল: হরিণটা বন্দুকের পাল্লার যথেষ্ট ভেতরে ছিল—অর্থাৎ, মোটামুটি ত্রিশ গজের চেয়ে বেশি দূরে ছিল না—এবং আমি তার ফুসফুসের এলাকায় গুলি বিঁধিয়েছি। 'নিজের গুলির কথা বলা'টা আমার অভ্যেসে দাঁড়িয়েছিল এবং আমার মনে পড়ল, ঠিক ঘোড়া টেপার সময় বন্দুকের মাছিটা হরিণের কাঁধের হাড়ের সঙ্গে একেবারে খাপে খাপে মিলে গিয়েছিল।

বড় নাম্বারের গুলির বদলে আমি ব্যবহার করেছি বাকশট—আমি বুঝতে পারলাম, এটাই আমার একমাত্র ভুল হয়ে গেছে। আমার বাবা বরাবরই শিকারে বাকশট ব্যবহার করতে বারণ করতেন; তিনি বলতেন, এতে জানোয়ারেরা সোজাসুজি মরার বদলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আহত হয়ে পালায়। আমি নিজের ভুল বুঝতে পারলাম; বাকশট ব্যবহার করা সেই যে আমি ছাড়লাম, তারপর আর [illegible] দিকে [illegible]াই নি। তারই ফলে, পরে তার কখনও আমাকে পস্তাতে হয় নি।

দুপুরের খররোদের তাড়া খেয়ে জঙ্গলের যে ছায়ারা ঝোপেঝাড়ে পালিয়েছিল, সূর্য অস্তাচলের দিকে ঢলে পড়ায় তারা এখন গুটিগুটি [illegible] বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। দিনের আলো যত নিবে আসছে, পেট তত চনচনে হচ্ছে, ক্লান্তিও বাড়ছে, এই অবস্থায় আমরা ঠিক করলাম, আর এখানে থাকা নয়।

সারাদিন বন্দুক নিয়ে ঘুরে আমার কাঁধ টনটন করছিল; ফেরবার

পথে আমি তাই আবার বন্দুকের ভার গাঁয়ের ফুলবাবু জেন্দুর ঘাড়ে চাপালাম।

আমি ছিলাম সকলের আগে, খাওয়ার কথা আর বিশ্রামের কথা মনে করে গ্রামে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পৌঁছবার আগ্রহে আমি পা চালিয়ে চলেছিলাম। রাস্তা সংক্ষেপ করার [illegible] একেবারে মাঝখানে ঘন ঘাসের [illegible] সরু সরু ঝাড়ে ভর্তি [illegible]। সেখানে ছিল হঠাৎ মোচড়-দেওয়া সব কঠিন কঠিন বাঁক [illegible] বড় জোর দুজন লোক পাশাপাশি [illegible] পারে। মোড় আর বাঁক সমেত খাতটি দৈর্ঘ্যে একশো গজের বেশি লম্বা নয়, কিন্তু তার পুরোটাই বন্য লতাপাতায় ঠাসা।

আমি নালার মধ্যে নেমে পড়লাম, সঙ্গের লোকজনেরা আমার পিছু পিছু আসতে লাগল। আমি সত্য [illegible] যাব এমন সময় বাঁকের ওপার [illegible] একটা ক্রুদ্ধ গর্জনে [illegible] কেঁপে উঠল। সাঁ করে আমি পিছিয়ে এলাম [illegible] দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে [illegible] করে আমার [illegible] জেন্দুর কাঁধের বন্দুকটার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। জেন্দু আমার [illegible] পেছন পেছনই আসছিল, কিন্তু তবু আমার হাতে বন্দুকটা এসে পৌঁছল না। যেদিক থেকে গাঁক গাঁক আওয়াজটা আমাদের দিকে [illegible] আসছিল, সেদিক থেকে চোখ না সরিয়ে আরও [illegible] পা পিছিয়ে এলাম—আর এই সারাক্ষণই আমার হাত পেছনদিকে বাড়ানো ছিল। কিন্তু তবু বন্দুকটা আমার হাতে এসে ঠেকল না। এবার আমি চট্ করে পেছনদিকে তাকালাম, কোথায় জেন্দু কোথায় কী। লাফ দিয়ে কাটিংটা ঘুরতেই দেখি আমার স্যাঙাৎ সেই ফুলবাবুটি আমার দশ গজ তফাতে প্রাণভয়ে পরিত্রাহি ছুটে নালার খাড়া পাড় বেয়ে হুড়মুড় করে উঠবার চেষ্টা করছে। পাড় বেয়ে উঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে বন্দুকটা সে হাত থেকে ফেলে দিয়েছিল; আমি জোর কদমে তার কাছে ছুটে গিয়ে বন্দুকটা কুড়িয়ে নিলাম।

এদিকে সেই গর্জন ক্রমশ সপ্তমে উঠে কাছাকাছি এগিয়ে আসছে। সামনে খাতের বাঁক থাকায় আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। পাড়ের দিকে সরে এসে একটা খাঁজের ওপর খানিকটা উঁচু হয়ে দাঁড়ালাম। এক মুহূর্ত আগে যেখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম তার খুব কাছেই দেখলাম ঘাসগুলো ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। আর তারপরই চোখে পড়ল একটা চিতাবাঘ সামনের দুটো পায়ে ভর দিয়ে অতিকষ্টে পাছার দিকটা টেনে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আমার দিকে মারমুখো হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কাঁধের ওপর বন্দুকটা উঠিয়ে তার মাথা লক্ষ্য করে আমি পরের পর দুটো গুলি ছুঁড়লাম। চিতাবাঘ যেন গুলিদুটো গায়েই মাখল না; ওর কিছু তো হলোই না, উপরন্তু মুখ হাঁ করে গলা দিয়ে ভয়ঙ্কর রকমের গাঁক গাঁক শব্দ বার করে গুড়ি মেরে মেরে আমার দিকে সামনে এগোতে লাগল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ওর মুখ দিয়ে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে আর ওর ঠাণ্ডা হল্‌দে চোখ দুটো আমার দিকে ফেরানো। আমি বন্দুকে আবার গুলি ভর্তি করে ওর হাঁ-করা মুখের ভেতর পরের পর দুবার ছুঁড়ে দিলাম। ওর তাতে কিছুই এসে যাচ্ছিল না, গুলি লেগে ওর চোয়াল দুটো ভেঙে যাওয়া সত্ত্বেও সমানে ও আমার দিকে সরে সরে আসছিল। ওর অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ড থেকে নিশ্চয়ই অ্যাড্রিন্যালিন বেরিয়ে রক্তকে ধুয়ে দিচ্ছে বলেই শরীরে ও এত সামর্থ্য পাচ্ছে। আমি আবার বন্দুকে গুলি ভরে এবার চার গজ দূর থেকে সোজা ওর মাথা টিপ করে পরের পর দুটো গুলি ছুঁড়লাম। এতক্ষণে বাছাধন ঢিট হল; গুলি দুটো ওর মাথার খুলি ভেঙে চুরমার করে দিল।

পরে দেখা গেল, চিতাবাঘটির গায়ে আগেকার একটা গুলি বিঁধে ছিল; গুলির চোট লেগে ওর পাছার খুব কাছে শিরদাঁড়াটা ভেঙে গিয়েছিল। ওর পেছনের পা দুটো সম্পূর্ণ অকেজো করে গুলিটা ওকে খোঁড়া করে দিয়েছিল। মাটিতে ওর পায়ের দাগ বরাবর এগিয়ে গিয়ে দেখে আমি অবাক,—আরে, ওকেই তো আমি কাল

রাত্রে হায়েনা ভেবে গুলি করেছিলাম। বেচারা ডোবার ধার থেকে পুরো এক ফার্লং ঘেঁষটে ঘেঁষটে গিয়ে কাটিংটার ভেতর দিয়ে গড়িয়ে খাতের মধ্যে ঠাঁই নিয়েছিল। ডোবার ধার অবধি সারা রাস্তা মাটিতে রক্তমাখা ঘেঁষটানোর দাগ দেখতে পাওয়া গেল ; এই নিষ্ঠুর ঘটনাটা যে আমার হাত দিয়েই ঘটেছে, এটা তার অকাট্য প্রমাণ। গুলি করার পর আমার উচিত ছিল ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করা ; অথবা সকালে গিয়েও ডোবার ধারটা দেখেশুনে এলে সব খবর আমি জানতে পারতাম। তাহলে আর আমাকে এভাবে অতর্কিতে অপ্রস্তুত অবস্থায় বিশ্রীরকমের বিপদে পড়ে যেতে হত না ; সেইসঙ্গে বাঘ বেচারাকেও তাহলে এভাবে এতক্ষণ ধরে মিছিমিছি যমযন্ত্রণা পেতে হত না।

৭

শেয়ালটা ক্রমান্বয়ে ডেকে চলেছে ; ওর ডাক শুনে নালার কাছটাতে ও কোথায় আছে মোটের ওপর আমি আন্দাজ করে নিলাম। তারপর শুক্‌নো পাতা আর শুক্‌নো কাঠিগুলো সাবধানে এড়িয়ে, আগে ভালো করে ঝোপঝাড় আর বাঁকগুলো খুঁটিয়ে দেখে আমি সেইদিকে এগিয়ে গেলাম। বনের মধ্যে বোধহয় একশো গজও ঢুকি নি, এমন সময় একটা ছোট ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ল— জায়গাটার এককোণে একটা খুব ঠাসা জঙ্গল আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে ছোট টিলার একটা খাঁজে গিয়ে মিশেছে। সেখানে একটা নরকঙ্কাল দেখলাম ; তার চারপাশে মাটিতে কিছু পাঁজরার হাড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মাথার খুলিতে কয়েক গাছি পাকা চুল দেখে বুঝলাম ওটা বুড়ি দাদীরই লাশ। খোলা জায়গাটায় কিছু হাড়পাঁজরা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে ; শেয়াল-শকুনের দল সেসব চেটেপুটে খেয়ে গেছে। পচা মাংস, শুক্‌নো রক্ত আর শকুনের গায়ের গন্ধ মিলেমিশে একাকার হয়ে মৃদুমন্দ হাওয়ায় ভাসছে।

খুব সম্ভব দাদীর লাশটা খাওয়ার জন্যে বাঘ এই জায়গাটাতেই

টেনে এনেছিল। আমি ঠিক করলাম, মানুষখেকো বাঘের খোঁজে নালার দিকে আর না এগিয়ে তার জন্যে বরং এই জায়গাতেই আমি অপেক্ষা করে থাকব। 'মড়ি'টাতে কিছু আর থাক না থাক, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই ছিল না যে, বাঘ যদি এ এলাকায় এখনও থেকে থাকে, তাহলে বাঘ নিশ্চয়ই একবার 'মড়ি'টাকে চোখের দেখা দেখতে এ জায়গায় ফিরে আসবে। ফাঁকা জায়গাটার এপাশে একটা বড টুন গাছ। গাছটা ছিল ঢোলা ঢোলা পাতাওয়ালা মালঝান লতায় ছাওয়া। ডাল থেকে পাতাগুলো ঘনবদ্ধ হয়ে ঝুলছিল। গাছে উঠে গিয়ে দুটো ডালের জোড়ের মুখে একটা মোটা ডালে আরামপ্রদ জায়গা বেছে নিয়ে আমি বেশ জুৎ করে বসলাম। গাছের গুঁড়িতে ছিল ঠেস দেওয়ার জায়গা, সামনে আড়াল হয়ে রইল একটা ডাল আর তার ওপর আরও একটা ডাল পেয়ে গেলাম যাতে পা রাখতে পারি। এ অবস্থানের চেয়ে আরামের, এর চেয়ে নিরাপদ কোনো জায়গার কথা ভাবাই যায় না। এমন সুযোগ সুবিধে পেয়ে আমি তো মহা খুশি। অসুবিধের ব্যাপার ছিল একটাই: আমার সামনের বেশির ভাগটাই ডালপালায় ঢেকে যাচ্ছিল এবং গাছের ওপর থেকে আমি শুধু একটা দিকেই অবাধে গুলি করতে পারি— সেদিকটাতে ফাঁকা জায়গার বাঁ পাশ দিয়ে চলে গেছে বন্য প্রাণীদের অপ্রশস্ত যাতায়াতী রাস্তা। আমার পাশে দুটো ডালের ফাঁকে বন্দুকটা ঠেকো দিয়ে রাখলাম; আর যে রাস্তায় বাঘ পদার্পণ করবে বলে আমি আশা করছি, সেইদিকে বাঁ কাঁধটা সামান্য হেলে থাকলাম। ডান চোখ দিয়ে টিপ করে যারা গুলি ছোঁড়ে, তাদের পক্ষে ডান দিকের চেয়ে বাঁ দিকে তেরছা করে গুলি করা ঢের সুবিধের।

সূর্য একটু একটু করে দিগন্তে ডুবছে; ছায়াগুলো দীর্ঘতর হচ্ছে, দিনের উত্তাপ কমে আসছে। একেবারে নিথর নিস্পন্দ অপরাহ্ণ; কোথাও ছিটেফোঁটাও হাওয়া নেই।

মাঝে মাঝে জঙ্গলের স্তব্ধতা ভেঙে ময়ূরের খ্যাসখেঁসে গলার

চিৎকার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা চিতল হরিণ আমার গাছটা থেকে প্রায় দশ গজ তফাতে মৃগপথে এসে দাঁড়াল। বনে যেন বাঘ নেই, চিতাবাঘ নেই—তার এমনি একটা নির্বিকার গা-ছাড়া ভাব।

সূর্য শেষকালে আমার বাঁ-হাতি পাহাড়ের মাথায় এসে নেমে চূড়ার পেছনে নিজেকে অর্ধগোপন করে ঝুলে রইল। তৎক্ষণাৎ আমার চারদিকে গুন্-গুন্ গুন্-গুন্ করে উচ্চস্বরে আওয়াজ জেগে উঠল; তার নিচে ক্ষীয়মাণ দিনের নৈশব্দ্য চাপা পড়ে গেল। সারাদিনমান আচ্ছন্ন হয়ে থেকে এবং রোদের তাপ থেকে গা বাচিয়ে যারা এতক্ষণ পাতার আড়ালে মাথা গুঁজে পড়ে ছিল, এ হল সেই লক্ষ লক্ষ কীটপতঙ্গের গুঞ্জনধ্বনি।

বিলম্বিত প্রহরের দূরবিস্তৃত জালে সূর্যের বাকি আধখানা আটকে গিয়ে তার টানে দিগন্তের অন্তরালে আস্তে আস্তে তলিয়ে গেল।

সূর্য সবে অস্ত গেছে, এমন সময় একটা কুটরার ভাঙা গলার বিপদ্‌জ্ঞাপক 'হা-ঃ হা-ঃ' আওয়াজ শুনতে পেলাম। জঙ্গলের ওপাশে যেদিকে গিরিখাত, শতখানেক গজ দূরে সেইদিকটা থেকে এই আওয়াজ ভেসে এল। তারপর ঐ একই দিকে, যে খোলা জায়গাটার দিকে আমি নজর রেখেছিলাম—তার ধারপাশ থেকে একদল বনমোরগের পাখা ঝাপ্‌টানোর তুমুল হৈ-হট্টগোল কানে এল। গাছের উঁচু উঁচু ডালগুলোতে যে হনুমান বাহিনী বসে ছিল, তারাও সেই সোরগোলের ধুয়ো ধরে গলা খাঁকারি দিয়ে পরিত্রাহি গালমন্দ করতে শুরু করে দিল আর অত্যন্ত হাস্যকরভাবে মুখ ভ্যাংচাতে লাগল।

ততদিনে জঙ্গলের ভাষা আমার কিছুটা আয়ত্ত হয়েছিল। এইসব আওয়াজ আর চিহ্ন দেখেশুনে আমি খানিকটা আন্দাজ করতে পারলাম—ঐ দিকটা দিয়ে বাঘ কিংবা চিতাবাঘ সম্ভবত আসছে।

বলতে না বলতে, ঐ একই দিক থেকে ভারী পায়ের নিচে শুকনো ডালপালার মত একটা কিছু মট্ করে ভাঙার শব্দ পেলাম।

সেইসঙ্গে টেনে টেনে নাক ডাকার মত গলা দিয়ে নিশ্বাস টানার এক অননুকরণীয় ঘড়র ঘড়র আওয়াজ।

ওটি যে বাঘ, তাতে সন্দেহ রইল না। সম্ভবত ওরই হাতে দাদী খুন হয়েছে; ও এখন নতুন শিকারের সন্ধানে হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে। এখন সবচেয়ে বড় কথা হল, বাঘটা আমার গাছের যথেষ্ট কাছাকাছি ঘেঁষবে কিনা—যাতে আমি ওকে দেখতে পেয়ে ঠিকমত গুলি ছুঁড়তে পারি। আমার গাছের দশ গজের ভেতর দিয়ে গেছে যে সরু মৃগপথ, বাঘ যদি সেখানে চলে আসে, একমাত্র তাহলেই আমি তাকে অবাধে গুলি করার সুযোগ পাই। ফাঁকা জায়গাটার বাকি অংশে শুধু বড় বড় গাছে ঘেরা লম্বা লম্বা ঘাস আর তার মাঝখানে মাঝখানে আগাছার জঙ্গল আর টানা টানা ঝোপ। এর মধ্যে বিশ বর্গগজ বিস্তৃত ঘন ঝোপের একটা জটলা—বাঘ যে পথ দিয়ে আসছে, তার ঠিক পাশে এসে ঠেকেছে; আমি যেখানে আছি, সেখান থেকে সবচেয়ে কাছের সেই ঝোপের ধারটা প্রায় পনেরো গজ দূরে। ঝোপের ওপাশে যে রাস্তা আর জমি, সেখানে আমার দৃষ্টি পৌঁছোয় না—এ থেকে ঝোপটার উচ্চতা আন্দাজ করা যাবে।

বাঘ এগিয়ে এল। তার পেছন পেছন মাথার ওপর হনুমানের দল প্রবল উত্তেজনায় এ-ডাল থেকে সে-ডালে লাফিয়ে পড়ছে আর প্রচণ্ডভাবে গলা খাঁকারি দিচ্ছে। যেন ঢেঁকিতে পার দিচ্ছে আমার বুকের মধ্যে। কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠে দপ্ দপ্ করছে। গাছের গুঁড়িতে আঠার মত সেঁটে গিয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে আমি বসে আছি; দুহাতে আঁকড়ে ধরে আছি আমার বন্দুকটা। এই নিয়ে বোধহয় হাজার বার বুড়ো আঙুল ছুঁইয়ে দেখে নিলাম সেফ্‌টি ক্যাচ ঠিক ঠিক খোলা আছে কিনা, যাতে যে কোনো সময় গুলি ছুঁড়তে পারি।

আমি ভেবে নিতে আরম্ভ করেছি যে, ঝোপের কাছের ফাঁকা জায়গাটার দিকে বাঘ এগিয়ে চলেছে - যে জায়গাটাতে শেষ 'মড়ি'টা সে এনে তুলেছিল। প্রতি মুহূর্তেই আমি আশা করছি, ঘাসের

আড়াল থেকে বেরিয়ে মৃগপথের আড়াআড়ি ছোট ফাঁকা জায়গায় বাঘ এবার চলে আসবে এবং বাঘকে আমি দেখতে পাব।

আমার গাছটার দিকে শুক্‌নো পাতার ওপর আবার একবার মড় মড় করে মৃদু আওয়াজ হল। মাত্র দশ গজ দূরে হঠাৎ আওয়াজটা থেমে গেল। প্রায় পাঁচ গজ চওড়া একটা ঘন ঝোপের আড়াল পড়ে যাওয়ায় আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তার পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না; খানিকক্ষণ পর হনুমানগুলো বোধহয় নিষ্ফল রাগ দেখিয়ে ক্লান্ত হয়ে কিছুটা দূরে সরে গেল; মাঝে মাঝেই তারা অবশ্য ফিরে এসে একেবারে চোটপাট করে যেতে লাগল।

মধ্যে মধ্যে হনুমানরা চুপ করে গেলে আমি একটা অদ্ভুত ধরনের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম—যেন একটা খুব ভারী জিনিস শুক্‌নো ঘাস আর ঝরাপাতার ওপর দিয়ে টেনে আনা হচ্ছে। ওটা স্পষ্টতই ছিল ঘাসের ওপর দিয়ে বাঘের গড়িয়ে যাওয়ার আওয়াজ।

আওয়াজটা থেমে গেল। আমি দম বন্ধ করে আছি—আমার গাছের সবচেয়ে কাছের ঝোপের ধারের রাস্তায় এইবার আমি বাঘের দর্শন পাব। বাইরে খোলা জায়গায় কিছুটা আলো থাকলেও, জঙ্গলের ভেতরটা তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে; তবু যেটুকু আলো আছে তাতে দেখে গুলি করতে পারব। কিন্তু বাঘ আর বেরোচ্ছে না; বাঘ একেবারে নিশ্চুপ নিঃশব্দ। না কোনো কাঠি ভাঙার শব্দ, না কোনো পাতার মড় মড় আওয়াজ।

এক কোয়ার্টার সময় আমি অপেক্ষা করে রইলাম। আমার আশপাশে কোথাও বাঘের কোনো চিহ্ন নেই। বোঝাই যাচ্ছে, কোথাও কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। আমার ভয় হল, বাঘটাকে বুঝি হারালাম। যে পথ দিয়ে এসেছিল, নিঃশব্দে সেই পথ দিয়ে বোধহয় ফিরে গেছে, অথবা ঝোপের ওপাশ থেকে রাস্তা বদ্‌লেছে—তার মানে, আমার ডানদিক ঘুরে ঝোপগুলোর পেছনে গ্রামের দিকে একটু এগিয়ে যে আগাছার ঘন জঙ্গল, বাঘ তার মধ্যে ঢুকেছে।

এই যদি আমার হাতে এক-নলা রাইফেল থাকত, তাহলে সেই পড়ন্ত আলোয় আমার পক্ষে বন্দুকের মাছি দুটোকে এক লাইনে আনা অসম্ভব হত। কিন্তু আমার বরাত ভালো যে, আমার কাছে দো-নলা বন্দুক ছিল: তার ফলে আমার সুবিধেটুকু হল এই যে, নিখুঁতভাবে টিপ করার চেয়েও ঠিক নিশানামত বন্দুকটাকে আমি ধরতে পারলাম। দো-নলা বন্দুকে ভারসাম্য ঢের ভালোরকম বজায় থাকে বলে এই মওকাটা মেলে। শিকারের পক্ষে হাতিয়ারের এই গুণ থাকা একান্ত দরকার এবং এ বিষয়ে কোনোই দ্বিমত থাকতে পারে না, যিনি বন্দুক ধরে থাকেন তাঁর দুটো হাতের ভার দু জায়গায় ঠিক সমান মাত্রায় পড়ে না বলে, কোনো এক-নলা বন্দুকেই দো-নলা বন্দুকের মত অত ভালোভাবে ভারসাম্য বজায় থাকতে পারে না: চটপট কাজের জন্যে যেখানে বন্দুক ঝট্ করে তুলে, নিশানামত ফট্ করে মারা দরকার—সেখানে দো-নলা বন্দুক নিঃসন্দেহে অস্ত্র হিসেবে ঢের ভালো। তাছাড়া পাহাড়পর্বতে আমার শট্‌গান ছুঁড়ে অভ্যেস; শট্‌গান তাক করবার বদলে নিশানা বরাবর গুলি করাটাই বলতে গেলে নিয়ম—ব্যতিক্রম নয়। কাজেই দো-নলা বন্দুকেই আমার ঢের বেশি হাত চলত এবং অন্ধকারের মধ্যেও গুলি লাগাবার আত্মপ্রত্যয় আমার পুরোমাত্রায় ছিল; যাতে কোনোরকম সংশয়ের কারণ না থাকে, তার জন্যে আমার বন্দুকের ডগার মাছিটাতে মোম-দেওয়া একটু তুলো আট্‌কে নিলাম—তাতে ঠিক দিকে নির্ভুলভাবে আমি চোখ রাখতে পারব।

পাহাড়ের মাথায় ঘনায়মান সন্ধ্যা। খোলা জমিটাতে পরতের পর পরত জমছে অন্ধকার বনচ্ছায়া। কোথাও কোনো শব্দ নেই; আমার সামনেকার বায়ুমণ্ডলকে মন্থন করছে আর থেকে থেকে বিচ্ছিরি ভাবে কুস্বর করে ডেকে উঠছে নিঃসঙ্গ একটা আঁধারে ঠকঠকে পাখি।

মনে হল, ঠকে গেয়েছি। দেখা যাচ্ছে বাঘ আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। বন্দুকটা এতক্ষণ এত জোর চেপে ধরে ছিলাম যে, এখন মালুম হচ্ছে আঙুলের কড়াগুলো ব্যথায় টনটন করছে;

মুঠোটা তাই একটু ঢিলে করলাম। বন্দুকটা সরিয়ে আমার পাশে ঠেকো দিয়ে রেখে দেব-দেব করছি, এমন সময় গাছতলা থেকে ভক্ করে আমার নাকে উঠে এসে লাগল একটা বিট্‌কেল বোটকা গন্ধ। চারপাশের আর আর গন্ধ থেকে এটা ঢের বেশি ঝাঁঝালো এবং অন্য রকম। সেই সময় আমার কানে গেল শ্বাসপ্রশ্বাসের একটা খ্যারখেরে আওয়াজ। একটুও না নড়ে আমি নিচের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাইলাম; গাছের তলায় ঘনায়মান অন্ধকারে বাঘের আবছায়া মূর্তি দেখলাম। তার ঘাড়টা ছিল ওপাশে ফেরানো; অর্ধালস ভঙ্গিতে নিরসন্দেহের দৃষ্টিতে আশেপাশে তাকাতে তাকাতে ডাঁশমশা তাড়াবার জন্যে গায়ের পাশে ল্যাজ দিয়ে মৃদুমন্দ আঘাত করছিল। বাঘটা ঠিক আমার নিচে দাঁড়িয়ে, আমার বন্দুকের ডগার মাছিটা থেকে তার দূরত্ব বারো ফুটের মত।

আমি নিশ্বাসটা চোঁ করে ভেতরে টেনে নিলাম; আমার পাতলুনের একটা বোতামও পট্ করে ছিঁড়ে গেলে বাঘের ঠিক মুণ্ডুতে পড়ত। এতক্ষণ আরামদায়ক পা-দানি হিসেবে ব্যবহার করা নিচের ডালটা এবার আমার বন্দুকটা নিচু করে বাঘকে নিশানা করার ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়াল। ঘাড়টা আমি যতদূর সম্ভব নুইয়ে দিয়ে বাঁ-দিকে ঘোরালাম এই আশায় যে, সেখানে নিচের ডালের বাধা এড়িয়ে বন্দুকটা ঢোকাবার কোনো একটা হয়ত ফাঁক পেয়ে যাব। সেটা সম্ভব হয় একমাত্র যদি ওপর থেকে ঝুলন্ত মালঝান লতার ঢোলা ঢোলা পাতাগুলো না ছুঁয়ে তার ভেতর দিয়ে বন্দুকটা চালিয়ে দিতে পারি। শরীরটাকে টান টান করে বন্দুক নিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে খুব সাবধানে বন্দুকটা নোয়াতে শুরু করলাম। পাতাগুলো তো যাহোক পার করে কাজ অর্ধেক কামাল করেছি। এমন সময় অন্য একটা ডালের লতানো শুঁড়ে আমার বন্দুকটা আট্‌কা পড়ল। আর নামানো যাচ্ছিল না; অথচ আরও দশ ডিগ্রির মত বন্দুকের মুখ না নোয়াতে পারলে বাঘের মুণ্ডুটা নিশানার মধ্যে আসে না।

আবার আমি আগের মত অবস্থায় শরীরটা নিয়ে গিয়ে পাশের দিকে হেলে অন্য কোনো ফাঁক খুঁজতে লাগলাম। হুঁ, একটা পাওয়া গেছে। তাতে আমাকে অনেকখানি হেলে প্রায় হেঁটমুণ্ড হতে হবে। তার ফলে একদিকের পাল্লা বেশি ভারী হয়ে যেতে পারে; গুলি ছোঁড়ার ধাক্কায় গাছ থেকে ছিটকে মানুষখেকো বাঘের মুখে গিয়ে পড়তে পারি।

খুব সাবধানে পাদুটো সরিয়ে দেখলাম মূলের একটা ছোট ডাল আর গুঁড়ির ফাঁকে আমি পায়ের পাতা ঢুকিয়ে দিতে পারি। স্বচ্ছন্দে নিজের টাল সামলে রেখে আমি গুলি ছুঁড়তে পারব। বন্দুকটা ফের তুলে এনে শরীরটাকে যন্ত্রণাকরভাবে বেঁকিয়ে বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকে পড়ে বাঘের দিকে অলক্ষিতে বন্দুকটা বাড়িয়ে দিলাম। আমার আরেকটি পায়ের কাছে একটা কচি ডাল আঁকশির মত বেরিয়ে ছিল এবং সেই ডাল থেকে একটা ছোট পাতা ঝুলছিল। এই আঁকশিটা পেরিয়ে আমার বন্দুকের মুখটিকে যেতে হবে এবং সেই পাতাটি নিচের দিকে কী আছে না আছে দেখতে দিচ্ছে না। বন্দুকটা আমি আঁকশির কাছাকাছি নিয়ে গেলাম এবং পাতাটার দিকে নিজের পায়ের আঙুল বাড়িয়ে দিলাম। আস্তে, খুব আস্তে করে আমি আমার বন্দুকটা আঁকশির ভেতর দিয়ে চালিয়ে দিয়ে নিচেকার মাটির সঙ্গে এক লাইনে আনলাম। চোখ টেরিয়ে তাক করতে গিয়ে দেখি নিচে ভোঁ-ভাঁ—মাটি ছাড়া কিছু নেই। বাঘ যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দেই চলে গেছে—পেছনে রেখে গেছে তরুণ রাত্রির অন্ধকার।

হঠাৎ নিজেকে বড় নির্জীব, বড় অবসন্ন বোধ হল। ওৎ পেতে বসার জায়গা সম্পর্কে যে মূলনীতি আছে, আমি তা অগ্রাহ্য করে কী ভুল যে করেছি। দন্তশূলের মত সেই অনুতাপের বেদনাটা আমার মধ্যে দব্ দব্ করতে লাগল। সেই মূলনীতি হল এই:

'চটপট গুলি ছোঁড়ার জায়গা আপনাকে রাখতেই হবে আপনার

'চতুষ্পার্শে : সামনে, বাঁয়ে, ডাইনে আর পেছনে—শেষেরটা সবচেয়ে বেশি জরুরী।'

এই নীতি মনে রেখে যদি গোড়াতেই দেখেশুনে বসবার ব্যবস্থা করতাম, তাহলে আর বন্দুকের নল চালাবার জায়গা খুঁজতে গিয়ে আমাকে অতটা মূল্যবান সময় নষ্ট করতে হত না। বাঘ এসে গাছটার ধারে কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বাঘ সাধারণত অতক্ষণ দাঁড়ায় না। ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করার যত কিছু সুযোগ দেওয়া যায় ও আমাকে দিয়েছে। আমার অপরিণামদর্শিতার ফলেই বাঘ বেঁচে গেছে এবং আমার মাথা হেঁট হয়েছে।

আমার আর এখন কিছুই করবার নেই। জঙ্গল জুড়ে ঘুট ঘুট করছে রাতের অন্ধকার। হেঁটে ফেরা আদৌ নিরাপদ নয়—বিশেষত, ধারে কাছে এখন মানুষখেকো বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একটা ঘটনা আমি জানি। একজন বনপুলিশ ছিল, তার নাম উদয় সিং। সিরমুর জেলায় কোলার নামে এক গ্রামের কাছে লোকটা ঠিক এই রকম অবস্থায়ই বাঘের মুখে পড়েছিল। বাঘ বলতে মানুষখেকো নয়, কমবয়সী মামুলি বাঘ। সময়টা ছিল শীতের বিকেল; দুজনেই আমরা বেরিয়েছি মাংসের যোগাড়ে। রাস্তার এপাশে ছিল একছিটে জমিতে ঘন উলুবন আর নিবিড় ঝোপঝাড়, ওপাশে খোলামেলা গাছের জঙ্গল। উলুবনটা ঘুরে যেখানে একটা গিরিখাত গাছের জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেছে, সেখানে দূরের নালামুখে গিয়ে আমি দাঁড়ালাম। উদয় সিং হাতে একটা লাঠি নিয়ে সদর রাস্তা থেকে নেমে উলুবনেই ঢুকে গিরিখাতের ভেতর দিয়ে আমার দিকে আসছিল। উলুবনের টুকরোটাতে বনশুয়োর আর চিতল হরিণ থাকত; আমরা ভেবেছিলাম একটা দুটো শুয়োর বা হরিণ আমার রাস্তায় এসে যাবে। খানিক পরে হঠাৎ হাউমাউ করে একটা চিৎকার শুনলাম, 'হায়, মার দিয়া।' এবং তার কয়েক সেকেণ্ড পরেই দেখি নালার ভেতর দিয়ে বীরবিক্রমে গাছের জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছে একটা বাঘ—আমি পাড়ের ওপর যেখানে দাঁড়িয়ে-

ছিলাম, সেখান থেকে প্রায় পাঁচ গজ তফাত দিয়ে। আমার হাতে তখন গুলিভরা ·৪০৫ উইঞ্চেস্টার রাইফেল। চট্‌ করে বন্দুকটা ঘাড়ে তুলে নিলাম। আমাকে ছাড়িয়ে গিয়ে বাঘ যেই না এপাশ থেকে ওপাশ করা, তৎক্ষণাৎ আমার বন্দুক গর্জে উঠল। বাঘের এদিকের কাঁধের ভেতর দিয়ে ঢুকে গুলিটা তার অন্য কাঁধটা ভেঙে দিয়েছিল; ফলে গুলিটা তার ফুস্‌ফুস্‌ আর অন্ননালী ফুঁড়ে চলে গিয়েছিল। বাঘটা হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে চোখ কপালে তুলল। গুলি ভরে আবার আমি বন্দুক ছুঁড়লাম; কিন্তু তার দরকার ছিল না। বাঘ তার আগেই পটল তুলেছিল।

নালার ভেতর দিয়ে পেছনদিকে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে আমি উদয় সিংকে ডাকলাম। ও তৎক্ষণাৎ সাড়া দেওয়ায় আমি খানিকটা ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলাম। গিয়ে দেখি নালার ধার আর উলুবনের মাঝপথে উদয় সিং বসে, কানের কাছে ছোট একটা ক্ষতস্থান থেকে তার ডান গাল বেয়ে টপটপ ক'রে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তার মাথার আশপাশে আরও তিন চার জায়গায় কেটেছে; তার চুলের ভেতর দিয়ে রক্ত চুইয়ে পড়ছে।

মানুষ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়া স্বভাব নয়, এমন একটা মামুলি বাঘই উদয় সিংকে আক্রমণ করেছিল। খুব সম্ভবত বাঘও আমাদেরই মতন শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যে মুহূর্তে লোকটা ওপরে উঠবার জন্যে ঢালু পাড়ে পা বাড়িয়েছে, বাঘ অমনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে—কোন্‌ জাতের প্রাণী সেটা, কী না কী, অতশত না জেনেই। যখন ওর খেয়াল হয়েছে জংলা প্রাণী তো নয়, ওটা একটা মানুষ- তখন তার আর থামবার উপায় নেই। গোড়ার ধাক্কায় বাঘটা উদয় সিঙের মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে ছিটকে নালায় পড়ে কাছাকাছি জঙ্গলের দিকে পা বাড়িয়েছে। লাফানোটা মাথার খুব ওপর দিয়ে না হওয়ায় লোকটার কানের আশপাশে একটা থাবার নখ লেগে গিয়ে ঐ ধরনের কিছুটা কেটে ছড়ে গেছে।

ইস্, এখন সকাল হওয়ার অপেক্ষায় সারা রাত গাছের ওপর বসে থাকা ছাড়া আমার আর উপায় নেই। যে গাছটাতে আমি উঠেছি তাতে বসে আরাম, কিন্তু যতটা উঁচুতে বসেছি সেটা আদৌ নিরাপদ নয়। মাটি থেকে আমার বসবার জায়গার উচ্চতা দশ বারো ফুটের মত; বাঘ এক লাফে অনায়াসে আমার নাগাল পেতে পারে।

বাঘেরা নিয়মিত গাছে চড়ে না, যদিও না চড়বার কোনো কারণ নেই। বিড়ালজাতীয় সব প্রাণীই গাছে চড়তে পারে। জিম করবেট একটা ঘটনার কথা লিখেছেন: বাঘের নাগালের বাইরে রাখার জন্যে একবার একটা 'মড়ি' গাছের ওপর টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল; বাঘ গাছে উঠে গিয়ে তার 'মড়ি'টা পেড়ে এনেছিল।

আরেকটি বাঘের কথাও বইপত্রে পাওয়া যায়। সে বাঘটি নিয়মিত গাছে চড়ত। বাঘটি থাকত মহীশূরের চিড়িয়াখানায়; ঘেরা জায়গার মধ্যে একটা গাছ ছিল, রোজ গাছে চড়া তার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বেশির ভাগ সময়ই সে গাছের মগডালে উঠে বসে থাকত।

বাঘ যে সচারচর গাছে চড়ে না, সেটা তার ভারী হোঁতকা শরীরের জন্যে। সব সময় তার ভার সইতে পারার মতন মজবুত ডাল পাওয়া শক্ত। গাছে নিয়মিত না চড়ার এটাও একটা কারণ।

বাঘ যেমন গাছে সাধারণত চড়ে না, তেমনি গাছের দিকেও সচরাচর ঘাড় উঁচিয়ে দেখে না। শব্দ হলে বা নড়লে চড়লে, একমাত্র তখনই নজর করে দেখে।

অন্যদিকে আবার, চিতাবাঘেরা কিন্তু স্বভাবতই গাছের দিকে নজর করে করে দেখে এবং তরতর করে অতি অনায়াসে গাছের ওপর উঠে যায়। চিতাবাঘ চোট খেয়ে গাছে উঠে পড়ে শিকারীকে টেনে নামিয়ে নিয়ে এসেছে এমন ঘটনাও লিপিবদ্ধ আছে।

মানুষখেকো-বাঘ শিকারে বসতে হলে, আমার হিসেবে, জমি থেকে উচ্চতা হওয়া উচিত কম করে বারো থেকে পনেরো ফুট। তাতে যথাসম্ভব বিপদ এড়ানো যায়। তবে আশপাশের জমিজায়গা

কি রকমের, গাছটা কোথায় কিভাবে আছে—তারই ওপর সব কিছু নির্ভর করবে।

সেই যাই হোক, এত কম উঁচু জায়গাতেই যাহোক তাহোক করে আমাকে বসে থাকতে হবে; এ অবস্থায় এর চেয়ে আরামদায়ক বসবার জায়গার কথা আমি ভাবতেই পারি না, বিশেষত আমাকে যখন সারাটা রাত এই জঙ্গলে কাটাতে হবে এবং যেক্ষেত্রে আমার ঘুমে চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বসবার জায়গা থেকে কিছুতেই আমার উল্টে পড়ে যাওয়া চলবে না; আঁকশির মত ডালে আমার বসবার এই জায়গাটা তেমন দুর্ঘটনা ঠেকাবার দিক থেকে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। একটা ডালের আঁকড়ায় স্ট্র্যাপটা গলিয়ে দিয়ে বন্দুকটা ঝুলিয়ে রাখলাম; তারপর যথাসম্ভব শরীরটাকে ঢিলে করে হাত পায়ের খিল খুলতে লাগলাম।

দূরে কোথাও একটা হা-ঘরে কোকিল মর্মন্তুদভাবে ডেকে ডেকে বুক ফাটিয়ে ফেলছিল; তার কাকণ্যের পেলব স্পর্শে হাজার চেষ্টা করেও আমি ঘুম আটকাতে পারলাম না। একটানা ঘুম নয়; তন্দ্রা আসছে, ঘুমের ঘোরে মাথাটা ঢলে পড়লেই জেগে উঠছি, আবার ঘুমোচ্ছি। এমনি করে এক সময় কানে এল বনের মধ্যে সবার আগে ঘুমভাঙা পাখি কালো চড়ুইয়ের রাতপোহানোর খবর জানানো গান। ভোর হওয়া অবধি আমি অপেক্ষা করলাম। প্রথম আলোর দু একটা ফালি যেই না দেখা, আমি অমনি সুড় সুড় করে গাছ থেকে নেমে এলাম। লাল ঝুঁটিদার বনমোরগ সুরেলা গলায় আমায় স্বাগত জানাল।

আমি গ্রামের দিকে রওনা হলাম। ফরেস্ট চেকপোস্টের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি, কী সর্বনাশ।—কাল বিকেলে হেঁটে গিয়েছিলাম, আমার সেই পায়ের দাগে দাগে মানুষখেকো বাঘটার পায়ের ছাপ। বাঘের পায়ের সেই ছাপ সটান চেকপোস্টের বারান্দা অবধি গেছে, তারপর একটা চক্কর দিয়ে খোলা মাঠ হয়ে উপত্যকার

ওধারের একটা গ্রামের দিকে পাড়ি দিয়েছে। চেকপোস্টের দরজার কাছে গিয়ে দেখি ভেতর থেকে খিল দেওয়া। বার কয়েক ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। আমার ভৃত্য এবং মঙ্গলকে বেরিয়ে আসতে দেখে তো আমি তাজ্জব। সাক্ষাৎ যম যে ওদের দুয়োর থেকে ঘুরে গেছে, ওরা তার বিন্দুবিসর্গও জানে না। আমারও বরাত খুব ভালো বলতে হবে; রাত্তিরটা ভাগ্যিস জঙ্গলেই কাটিয়েছি। ফিরে গেলে নির্ঘাৎ বাইরে শুতাম; আর তাহলে বাঘ এসে অনায়াসে আমাকে মুখে করে নিয়ে যেত।

সর্দারজী বকাবকি করেছিল, গাঁয়ের মোড়ল অনেক করে বলেছিল—কিন্তু আমার ভৃত্যটি তা সত্ত্বেও গোঁ ধরে চেকপোস্টে থেকে গিয়েছিল। কিছুতেই গ্রামে যায় নি। বার বার সে বলেছে, যখন এই চেকপোস্টেই থাকবার ব্যবস্থা করতে তাকে বলে দেওয়া হয়েছে এবং রাত্তিরে যেকোনো সময়ে যেহেতু আমি এসে পডতে পারি, তখন তার পক্ষে এ জায়গা ছেড়ে নড়া চলে না। আমার ভৃত্যটির কাছে আমার একটি বাড়তি বন্দুক ছিল, মসৃণ-বোরের ১২-গেজী পাখি-মারা ছট্‌রা বন্দুক; বন্দুক চালাতেও জানত সে। কিন্তু মানুষখেকো বাঘের হাত থেকে বাঁচবার ওটা কোনো উপায়ই নয়—বিশেষত যখন কেউ অঘোরে ঘুমিয়ে থাকে।

কপাল ভালো, তাই ক ন ও ওর স্বভাবসুলভ বাহাদুরি দেখাতে যায় নি এবং নিজেকে বীরপুরুষ প্রমাণ করার জন্যে জোর করে বারান্দায় শুতে চায় নি। বরং বুদ্ধি খাটিয়ে, আগে থেকে সাবধান হয়ে খিল এঁটে ঘরের ভেতর ঘুমিয়েছে। তাই এ যাত্রা পৈতৃক প্রাণটা বেঁচেছে।

## ৫

গাছতলায় মানুষখেকো বাঘের সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার পর বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল, কিছুতেই আর তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হচ্ছে না। কখনও টোপ দিয়ে, কখনও বিনা টোপে আশপাশের

সম্ভাব্য প্রত্যেকটি জায়গায় রাতের পর রাত তার জন্যে আমি বসে থাকছি, কিন্তু সমস্তই ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে। প্রত্যেক সকাল বিকেল চারপাশের কয়েক মাইল জুড়ে আমি জঙ্গলগুলো চুঁড়ছি, প্রত্যেকটা ঝোপে যাচ্ছি, সম্ভাব্য সমস্ত আস্তানায় হানা দিচ্ছি—কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! এ ক'দিন বাঘের ছাপ দেখে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে—কিছুটা ছোট আকারের বাঘিনী, ওজনে হালকা এবং সম্ভবত সামনের ডান পা একটু লেংচে চলে। ওর সেই পায়ের ছাপ প্রায় এক সপ্তাহ হতে চলল গ্রামটির দশ বর্গ মাইল এলাকার মধ্যে আমার আর নজরেই পড়ছে না। এখান থেকে সে বেমালুম হাওয়া আর এদিকে আমি কী করব বুঝতে না পেরে মুখ শুকনো করে জঙ্গলে একা একা নাকালের একশেষ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

সর্দারজী আমাকে রোজ খোঁচাচ্ছেন বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে আর আমি রোজই তাঁকে ব্যগ্রতা করে বলছি আরেকটা দিন থেকে যান। ক্রমশ ওঁর আর ধৈর্য থাকছে না। শিকার মানেই ওঁর কাছে শুধু ফললাভ; আমি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জেনেছি, অসাফল্যও শিকারের অঙ্গ।

গুলি করলেই যদি টপাটপ উড়ন্ত পাখি আর ছুটন্ত হরিণ মারা যেত, তাহলে শিকারের তো আর কোনো মজাই থাকত না। তেমনি, যদি যোগাড়যন্ত্র করে বসে পড়লেই বাঘ সুড় সুড় করে এসে হাজির হত, তাহলে ভারী জন্তু শিকারের কল-কৌশল বা আকর্ষণ বলে কিছু তো থাকতই না। হিংস্র বাঘ মারার পাইকার হিসেবে নাম কেনার জন্যে যে সব 'শিকারী'রা একেবারে মরে যান, তাঁদের সেই মনোভাবের প্রতি আমার কোনো শ্রদ্ধা নেই। চারদিক ঘুরে 'মড়ি'-গুলোকে নজর করে দেখা অথবা শীতের ভোরে পায়ের ছাপ খুঁজে বেড়ানো, ফস্কে গেলে পরে আবার গিয়ে সেই জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখা কোথায় কী ভুল হয়েছে না হয়েছে—ঐ কিসিমের 'শিকারী'রা ওসব ঝামেলার মধ্যে বিশেষ থাকেন না।

সর্দারজীর ঘ্যানঘ্যানানির জ্বালায় চটে মটে গিয়ে আমি একদিন

খোলাখুলি ওঁকে বলে দিলাম, ইচ্ছে করলে স্বচ্ছন্দে উনি ফিরে যেতে পারেন ; তবে আমার কথা হল, সামনের এক সপ্তাহের মধ্যে এখান থেকে নড়বার আমার কোনো ইচ্ছেই নেই। আমাকে ভেঁটে কথা বংৎত দেখে ভদ্রলোক ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন এবং তাতেই রাজী হয়ে গোঁজ হয়ে বসে রইলেন।

আমি সমানে চেষ্টা করে যেতে লাগলাম ; আমার নাছোড়বান্দা ভাব দেখে শেষ পর্যন্ত মেথরদের ছেলে পন্নু আর তার বন্ধু ছাড়াও গ্রামের আরও কয়েকজন ভরসা পেয়ে আমার সঙ্গে এসে হাত মেলাল। মানুষখেকো বাঘের পদাঙ্ক অনুসরণ এবং তার সম্বন্ধে খবরাখবর যোগাড়ের ব্যাপারে তখন আর আমি একা নই। ওরা আশপাশের গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে মানুষখেকোটার সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য জুটিয়ে আনত। মোষের বাচ্চা সংগ্রহ করে এনে টোপ বাঁধার কাজে ওরা আমাকে সাহায্য করত। ওরা আমার হয়ে মাচা বেঁধে দিত, আমার ফাইফরমাস খাটত, রোজ সকালে গিয়ে বাঘের সত্যকার পায়ের ছাপ খুঁজে পেতে দেখে আসত। ক্লান্তিকর ধরাবাঁধা কাজের হাত থেকে এইভাবে ওরা আমাকে বাঁচিয়েছিল।

মানুষখেকো বাঘটা শেষ শিকার করেছে তা প্রায় এক সপ্তাহ আগে ; পেট ভরে শেষ খেয়েছে তাও প্রায় পাঁচদিন আগে।

একেকটা দিন যায় আর আমার কেমন যেন মন বলে, অদূর ভবিষ্যতে আরেকজন কাউকে এই ভয়ঙ্কর রক্তপিপাসু জানোয়ারের খোরাক হতে হবে। এতদিনে নিশ্চয়ই বাঘের পেটে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে এবং শিকার ধরবার জন্য নিশ্চয়ই এখন সে মরীয়া।

বাঘটার পূর্বেকার ইতিহাস আমি খুঁটিয়ে জেনে নিই নি এবং এর আগে কোথায় কোথায় কাকে মেরেছে সেটা ম্যাপের গায়ে নিশানদিহি করি নি—না করাটা হয়েছিল আমার বোকামি। আগেকার একটু অভিজ্ঞতা থাকলেই সেটা আমি করতাম। তাহলে আমি আগে দেখে নিতাম কিভাবে ও খেপ দিয়ে বেড়ায়, কোন রাস্তায়

চক্কর দেয়, কোন্ পদ্ধতিতে ও মারে এবং কতদিন পর পর শিকার ধরে। সব মানুষখেকো বাঘই রীতিপদ্ধতি এবং স্থানের দিক দিয়ে, এক হিসেবে, বেজায় নেই-আঁকড়া। তারা যে যার নিজের নিজের এলাকায় থাকবে, একেকটা জায়গায় ঠিক পালা করে করে হানা দেবে।

নরখাদক বাঘ মহা চরকিবাজ প্রাণী, গো-খাদকের চেয়েও এককাঠি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তার পক্ষে এক জায়গায় থাকা দুষ্কর হয়ে পড়ে, সে জায়গার লোক একজন দুজন সঙ্গীসাথীকে হারিয়ে সেয়ানা হয়ে ওঠে এবং এমন সব নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে যাতে সেই বাঘের পক্ষে এরপর আর কাউকে মারাধরা সম্ভব হয় না। নিছক খিদের তাড়নায় তাকে তখন এমন কোথাও চলে যেতে হয়, যেখানে সে অসাবধানী শিকার পাবে—যতদিন না সেখানেও আবার তার টেঁকা দুষ্কর হয়ে পড়ে। এইভাবে সে ঠাঁইনাড়া হয়ে হয়ে দশ পনেরো মাইলের ব্যবধানে মানুষ মারে এবং এলাকার আকার আর ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি অনুযায়ী যথাকালে সে তার আগেকার লুটের জায়গায় ফিরে আসে। মানুষখেকোরা ঠিক নিয়মিত খেপ দিয়ে বেড়ায় এবং প্রায় নিয়ম করে কিছুদিন অন্তর অন্তর একটা জায়গায় ফিরে আসে। তার এই রেওয়াজের সুবিধে নিয়ে প্রায় ঠিকঠাক হিসেব করে অনেকটা বলা যায়, এরপর কোথায় এবং কবে তার পায়ের ধুলো পড়বে।

মানুষখেকো বাঘ কিন্তু নরখাদক চিতাবাঘের মতন, সব সময় খুব ডানপিটে হয় না। মানুষকে যখন হাতেনাতে সে আক্রমণ করে, তখন করে পেছন দিক থেকে। ক্বচিৎ কদাচিৎ সামনাসামনি থেকে এসে অথবা মানুষকে তৈরি থাকা অবস্থায় আক্রমণ করে। চিতাবাঘ যা করে, বাঘ সে রকম গ্রামে ঢুকে অথবা ধারে কাছের ক্ষেতখামার থেকে মানুষ পাকড়ায় বলে সচরাচর শোনা যায় না। মানুষখেকো বাঘ জঙ্গলের রাস্তাঘাট অলিগলিতে হানা দিয়ে বেড়ায়; ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওৎ পেতে বসে থাকে—অসতর্ক গ্রামবাসী বা রাস্তার

লোক একা গেলে তাকে টেনে নেয় এবং দল বেঁধে গেলে আর সবাইকে চলে যেতে দিয়ে সবচেয়ে পেছনের লোকটাকে এসে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায়।

কঠিন কাজ আরও কঠিন হয়ে পড়েছিল আমার অনভিজ্ঞতায়। গোড়ার দিকে গ্রামের লোকের অসহযোগ তার সঙ্গে যোগ হওয়ায় আরও প্রায় হাল ছাড়ার দাখিল হয়েছিল। আমার সম্পর্কে গ্রামবাসীদের মনোভাব বদলে যাওয়ায় আমার অসহায়ত্বের ভাব কমে যায়। কিন্তু আমার অনভিজ্ঞতার দরুন কৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা যে দূরে সেই দূরেই থেকে গেল। একে শরীর বইছে না, তায় আশাভঙ্গের দরুন মন ভার, সেইসঙ্গে সর্দারজীর নীরব ভর্ৎসনা আমাকে ভারি কষ্ট দিচ্ছিল। এত ঝঞ্ঝাট আর আমার সহ্য হচ্ছিল না; মনে মনে ঠিক করলাম, নিদেনপক্ষে সাময়িকভাবে স্বগ্রামে ফিরে যাব।

সে রাতটা গ্রামের মধ্যেই আমি ঘুমিয়ে কাটালাম। চলে যাওয়ার আগে, বনের দিকে নিয়মিত এক চক্কর ঘুরে আসতে গেলাম। আমার যাওয়াটা দাদার হত্যাকারীর উপস্থিতির আঁচ পাবার আশা করে ততটা নয়, যতটা নিজের মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে

খুনী বাঘের থাকার কোথাও কোনো লক্ষণ দেখলাম না। ফলে আমার আর অতটা অস্বস্তি রইল না।

সর্দারজী আর আমার ভৃত্যটি বেঁধেছেঁদে বাড়ি যাবে বলে তৈরি হয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি তাই গ্রামের পথে পা বাড়ালাম। আস্তে আস্তে যাচ্ছি আর এই বলে মনকে বোঝাবার চেষ্টা করছি যে, একা একজন মানুষ যা করতে পারে তার সবই আমি করেছি। যুক্তির এই ধারাটি খুব মিথ্যে ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন যেন মন মানছিল না—মনে সুখ পাচ্ছিলাম না। বনের ধারের কাছাকাছি এসে বসলাম। মনে কষ্ট হচ্ছিল আর সেইসঙ্গে একটা দোটানার ভাব। বেলা চড়চড় করে বাড়লেও আমার মনের ভার তাতে একটুও কমছিল না। এমন সময় দেখলাম গ্রামের দিক থেকে

পুন্নু আসছে; তার চলার মধ্যে একটা হন্তদন্ত ভাব দেখে বুঝলাম কোনো জরুরী ব্যাপার। উঠে পড়ে হন হন করে এগিয়ে গিয়ে মাঝপথে তাকে ধরলাম। পুন্নু এসেছে আমাকে একটা খবর দিতে।

ও আমাকে বলল, সকালে কাছের একটা গ্রামে গিয়েছিল; সেখানে গিয়ে শুনেছে, মানুষখেকো বাঘটা আবার একটা শিকার ধরেছে, এবারে তার শিকার হল মাইল ছয়েক দূরের একটি পাড়ার এক রাখাল ছেলে। পুন্নু তক্ষুনি সেখানে চলে যায়; সেই গাঁয়ে আবার পুন্নুর মামার বাড়ি। গাঁয়ে গিয়ে জানতে পারে ছেলেটি তারই মামাতো ভাই; ষোল বছরের ডাগর ছেলে। বেচারাকে বাঘে টেনে নিয়ে গেছে।

খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দ্বিধা কেটে গেল; তৎক্ষণাৎ আমি ঠিক করে ফেললাম মানুষখেকো বাঘটার ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত না করে এই এলাকা ছেড়ে আমি যাব না। মন বেঁধে নেওয়ার ফলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনটা হালকা হল। গ্রামে ফিরে এসে দুচার কথায় আমার ভৃত্যকে জানিয়ে দিলাম আমার সিদ্ধান্তের কথা এবং সর্দারজীকে বললাম ইচ্ছে করলে তিনি ফিরে যেতে পারেন, তাঁকে আমার ঘোড়াটা নিতে বললাম। সর্দারজী বেচারা আমার সঙ্কল্পের কথা শুনে দুঃখিত হলেন, তবে লোক ভালো বলে তাঁর মজাদার সঙ্গ থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে চাইলেন না; যদিও সে অবস্থায় তাঁর সঙ্গ আমার মোটেই কাজে লাগছিল না।

তাড়াতাড়ি দুটো নাকেমুখে গুঁজে, আমার গ্রামের রাস্তার উল্টো-দিকের পথ ধরে, আমি ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলাম সেই পাড়াটাতে যেখানে পুন্নুর মামাতো ভাই মানুষখেকো বাঘের হাতে মারা পড়েছে। কথা রইল, পুন্নু আর জেন্দুকে সঙ্গে করে নিয়ে সর্দারজী আর আমার ভৃত্য বিকেলবেলায় সেখানে চলে যাবে।

আমি বেলা দুটো নাগাদ সেই পাড়ায় পৌঁছে গেলাম। আফসোসের কথা, গিয়ে দেখি গ্রামের লোকে ছেলেটির দেহাবশেষ সরিয়ে ফেলে দাহ করে বসে আছে।

আগের দিন বিকেলে ছেলেটি যখন গরু চরিয়ে বাড়ি ফিরছিল, তখন বাঘের হাতে খুন হয়। তার সঙ্গে আরেকটি ছেলে ছিল; ওরা গরুগুলোকে তাড়িয়ে জঙ্গল থেকে বার করে এনেছিল। একটা গরু দলছুট হয়ে পিছিয়ে পড়ে জঙ্গলের ধারের কাছাকাছি চরে বেড়াচ্ছিল। পুন্নুর মামাতো ভাই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে সেইদিকে পিছিয়ে গিয়েছিল। তার আগেই সূর্য অস্ত গেছে এবং ঘোর-ঘোর হয়ে আসছিল। অন্য ছেলেটি দাঁড়িয়ে থেকে তার বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছিল। অন্ধকার হয়ে এল; গরুগুলো ফেরবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। দলছুট গরুটা শেষ পর্যন্ত এসে দলের সঙ্গে যোগ দিল। কিন্তু তাকে আনতে গিয়েছিল যে ছেলেটি, তার দেখা নেই।

অন্য ছেলেটির তখন ভয় হল। সে বন্ধুর নাম ধরে চিৎকার করে ডাকল। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আবার ডাকল; এবারও সাড়া নেই। তখন একটা গাছের ওপর উঠে পড়ে সমানে বার কয়েক ডাকাডাকি করল।

পাড়ার লোকে তার ডাক শুনতে পেয়েছিল। তার সেই সখেদে ডাকবার কারণ জানবার জন্যে তারা সব ছুটে এল।

লোকজনেরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তারা সে সময়ে জঙ্গলের ভেতর ঢোকে নি এবং নিরুদ্দিষ্ট ছেলেটির কী যে হয়েছে তাও তারা জানত না। মাত্র সকালবেলায়, ছেলেটির খোঁজে নতুন করে বেরিয়ে, তারা দেখে যা ভয় করা গিয়েছিল তাই ঘটেছে। একটা ঝোপের ভেতর থেকে তারা ছেলেটির অর্ধভুক্ত দেহটি বার করে।

সত্যিই, এ এক শোকাবহ ঘটনা। গত ছ মাসের মধ্যে বার বার এই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

## ৬

গ্রামবাসীরা লাশটাকে সরিয়ে শুধু যে বাঘকে তার ভূরিভোজ থেকে বঞ্চিত করেছে তাই নয়, সেইসঙ্গে আমারও একটা সুযোগ নষ্ট করে

দিয়েছে—সম্ভাবনাটা খুব উজ্জ্বল না হলেও, হয়ত শয়তানটাকে সেক্ষেত্রে আমি উচিত শিক্ষা দিতে পারতাম।

মানুষখেকো বাঘেরা বেজায় ধড়িবাজ, 'মড়ি'র কাছে বড় একটা ফেরে না—লোকে টের পেলেই লাশ সরিয়ে নিয়ে যায়, বাঘদের এটা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। এবং, দ্বিতীয়ত, বিপদ দেখা দিতে পারে অপেক্ষমাণ শিকারীর মূর্তিতে, সেটা সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই তারা বুঝতে পারে। শিকারটাকে মেরে 'মড়ি' বানাবার পর কেউ যদি তাদের না ঘাঁটায়, তাহলে সাধারণত তারা নিরিবিলিতে টেনে নিয়ে গিয়ে পেটে পোরে; এবং তারপর, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটাই ঘটে থাকে যে, তারা সে জায়গা ছেড়ে চলে যায়।

আবার, বাঘ মানুষ মারলে সাধারণত তাই নিয়ে এত হৈ-চৈ হয় যে বাঘ চটপট সে তল্লাট ছেড়ে পালায়।

ছেলেটাকে মারবার পর খুব যে একটা সোরগোল হয়েছে, তা বলা যায় না। কাজেই বাঘ হয়ত আশেপাশে কোথাও থেকে যেতে পারে—আগেরটির ক্ষেত্রে যেমন সে কাছেপিঠে থেকে গিয়েছিল। তাছাড়া, লাশ সরানোর ব্যাপারটা তো ঘটেছে মাত্র সকালবেলায়, তাও খুব একটা হৈ-হুট্টগোল না করে; বাঘ হয়ত লাশ সরাবার ঘটনাটা জানেই না। কাজেই লাশটা আছে মনে করে এবং খ্যাঁট বসাবার লোভে বাঘ হয়ত বিকেলের দিকে এসে যেতে পারে।

আমি ঠিক করলাম, যেখানে ছেলেটার লাশ পাওয়া গেছে, তার কাছেই একটা জায়গায় কপাল ঠুকে বসে যাব। এই ভেবে বাড়তি প্রলোভন হিসেবে একটা মোষের বাচ্চা নিয়ে বেলা তিনটের খানিকক্ষণ পর সেখানে আমি পৌঁছে গেলাম।

জায়গাটাতে পৌঁছুবার জন্যে বনের ধার থেকে পায়ে চলার একটা রাস্তা ধরে আমি এগোলাম। বনের সেই ধারটাতেই ছেলেটা খুন হয়েছিল। আমি গাছের জঙ্গলের ভেতর হেঁটে গেলাম। সেখানে ঝোপঝাড় কিছু ছিল না, শুধু ছোট ছোট ঘাস। জায়গাটা দেখিয়ে দেবার জন্যে এবং আমাকে মাচা বাঁধায় সাহায্য করবার জন্যে আমার

সঙ্গে ছিল ছেলেটির বাবা এবং গ্রামের আরও দুজন লোক; বনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে তারা দুটো একটা জায়গা দেখাল, যেখানে দেখা গেল বাঘ থেমেছিল এবং জমির এদিক-সেদিকে লাশটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বাঘের পায়ের ছাপ আর পায়ে মাড়ানো ঘাস দেখে মালুম হয়, জমির ওপর সে গড়াগড়ি খেয়েছে এবং 'মড়ি'টার চারদিকে নাচানাচি করেছে—নিশ্চয়ই, আসন্ন ভোজে বসবার ফুর্তির পুলক। কিংবা এমনও হতে পারে যে, বাঘ হয়ত খোসপাঁচড়া জাতীয় কোনো রোগে ভুগছে অথবা তার শরীরের কোনো বেকায়দা ধরনের জায়গায় কোনো ক্ষত আছে, তার জন্যেই মাটিতে বারবার করে তাকে গা ঘষটাতে হয়েছে—এমন একটা সময়ে, যখন মানুষের লাশ মুখে করে নিয়ে সে নিরিবিলিতে যাচ্ছে, যখন তার পক্ষে তড়িঘড়ি পালানো নেহাত দরকার।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আধ মাইলটাক যাওয়ার পর আমরা একটা লম্বাটে ধরনের ছোট ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। জায়গাটা আমাদের সামনাসামনি দেড়শো গজ লম্বা এবং আড়ে তিরিশ থেকে চল্লিশ গজ। বাইরে দিয়ে একটা ছোট সুতোলি নদী পাশ দিয়ে তেরচাভাবে বয়ে এসে জায়গাটাকে হঠাৎ কেটে দুখানা করে দিয়ে চলে গেছে। জায়গাটাতে গাছ আছে মাত্র কয়েকটা। বাকি সবটাই প্রায় দশ ফুট উঁচু উঁচু উলুঘাসে ভর্তি আর তার মাঝে মধ্যে জট-পাকানো ঝোপঝাড়। ছেলেটাকে এই ঝোপের মধ্যে টেনে আনা হয়েছিল।

একটা ভালো শালগাছ পেয়ে গেলাম; যেমনি লম্বা, তেমনি মোটা—তবে পাতা কম। গাছটা নদীর ঠিক ধারে; গাছের ওপর থেকে চারদিকে নজর রাখা যায়। যারা আমার সঙ্গে গিয়েছিল, তারা এই গাছের ওপর একটা চারপাই দড়ি দিয়ে বেঁধেছেঁদে আমার জন্যে চমৎকার বসবার জায়গা বানিয়ে দিল।

সঙ্গীদের গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে আমি গাছে উঠে মাচার ওপর বসলাম। আমার ঘড়িতে তখন ঠিক পৌনে চারটে। সেদিন গরমও

পড়েছে প্রচণ্ড; এই গরমে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে বাঘ তার আস্তানা ছেড়ে বেরোবে বলে মনে হয় না।

আগে সংক্ষেপে বলে নিই, টোপ অর্থাৎ মোষের বাচ্চাটা কোথায় কিভাবে ছিল এবং জঙ্গলের কি রকম জায়গায় আমি ছিলাম, এটা জানলে পরে যা ঘটেছিল তা বুঝতে সুবিধে হবে। নদীর পাড় থেকে প্রায় দশ গজ তফাতে মোষের বাচ্চাটাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। খোলা জমিটার যে ধারটাতে ছেলেটির লাশ বাঘে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, সে জায়গাটা নদীর পাড় থেকে কোণাকুণিভাবে প্রায় চল্লিশ গজ হবে। নদী আর ঝোপের মধ্যেকার ডাঙায় থিকথিক করছে বালি আর কুচো কুচো ঘাসে ভর্তি. মাঝে মাঝে এখানে সেখানে ফুট দুয়েক উঁচু উঁচু ঘাসের চাপড়া। তারপর সেই খোলা জমি শেষ হয়ে গিয়ে টানা ঝোপ।

বিশ তিরিশ গজ চওড়া গাছের একটা জটলা নদীর পাড়সুদ্ধ সেই খোলা জমিটাকে বেড় দিয়ে রয়েছে; আমি সেখানে নদীর পাড়ে গাছের ওপর মোতায়েন হয়ে আছি। যে গাছে মোষের বাচ্চাটাকে বাঁধা হয়েছে, তার সবচেয়ে কাছের গাছে আমি। এই গাছগুলোর নিচে কুচো কুচো ঘাস ভিন্ন কোনো ঝোপঝাড় ছিল না। আমার গাছ থেকে আশী বা একশো গজ উজানে জঙ্গল থেকে খোলা জমির দিকে ঠেলে আসা একপ্রস্থ ঝোপ ছিল। ঝোপঝাড়ের এই টুকরোটা ও-প্রান্তে নদীর পাড়ের সঙ্গে জঙ্গলটাকে জুড়ে রেখেছে; এই দুই আস্তরণের ফালি সমেত জঙ্গলটা এইভাবে একটা অর্ধবৃত্তের আকার ধারণ করেছে, নদীর পাড় যার ব্যাসরেখা।

যে বৃক্ষমেখলার এককোণে আমি জায়গা নিয়েছি, তার গজ কয়েক দূরে ছড়ানো তিন চারটি ঝোপ আমার আর জঙ্গলটার মাঝখানে।

গাছের ওপর বেশ উঁচু জায়গায় আমি বসেছি—মাটি থেকে প্রায় চোদ্দ গজ উঁচুতে, গাছের জঙ্গল অবধি, ঝোপঝাড় ছাড়িয়ে, নদী পেরিয়ে সবদিকে আমার দৃষ্টি যাচ্ছে, আমি এমনভাবে বসেছি যাতে

বন্দুকের মুখ এক কোণ থেকে অন্য কোণে অবাধে ঘোরাতে পারি, যাতে যেকোনো দিকে ইচ্ছেমত গুলি ছুঁড়তে পারি।

আমি এবিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, দিনটা যখন এত গরম গেছে —বাঘ যদি থেকে থাকে, তাহলে প্রথমেই যাবে জল খেতে এবং তারপর আমার টোপের দিকে এগোবে। বাঘ যদি দিনের বেশির ভাগ সময়টা উজিয়ে গিয়ে নদীর জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকে, তাহলেও আমি আশ্চর্য হব না। এটা মনে রেখে, আমি ডানদিকে আধাআধি ঘুরে বসলাম, যাতে গাছের জঙ্গল অবধি পুরো নদীটা আমার চোখের ওপর থাকে। অর্ধেক ঘুরে বসবার আরেকটা সুবিধে এই যে, আমার বাঁদিকে খোলা জায়গাটার বেশ অনেকটা অংশ সহজেই আমি আমার বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পাচ্ছি।

যেখানে যা দরকার মানিয়ে গুছিয়ে নিলাম। ভালো করে দেখে নিলাম নিজেকে আড়াল করতে পারছি কিনা এবং রঙে রং মিশিয়ে বর্ণচোরা হতে পারছি কিনা। সব হয়ে যাবার পর আমার মাথার পেছনে পাতাওয়ালা ডাল এমনভাবে সাজিয়ে দিলাম যাতে জমির ওপর থেকে দেখলে আকাশের গায়ে মাথাটা ফুটে না বেরোয়।

গাছের ওপর নিঃসাড়ে ধীরস্থির হয়ে এমনভাবে বসে থাকবার চেষ্টা করলাম, যেন আমি অরণ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্যেরই একটি অঙ্গ। দীর্ঘবিলম্বিত সেকেণ্ডগুলো গুটি গুটি করে ক্লান্তিকর মিনিটে আর মিনিটগুলো অন্তহীন ঘণ্টায় গি[illegible] পৌঁছচ্ছে। তবু দিন যেন অক্ষয় অব্যয় হয়ে থাকছে, আর রৌদ্রের খরতাপে জীবন যেন রুদ্ধগতি, যেন মুহ্যমান। আবার তেষ্টা পাচ্ছিল। জলের বোতলটা উঁচু করে ধরে ঢক ঢক করে খানিকটা জল খে[illegible] নিলাম। তার আওয়াজে কাছাকাছি একটা গাছে এক[illegible] হনুমান হঠাৎ ভয়ে চমকে উঠল। একটু আগে হনুমানদের যে বড় একটা বাহিনী এসে গাছ দখল করে বসেছিল এটি সেই দলের। হনুমানগুলো এ-ডাল থেকে ও-ডালে, লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে দিল আর সারাক্ষণ খ্যাচ খ্যাচ

করে যে যেখানে আছে সবাইকার মুণ্ডপাত করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর আবার তাদের সুস্থির ভাব ফিরে এল, তিড়িং তিড়িং করে একে একে তারা নদীর খাতের মধ্যে নেমে গেল। গাছের ওপর বসে আমি তাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তারা সিধে লাইন বেঁধে যেখানে গেল, সেখানে নদীর কুলুকুলু ক্ষীণ ধারার শেষে একটা খানাডোবা; জলের ধারাটি ঠিক এই জায়গায় খাতের ওদিক থেকে এদিকে পেরিয়ে এসে গাছের অদূরে পাড়ের গায়ে আছড়ে পড়েছে। সার-সার হনুমান ডোবার জলে মুখ নিচু করে একটানা চোঁ-চোঁ শব্দে জল টানতে লাগল। ওদের মধ্যে একজন ছিল বেজায় দশাসই এবং মোটা; সে তার ল্যাজ উঁচু করে খুব গ্যাট্ ম্যাট্ ফ্যাট্ করে এদিক সেদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার ল্যাজের আগাটা ছিল ওপর দিকে মোড়ানো; একে সে ধুমসো, তার ওপর এমন একটা 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' ভাব যে, তার কঠিন ভারে যেন সে কুঁচকে গিয়েছিল।

ওকে দেখে পৌরসভার এক পালের গোদার কথা আমার মনে পড়ে গেল; শহরের বস্তি এলাকায় পরবের এক উৎসব উদ্বোধন করতে সেই ভদ্রলোক এসেছিলেন। এই হনুমানটি নিজের মহিমায় নিজেই এমন মুগ্ধ হয়ে ছিল যে, যদি তার বক্তৃতা দেবার মত ক্ষমতা থাকত তাহলে পৌরসভার সেই পালের গোদার মতই ভূমিকায় নির্ঘাত সে বলত 'আমি কী হনু'।

আমার খুব মজা লাগছিল। হনুমানটি শুষ্কপ্রায় নদীর চরে আমিরি চালে হাঁটছে আর আমি ঠায় চেয়ে চেয়ে দেখছি।

দেখতে দেখতে আমি এত মশগুল হয়ে পড়েছিলাম যে, নদীর মধ্যে আর কোনো প্রাণীকে আমার চোখেই পড়ে নি। কঁক্ কঁক্ শব্দে একটা ময়ূরের দিকে আমার নজর গেল; দেখলাম খানাডোবাটির উঁচুর দিকে একে একে এসে জড়ো হচ্ছে আরও কয়েকটি ময়ূর। আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে সার বেঁধে একের পর এক তারা জল খেতে ডোবার দিকে আসছে।

পশ্চিমের অর্ধবৃত্তাকার গাছের যে জটলা, তার আড়ালে অনেক

আগেই সূর্য নেমে গেছে। নিজের নানা চিন্তায় বিভোর হয়ে, ডোবার চারিদিকের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে এত বেশিক্ষণ আমি নজর খাড়া করে রেখেছি যে, আমি আমার গাছে চড়ার কারণটাই প্রায় ভুলে মেরে বসে আছি। হঠাৎ মোষের বাচ্চার দিকে নজর পড়ল।

দেখলাম ওর জাবর কাটা থেমে গেছে। ওর মুখ জঙ্গলের দিকে। মাথাটা তুলে এবার তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে, নাক ফুলে উঠেছে, নাকের ফুটো দুটো বড় হয়ে গেছে। দেখলেই বোঝা যায় কেমন যেন একটা ছটফটে ভাব। অথচ চারিদিক শান্ত। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে চেয়ে দেখলাম—না, কোথাও কোনো নড়াচড়া নেই। মোষের বাচ্চাটা কি তবে বাঘের গায়ের গন্ধ পেয়েছে? হাওয়ার তো নামগন্ধ নেই।

তাছাড়া আরও একটা কথা, একটা পাখিও কোনো রকম জানান দেয় নি, একটা জানোয়ারও সভয়ে ডেকে ওঠে নি। এমন কি বন্য জগতের সবচেয়ে সজাগ প্রহরী যে বানরের জাত, যারা সবার চেয়ে উঁচু টং থেকে চৌকি দেয়, তারাও মুখ বুজে রয়েছে। উহু, বাঘ হতেই পারে না—মোষের নজরে পড়েছে আর কিছু।

এতক্ষণে সূর্য অস্ত গেল। জঙ্গল জুড়ে কাছে দূরে অগণিত পতঙ্গের গুন্‌গুন্ আওয়াজ মোষের বাচ্চা তখনও জঙ্গলের সেই একই দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে রয়েছে, এখনও তার সেই ছটফটে ভাব। বলতে না বলতে, বনের মধ্যে বানরকুলের ক্রুদ্ধ গলাবাজি শুরু হয়ে গেল এবং তার দু এক মিনিট পরেই বনের ধারের গাছগুলোর মগডালে তাদের আমি দেখতে পেলাম—তারা বিষম ক্ষেপে গিয়ে এ-ডাল থেকে ও-ডালে হৈ-চৈ করে বেড়াচ্ছে। এবার আর বুঝতে অসুবিধে হল না—বাঘ আসছে।

বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে সিধে করে নিলাম। আমার তখন উত্তেজনায় ফাটো-ফাটো অবস্থা। বুকের ভেতরে কেউ যেন জোরে জোরে দুরমুশ পিটছে। আমার নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। ঠোঁট

শুকিয়ে গেছে। আমার এই রোমহর্ষের পরমায়ু ক্ষণকালমাত্র। পলকের হলেও, সে এক পরম পুলক। তার বিনিময়ে আমার কাছে পৃথিবীর আর কিছুই কিছু নয়।

শ্বাসপ্রশ্বাসটাকে সুস্থির করবার জন্যে বার কয়েক টেনে টেনে দম নিলাম। তারপর যেদিকে গাছের জটলা, তার কাছাকাছি জমির টুকরোটার দিকে তাকিয়ে চোখকান খাড়া রেখে টান টান হয়ে বসে রইলাম। পাঁচ মিনিট কেটে গেল, দশ মিনিট, আরও দশ মিনিট। তবুও বাঘের কোনো চিহ্ন নেই।

কম করে সওয়া পাঁচ কেজি হবে আমার বন্দুকের ওজন। বন্দুকের ভার ক্রমশ আমার হাতে এমন মালুম হতে লাগল যে, হাতে মৃদু কম্প দেখা দিল। তবু বাঘের কোনো চিহ্ন নেই। সামনের দাঁড়ের ওপর বন্দুকটা নামিয়ে রাখলাম, কিন্তু মুঠো ছাড়লাম না। তারপর বোধহয় আরও মিনিট দশেক কেটে গিয়ে থাকবে; যে গাছগুলো থেকে বানরসেনারা তখনও চেঁচিয়ে পাড়া মাত করছিল, হঠাৎ সেই গাছগুলোর তলা থেকে প্রায় হনুমানের আকারের বাদামী-হলুদ রঙের কী একটা যেন বেরিয়ে এল। ঘনায়মান সন্ধ্যার আবছা আলোয় আমি সেটাকে সেই মুহূর্তে হনুমান বলেই মনে করেছিলাম।

একেকবারে বিশ গজ মতন দূরত্ব দ্রুতপায়ে পাড়ি দিয়ে সে মোষের বাচ্চাটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। একেকবার দৌড় দেবার পরই সে প্রায় দু ফুট উঁচু ঘাসের একেকটা চাপড়ার পেছনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ঘাসগুলোর ওপর দিয়ে নয়, পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিয়ে তারপর আবার আগের মত সাঁ করে এগিয়ে আসছিল।

ততক্ষণে আমি দেখে বুঝেছি ওটি বানরকুলোদ্ভব নয়, কিন্তু তখনও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কোন প্রাণী ওটা। ওর ঠ্যাং বা শরীর ঠাহর হচ্ছিল না বলে, ওকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন চলন্ত এক পোঁচ হলুদ-কালো রং।

গোটা এলাকার লোকে যাকে পুরোদস্তুর দুর্দৈব বলে মনে করে,

এই ছোটখাটো অদ্ভুতদর্শন প্রাণীটাই কি সেই জঙ্গলের রাজা দুর্ধর্ষ বাঘ ? এক মুহূর্ত পরেই আমি তার জবাব পেয়ে গেলাম। মোষের বাচ্চাটা খোলা জমির এক প্রান্তে বাঘের ঠিক মুখোমুখি। বাঘ তার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলল। তারপর হঠাৎ সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। দেখলাম ইয়া বড় এক জাঁদরেল বাঘ। মোষটার চারধারে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দুতিন পদক্ষেপে ঝোপের আড়ালে গিয়ে সে গা ঢাকা দিল। আমি যে গাছের এলাকায়, তার কাছেই সেই আগাছার ঝোপ।

গাছগুলোর আড়ালে আড়ালে এগিয়ে বাঘ এবার মোষের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে, এটা আমি পুরো ভেবে রেখেছিলাম। একটা ভয় ছিল এই যে, বাঘ হয়ত আমার গাছ আর নদীর ধারের মাঝখানটা পেরিয়ে পেছন দিক থেকে ছুটে গিয়ে মোষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তা যদি করে, তাহলে মোষের কাছে পৌঁছে তাকে ধরাশায়ী না করা পর্যন্ত আমার গাছ আর তার চারপাশের উঁচু ঘাসের ছায়ায় বাঘ পুরোপুরি আমার অগোচরে থেকে যাবে।

আমার পেছনে নদীর ধারের দিকে আমার গাছের তলায় মট্ করে ছোট একটা ডাল ভাঙার শব্দ হল। বসে থাকার দরুন আমার পক্ষে ওদিকটাতে বন্দুক ছোঁড়া সম্ভব হত না ; এমন কি পেছন ফিরে দেখাও সম্ভব ছিল না—কারণ, তাতে বাঘ আমার গাছে বসে থাকার ব্যাপারটা টের পেয়ে যেত। এক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে বসে থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

আমি বসেই আছি, বসেই আছি, বসেই আছি। বাঘের দেখা নেই। বাঘ যে জায়গায় এসে ঝোপের আড়ালে বেপাত্তা হয়ে গেছে, মোষের বাচ্চাটা একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে আছে। আমি বন্দুক বাগিয়ে ধরে টান টান হয়ে বসে আছি—মোষটা । লক্ষ্য করছি কতক্ষণে বাঘ তার কাছে আসে।

অবিশ্বাস্যরকমের দীর্ঘ সময় ঘেঁষটাতে ঘেঁষটাতে চলে গেল। তবু বাঘ আর আসে না। ততক্ষণে সমস্ত দিক থেকে অন্ধকার ঘনিয়ে

এসেছে এবং চারপাশের পাহাড় আর উপত্যকা আর জঙ্গল ঝেঁটিয়ে এসে আমার সামনেকার খোলা জমিটার ওপর যেখানে যত অন্ধকার ছিল জমা হয়েছে।

চাঁদ উঠবে একটু দেরিতে আর ঘণ্টা দুয়েক পর—এ হল চাঁদনি রাতের গোড়ার পর্বের অন্ধকার। পুরু আর ভারী এই অন্ধকার আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে চারদিকে গাছের জঙ্গল থাকার দরুন। মোষের বাচ্চাটাকে তার মধ্যে আমি অতিকষ্টে ঠাহর করতে পারছিলাম ; সে এখন বসে পড়ে নিশ্চিন্তমনে জাবর কেটে চলেছে, মাঝে মাঝে তার দাঁতে দাঁত ঘষার আওয়াজ পাচ্ছি।

বন্দুকটা ঠেকো দিয়ে রেখে মাচার মধ্যে আমি একটু হাত পা ছড়িয়ে বসলাম। বাঘ পুনদর্শন দেবে, সে আশা আর নেই ; বনের মধ্যে মানুষখেকো বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ অবস্থায় গ্রামের পথে হাঁটা দেবার আমার একেবারেই ইচ্ছে নেই। কাজেই বাধ্য হয়েই এখন এখানে আমাকে বসে থাকতে হবে।

অমন দেখে শুনে স্থিরসঙ্কল্প হয়ে গুটি গুটি এসে বাঘ শেষ বেলায় কেন এড়িয়ে চলে গেল ? এ প্রশ্নের তো কোনো জবাব খুঁজে পাচ্ছি না। আমি এটুকু বলতে পারি যে, বাঘের এই পালানোর পেছনে আমার কোনো হাত ছিল না। আমি বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করি নি, এতটুকুও আওয়াজ করি নি ; কাজেই এমন নয় যে, গাছের ওপর আমার উপস্থিতি বাঘ টের পেয়ে গিয়েছিল। আমি যে গাছে বসে ছিলাম, অচ্ছেদ্যভাবে তার অঙ্গীভূত হয়ে গিয়ে চারপাশের পত্রজালের ভেতর নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে ছিলাম ; কোনো মানুষ বা জন্তুর পক্ষে, তা সে যত চতুরই হোক, আমাকে আমার আবেষ্টনী থেকে আলাদা করে ধরা সম্ভবই ছিল না।

এর একমাত্র যুক্তি হয়ত খুঁজে পাওয়া যেতে পারে মানুষখেকো হিসেবে তার অর্জিত স্বভাব আর রুচির মধ্যে। অথবা এমনও হতে পারে যে, ওর কোনো শারীরিক বৈকল্য থাকায় মানুষের চেয়ে বেশি বড় এবং বেশি শক্তিমান কোনো প্রাণীকে পেড়ে ফেলার ওর

সামর্থ্য নেই—অবশ্য তেমন কোনো লক্ষণ আমি তো খুঁজে পাই নি।

মোষটার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার কোনো অভিপ্রায়ই বাঘটার হয়ত ছিল না। সমস্ত মাংসাশী এবং বেশির ভাগ জংলা জানোয়ারের স্বভাবসুলভ অদম্য কৌতূহলের বশেই সে মোষটার দিকে এগিয়েছিল। তার গুড়ি মেরে আসাটা সহজাত প্রবৃত্তির ব্যাপার। এ বাঘটা ছিল পুরোদস্তুর মানুষখেকো—গোমাংসে কিংবা ছাগমাংসে তার কোনো রুচি ছিল না।

একটা কথা ভেবে আমার খুব মজা লাগছিল। প্রায় সত্তর গজ দূরে বাঘের যখন আবির্ভাব হল, তখন তাকে কি রকম কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, একটা প্রকাণ্ড অজগরের মাথা সব্ সর্ করে যেন আমার এদিকে এগিয়ে আসছে। সামনের দুটো পা-বা শরীরের তলায় পড়ে যাওয়া এবং পেছনের দিকটা অংশত গুটিয়ে গিয়ে মাথার ওপর এসে পড়ার জন্যেই যে অমন দেখাচ্ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তার ফলে ওকে সিড়িঙ্গে দেখাচ্ছিল এবং আলো-আঁধারিতে ওর মুণ্ডু ছাড়া আর কিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না।

ছোট পাখি ধরার জন্যে বেড়ালকে যাঁরা মাটিতে পেট ঠেকিয়ে গুড়ি মেরে ঘাসের ওপর দিযে পা টিপে টিপে যেতে দেখেছেন, তাঁরা আমার দেখা বাঘের চলনটা ভালো বুঝতে পারবেন।

গুড়ি মেরে চলার সময় বাঘটাকে কতটুকুন দেখাচ্ছিল। তাকে ঐ ছোট দেখানোর ব্যাপারটাই আমাকে সবচেয়ে অবাক করেছিল। ব্যাপারটার মর্ম উপলব্ধি করতে গেলে মনে রাখতে হবে—আমি অনেকটা উঁচু থেকে নিচের দিকে দেখছিলাম, তা সত্ত্বেও ওর দুটো কানের ফাঁকে পেছনের নামমাত্র অংশ আমার চোখে পড়ছিল। মাটিতে দাঁড়িযে দেখলে বাঘের মুণ্ডুটা ছাড়া হয়ত আর কিছুই আমি দেখতে পেতাম না। বাঘের দেহাগ্র ঢাকা পড়ে এমন যেকোনো ঘাসের চাপড়ার পেছনে বাঘ এইভাবে অনায়াসে আত্মগোপন করে থাকতে পারে।

বাঘ তার মাথাটাকে যেভাবে রেখেছিল, সেটাও একটা লক্ষণীয় ব্যাপার। রাস্তায় হাঁটা বাড়ির পোষা বেড়ালের মত বাঘ সাধারণত যেভাবে নাক উঁচিয়ে হাটে, সেই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সে তখন হাঁটছিল না। শরীরের সঙ্গে তার মুখটা ছিল খাড়াভাবে, চিবুকটা ভেতরের দিকে টানা আর কপালটা সামনের দিকে ঠেলে দেওয়া—ফলে পেছনকার ডোরা আর দাগগুলো প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছিল। ওর বিদ্‌ঘুটে ধরনের দেহভঙ্গির সঙ্গে বুক-হিম-করা ড্যাবডেবে চোখের স্থির চাহনি যুক্ত হয়ে ওকে আরও এক বিভীষিকার মত দেখতে হয়েছিল।

মোষের বাচ্চা তাকে যাতে দেখতে না পায়, সে চেষ্টা বাঘ যতক্ষণ পারে করেছে। কিন্তু যখন তার চোখে ধরা পড়ে গেছে, তখন বাঘকে দেখাচ্ছে এক অদ্ভুতদর্শন প্রাণী—এই ভোল বদলে বাঘের শিকার ধরতে সুবিধে হয়। আমি বেশ বুঝতে পারি, কোনো হরিণ যখন দেখে একটা বিচিত্র চেহারার প্রাণী মাটির ওপর গুড়ি মেরে মেরে তার দিকে এগিয়ে আসছে—তখন হয়ত কিছুটা বিস্ময়ে, কিছুটা মোহগ্রস্ত হয়ে দু এক মুহূর্ত সে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে চেয়ে দেখবে; আর বাঘ সেই সুযোগে তার কাছে এসে এমন একটা সময়ে তার দিকে তেড়ে আসবে, যখন বেচারা হরিণের পক্ষে পেছন ফিরে আর পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

বাঘকে গুলি করতে না পেরে স্বভাবতই আমার বেজায় মন খারাপ হয়ে গেল। এইবার নিয়ে এই দুবার সে এল, কিন্তু দুবারই আমার চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়ল।

জ্যান্ত টোপ রাখলে, সব সময়ই বাঘ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া অবধি অপেক্ষা করা ভালো—আগেকার কয়েকবারের অভিজ্ঞতা থেকে এটা আমি শিখেছি। শিকারকে খতম করার পরও তার টুঁটি শক্ত করে কামড়ে ধরে বাঘ কয়েক সেকেণ্ড ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে—যতক্ষণ না তার বুকের ধুকপুক একেবারে থেমে যাচ্ছে। বাঘের এই অপেক্ষা করে থাকার সময়টা লক্ষ্য স্থির করে গুলি করার পক্ষে

প্রশস্ত ; তাছাড়া বাঘের তখন অন্যদিকে নজর ; বন্দুক ঘাড়ে তোলার ব্যাপারটা তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

কিন্তু এই অভিজ্ঞতার পর থেকে আমি সব সময়ই বাঘ দেখা দেওয়ার এবং বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে বন্দুক বাগিয়ে ধরি, যাতে সে হঠাৎ ঘুরে গেলে এবং চলে যাবার উপক্রম করলে তৎক্ষণাৎ গুলি করতে পারি।

৭

আমি আরও তিনদিন সেই অজ পাড়াগাঁয়ে থেকে গেলাম ; হানাদার এই রাহুর গ্রাস থেকে এলাকাটিকে বাঁচাবার জন্যে এই তিনদিন আমি চেষ্টার কসুর করি নি। রোজ সকাল থেকে বিকেল আমি বনে বনে ঘুরেছি এবং সন্ধ্যেবেলায় বেরিয়ে পড়ে বনের রাস্তা আর পায়ের দাগের কাছাকাছি কোনো জায়গায় বাঘের পথ চেয়ে অনেক রাত অবধি জেগে বসে থেকেছি।

যদিও জানতাম এ তল্লাটে বাঘের থাকবার আর কোনো সম্ভাবনা নেই, তবু যদি গুলি করার কোনো মওকা মিলে যায়—এই বৃথা আশা নিয়েই বনে বনে ঘুরতাম আর ওৎ পেতে বসতাম। অবশ্য আমি এও জানতাম যে, বাঘের খিধের উদ্রেক হতে এখনও তিন চারদিন লাগবে। আর দু তিন দিনের মধ্যে বাঘ যে আবার হামলা করবে, তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এবার কোথায় ? কোন্ গাঁয় ?

আমার পক্ষে এমন কি আঁচ করাও সম্ভব হল না।

চারদিনের দিন আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যাওয়ায় আরও মুশকিল দাঁড়িয়ে গেল। যেন বাতাসের কড়া চাবুকের তাড়া খেয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ বাষ্পের বিপুল ঘনঘটা অনেকখানি উঁচু দিয়ে তরতর করে বয়ে চলেছে হিমালয়ের দিকে। মাটির কাছাকাছি আবহাওয়া শান্ত ; কিন্তু মনে হচ্ছে এখুনি বৃষ্টি এসে পড়বে, হয়ত আর এক ঘণ্টার মধ্যেই। কয়েক ফোঁটা ইতিমধ্যেই পড়েছে।

এর আগের কয়েক সপ্তাহ আকাশ ছিল ঝকঝকে পরিষ্কার ;

দিনগুলো ছিল উজ্জ্বলতম আর প্রখরতম গ্রীষ্মের দিন। এখন মনে হচ্ছে আবহাওয়া আর আগের মত থাকবে না। একমাস আগেই এবার অকালে বর্ষার মরশুম এসে গেল।

বাঘের আশায় ওৎ পেতে বসে থাকার দিক দিয়ে বৃষ্টিবাদ্‌লায় ভারি অসুবিধে। জল পড়ার শব্দে ছোটখাটো সব অর্থপূর্ণ শব্দগুলো চাপা পড়ে যায়। বৃষ্টিপড়া বন্ধ হয়ে গেলেও, পাতা থেকে টুপটাপ করে জল পড়তে থাকায় একাকী শ্রোতার পক্ষে কোন্‌টা সত্যিকার, কোন্‌টা বা মনগড়া নড়াচড়ার শব্দ—এসব বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়ে। আবার এর কিছু কিছু সুবিধেও আছে; অলক্ষিতে জানোয়ারের ডেরায় গিয়ে যিনি শিকার করতে চান, বর্ষায় তার বিশেষ সুবিধে। নরম মাটিতে থাবার দাগ আর পায়ের চিহ্নগুলো খুব পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে; ঝরা পাতা আর খড়খড়ে ঘাস ভিজে থাকায় শিকারী নিঃশব্দে তার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে।

মেঘের ঘনঘটা দেখে সর্দারজী আবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন; দেখলাম তাঁর কপালে আবার একটি মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে।

ভারাক্রান্ত মনে পুন্নুর শোকাতুর মামা-মামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফেরার জন্যে রওনা হলাম। পুন্নুদের গ্রামের উপর দিয়ে আমাদের যেতে হবে। ঠিক করলাম ঐ গ্রামে ঘণ্টা দুই থেকে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে তারপর আবার চলতে শুরু করব।

পুন্নুদের গ্রামে আমরাও পৌঁছেছি আর বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেল একেবারে প্রচণ্ডরকমের মুষলধারে। রাস্তায় ভিজে যাওয়ার হাত থেকে আমরা খুব জোর বেঁচে গেলাম। বিকেল তিনটে নাগাদ বৃষ্টি ছেড়ে আসায় আবার আমরা বেরিয়ে পড়তে পারলাম। জল পড়ে মাটি এত নরম হয়ে গিয়েছিল যে, আমার ঘোড়ার গোড়ালি অবধি কাদায় ডুবে যাচ্ছিল; যেখানে যেখানে মাটি শক্ত ছিল, সে সব জায়গায় রাস্তা এত পিছল হয়ে পড়েছিল যে প্রতিপদেই আমাদের আছাড় খেয়ে পড়বার ভয় হচ্ছিল—বিশেষ করে, আমার ঘোড়ার পায়ের নাল অনেক দিনের পুরনো; ওগুলো অনেক আগেই পাল্টে ফেলা উচিত

ছিল। পুন্নুদের গ্রাম ছেড়ে তিন মাইল পথও এসেছি কি আসি নি, এমন সময় আমাদের মাথার ওপর বজ্রবিদ্যুৎ নিয়ে ভেঙে পড়ল ঝড় আর সেইসঙ্গে আকাশ ফুটো হয়ে বৃষ্টি। হুড়মুড় করে আমরা কাছাকাছি একটা ছোট গাঁয়ে মোড়লের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। এসব অঞ্চলে আগে বহুবার শিকারে এসেছি, কাজেই এ গাঁয়ের মোড়লের সঙ্গে আগে থেকেই আমার চেনাপরিচয় ছিল।

বৃষ্টি যখন ছাড়ল তখন রীতিমত সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ফলে সেদিন আর আমরা রওনা হতে পারলাম না। মোড়ল দিলদরাজভাবে অতিথিসেবার ব্যবস্থা করলেন এবং রাত্তিরটা আমাদের পক্ষে যথাসম্ভব সুখকর করে তুললেন। আমার এলাকার সব পাহাড়ী মানুষের মধ্যেই আতিথেয়তার এই অপূর্ব ধারা চিরবহমান। তারা দরিদ্র অজ্ঞ গ্রামের মানুষ, কিন্তু যেমনি মানী তেমনি দিলদার; খানাপিনা বাবদ আপনি যদি টাকা ধরে দিতে যান, তাহলে সেটাকে তারা চূড়ান্ত অপমান বলে মনে করবে।

মোড়লের নাম ধ্যান সিং। সেদিন আমি আর ধ্যান সিং, আমরা দুজনে অনেক রাত অবধি গণ্ডীবদ্ধ গ্রামজীবনের যাবতীয় বিষয় নিয়ে কথা বললাম। দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষতার বাইরে বাকি যে পৃথিবী, এ তল্লাটের মানুষের কাছে তার কোনো অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। ফসল হওয়া বা না হওয়া; পুলিশ, বনপুলিশ, তহসিলদার আর বন্য জানোয়ারের পীড়নদমন ইত্যাদি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ আর মহামারী সংক্রান্ত দেবদেবীর ভজনপূজন ইত্যাদি— জীবনে সমস্যা বলতে এ ছাড়া কিছু তারা জানে না।

জন্মেও এ সব গ্রামে কেউ কখনও দৈনিক কাগজের মুখ দেখে নি; নিজেদের নিছক দিন গুজরানোর সমস্যার সঙ্গে যার যোগ নেই, তেমন কোনো খবরে, সে খবর হাজার অর্থপূর্ণ হলেও, এরা কোনো আগ্রহ বোধ করত না। গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যাপারে তাদের খুব বেশি কষ্ট করতে হত না, অন্তত সেকালে তো নয়ই এবং তুলনায়ভাবে একালেও তাই। সামান্য সংস্থান নিয়ে তারা মোটের ওপর হেসে

খেলেই দিন কাটাত; সত্যিই, আপন খুশিতে তারা বুঁদ হয়ে থাকত।

বনের জন্তুরা গ্রামবাসীদের ফসলের ক্ষেতে কি রকম দৌরাত্ম্য করছে, ধ্যান সিং সে সম্পর্কে আমাকে বললেন। গমক্ষেতে ঢুকে জানোয়ারগুলো এমনভাবে গাছ নষ্ট করেছে যে, যা আশা করা গিয়েছিল তার অর্ধেক ফসলও চাষীরা পাবে না। ফি বছরই এ জিনিস ঘটে, তবে এ বছর ক্ষতিটা অনেক বেশি হয়েছে। ফসল যখন প্রায় পেকে উঠেছে, মাঠে যখন আরও বেশি নজর রাখা দরকার সে সময় ভগবানের মার হিসেবে শুরু হল মানুষখেকোর উৎপাত। সূর্য ডোবার পর কেউ ঘরের বাইরে যেতে পারে না; তার ফলে, জংলা জানোয়ারের দল—হরিণ, শম্বর, শুয়োর—ফসলের ক্ষেতগুলো অবাধে মুড়িয়ে খেতে লাগল; সারারাত তো বটেই, সকাল বিকেলেরও বেশির ভাগ সময়।

ধ্যান সিং বললেন, 'দিন দিন আমাদের চোখের ওপর আমাদের ফসল চলে যাচ্ছে। আমরা নিরুপায়; ঠেকাতে পারছি না। জংলা জানোয়ারগুলো নিজেদের ইচ্ছেমত গাছপালা শাকসব্জির ভুষ্টিনাশ করে ছেড়ে দিচ্ছে—যা ওরা না খায়, সেগুলোও পা দিয়ে মাড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। দেবতাদের রাগ পড়াতে যেন এও যথেষ্ট হয় নি, তাই এর ওপর এক কাঁচাখেকো এসে হাজির হয়েছে; একটি কচি মেয়ে গরুর ঘাস কাটতে জঙ্গলে গিয়েছিল, ও তার ঘাড় মটকেছে।

'আমাদের, ভায়া, ভারি খারাপ সময় যাচ্ছে এখন', তিনি বলে চললেন, 'দেবতারা আমাদের ওপর চটে গেছেন। কেন এবং কার পাপে, তা আমি জানি না। আমরা নানাভাবে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করার চেষ্টা করেছি। পুরুতের কথামত পালা করে কালো ছাগল আর সাদা ছাগল কয়েকবার বলি দিয়েছি। পুজো দিয়েছি, নৈবেদ্য দিয়েছি, প্রায়শ্চিত্ত করেছি। আমি এমন কি আমার ডানহাতের বুড়ো আঙুলের রক্তে দেবতার পায়ে অঞ্জলি দিয়েছি—আমার আঙুল কেটে পুরুতঠাকুরই সে রক্ত বার করেছে। কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের

দুঃখের রাত যেন আর পোহাবে না। কাঁচাখেকোটা সমানে তর্জন-গর্জন চালিয়ে যাচ্ছে; আমরা কিছুতেই তা রদ করতে পারছি না। এমন কি, ভায়া, তুমিও কিচ্ছুটি করতে পারলে না। তুমি যে পারবে না, এ আমি জানতাম। অপদেবতাকে মারে সাধ্যি কার? দেবতাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ কি যেতে পারে? এ সবই নিয়তি।'

আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ি নি; তাঁর মূঢ় বিশ্বাসের কথা শুনে হাসিও নি। তাঁকে সমীহ করে আমি আমার মনের অবিশ্বাস মনেই পুষে রেখেছি। তার বদলে আমি তার কাছ থেকে শুনতে চাইলাম তাঁর পুরনো দিনের সব শিকারের গল্প।

মোড়ল খোদ্ নিজে ভালো শিকারী ছিলেন; জোয়ান বয়সে নানারকম দুঃসাহসিক কাজ করেছেন। আমার কথায় তাঁর ঠোঁটের কোণে হাসি খেলে গেল—অতীতের যে অন্তর্দেশে নিহিত হয়ে আছে তাঁর বেপরোয়া যৌবন, সেখান থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠা মনোরম অমায়িক হাসি। সে রাত্রে তিনি কত যে গল্প আমাকে বললেন। এক-নলা গাদা বন্দুক হাতে অকুতোভয় অভিযানের সব গল্প। সমস্তই বললেন নিচু গলায়। তাঁর ব্যক্তিগত সাহসের জায়গাগুলো সারলেন নমো নমো করে।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'আচ্ছা মোড়ল চাচা, সবাইকেই তো খুব গদ্‌গদ হয়ে বলতে শুনি যে বন্দুকে আপনার আশ্চর্য হাত আর শিকারে আপনার অদ্ভুত হাতযশ; তাহলে জংলা জানোয়াররা এসে আপনার আর আপনার পাড়াপড়শীদের ফসলের ক্ষেতগুলোর এই সর্বনাশ করছে—কেন এটা হতে দিচ্ছেন?'

তাঁর মান্ধাতার আমলের পুরনো গাদা বন্দুকটা দেয়ালের গায়ে টাঙানো ছিল। যত্নে রাখা বন্দুকটার বেশ পরিষ্কার পরিপাটি তেল চকচকে চেহারা। সতৃষ্ণ নয়নে সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মোড়ল বললেন অনেক দিন আগেই তিনি শিকার করা ছেড়ে দিয়েছেন।

আমি বললাম, 'আপনি তো বাঁচাচ্ছেন আপনার ফসল, শিকার

করছেন কোথায়? নিজের জান-মাল রাখতে অস্ত্র হাতে নেওয়া আইনের চোখেও অপরাধ নয়, ভগবানের চোখেও পাপ নয়। আপনি তো তা জানেন। জানেন না, চাচা?'

মোড়ল বললেন, 'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু আইন কে করেছে? কেই বা জানে ভগবান কিসে খুশি হন, কিসে হন না? আমি অবিশ্যি অন্য একটা কারণে শিকার ছেড়েছিলাম। একবার, বুঝলে, ভুল করে একটা মাদী হরিণ মারি। কাটার পর দেখি তার পেটে বাচ্চা ছিল। ব্যাপারটা বিশ্রী, কিন্তু আমার ইচ্ছাকৃত নয়। পেটের ফুলটা ফেলে দিয়ে মরা হরিণটা বাড়ি নিয়ে এলাম। ওর মাংস আমরা রেঁধে খেয়েছিলাম; কেননা না খেলে সেটা হত আরও বেশি পাপ কাজ। কিন্তু, বিশ্বাস করো, সেদিন মুখে আমার একটুও ভালো লাগে নি। দিনগুলো আমার কাছে বিস্বাদ হয়ে উঠল। কেবলি নিজের অপরাধের কথা মনে হত। খাওয়ায় আমার রুচি চলে গেল।

'আর তারপর, সেই হরিণটাকে মারার দিন কয়েকের মধ্যে, আমার একটা ডাকসাইটে সুন্দর মোষ হঠাৎ খাবি খেয়ে মরে গেল। তার শোক সামলাতে না সামলাতে আমার হালের বলদটাকে একটা চিতাবাঘে মারল। সন্ধ্যেবেলা 'মড়ি'র কাছে চিতাবাঘটাকে গুলি করে জখম করলাম। পরদিন সকালেই তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। বাঘটা আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে এমনভাবে আমাকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিল যে লোকে ভেবেছিল আমি আর বাঁচব না। প্রায় এক বচ্ছর আমি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারি নি। যখন আমি সবে সেরে উঠেছি, ঠিক সেই সময় আমার স্ত্রীকে পাগলা শেয়ালে কামড়াল এবং এক মাসের মধ্যে জলাতঙ্ক রোগে সে মারা গেল।

'আমার একটার পর একটা দুর্দৈব ঘটতে লাগল। আর এ সমস্তই ঘটতে শুরু করেছিল সেই বাচ্চা-পেটে হরিণটাকে মারবার পর থেকে। বুঝতেই পারছ, আমার তখন কী মনের অবস্থা। নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে পুজো-আর্চা শান্তিস্বস্ত্যয়ন করতে

শুরু করে দিলাম। তারপর একদিন স্বপ্নের মধ্যে চণ্ডী এসে দেখা দিয়ে বললেন শিকার করা ছেড়ে দিতে। সেই যে ছাড়লাম, আর আমি বন্দুক হাতে করি নি।'

সাদামাঠা কথা। তাতে কেতাবী মনের কেতাদুরস্ত কোনো ভাব নেই। কথাগুলো আমার হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তাঁর মূঢ় বিশ্বাসের মধ্যে যুক্তিতর্কের কোনো বালাই ছিল না; কিন্তু সেই বিশ্বাস তাঁকে সমবেদনা আর অনুকম্পার এমন এক বসুধৈব কুটুম্বিতার স্তরে উত্তীর্ণ করেছিল, যে উত্তরণ যুগে যুগে প্রকৃষ্ট চিন্তা আর দুরূহতম ভাবধারার লক্ষ্য। একটা মামুলি ঘটনা—অন্তঃসত্ত্বা এক হরিণী বধ, তাও ভুলবশত—এ ঘটনায় ক'জন লোক, এমন কি খুব বইকেতাব পড়া রুচিবান, যাঁরা আধুনিক শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও বা ক'জন—এতে সাড়া দিয়ে জীবনের ধারা বদলে ফেলতেন?

আমাকে চিন্তামগ্ন দেখে ধ্যান সিং চাচা প্রসঙ্গ বদলে ফেলে আমাকে বললেন তাঁর বকবকানি আমি যেন গায়ে না মাখি।

চোখ পিটপিট করে তিনি বললেন, 'বুঝলে ভায়া, বুড়ো হওয়ার এই এক ঝকমারি। কেবল আমি আমি ভাব হয়, ভীমরতিতে পেয়ে বসে আর তার চেয়েও খারাপ, বুড়োরা ব'কে লোকজনদের কান ঝালাপালা করে—সারাক্ষণ শুধু নিজের কথা, জগৎ যেন কেবল সে আছে বলেই চলে। এই আমার কথাই ধরো না কেন। এতক্ষণ ঘ্যানর ঘ্যানর করে কেবল নিজের কথাই বলে গিয়েছি। আমার কথায় তুমি কিছু মনে করো না। বুনো জানোয়ারদের হাত থেকে পাড়াপড়শীদের ক্ষেতের ফসল বাঁচাতে পারি নি বলে আমাকে তুমি খারাপ ভেবো না—তেমনি তুমি শিকার ভালোবাসো বলে তোমাকেও আমি খারাপ ভাবি না। যে যা ভালোবাসে, যে যা বোঝে—তাকে সেইমত চলতে দেওয়া উচিত। দু জনের মত আলাদা বলে তাদের মধ্যে ভাব চটে যাওয়া উচিত নয়।

'যাও, এবার গিয়ে শুয়ে পড়ো। অনেক রাত হয়ে গেছে।

ব'কে ব'কে কান ঝালাপালা করেছি, বোকা বোকা কথা বলেছি- বুড়োকে ক্ষমাঘেন্না করে নিও।'

বৃষ্টি ছেড়ে গেছে। ভোরের কোলে শান্ত সমাহিত রাত্রি। অনেকক্ষণ অবধি আমার চোখে ঘুম এল না ; শুয়ে শুয়ে ধ্যান সিং চাচার অখণ্ড অচঞ্চল জ্ঞানবৃদ্ধ কথাগুলো আমার কানে বাজতে লাগল।

মানুষে মানুষে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্যে আমরাও চেষ্টা করছি না কি? এ যুগের মহত্তম মনীষীরা এই সমস্যা সমাধানের জন্যেই মনপ্রাণ ঢেলে দিচ্ছেন না কি? তবু তাঁদের চিন্তায় এত বেশি জট আর তাঁদের কাজে এত প্রতিকূলতা যে, তাঁদের অন্ধকারে হাতড়াতে হচ্ছে। কিন্তু পাণ্ডববর্জিত গাঁয়ের এই বুড়ো, যার কখনও লেখাপড়া শেখার সুযোগ হয় নি, সভ্যতা সংস্কৃতির কথা যে মুখেও আনতে পারে না, সে কিন্তু তার প্রাণিকুল আর কুসংস্কারের সঙ্কীর্ণ জগতে সেই প্রাজ্ঞতা খুঁজে পেয়েছে—শান্তিতে থাকার প্রাজ্ঞতা। সে তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় এবং প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তের কর্মে ফুটিয়ে তুলছে সেই প্রাজ্ঞতা।

৮

আমাদের এলাকার লোকে সাধারণভাবে আমিষাশী এবং ধ্যান সিং চাচার গাঁয়ের লোকজনেরাও তাই। কিন্তু হিমাচল প্রদেশের পাহাড় অঞ্চলের দেহাতী লোকদের মতই এরা এত গরিব যে মাংস খেয়ে শখ মেটানোর এদের সামর্থ্য নেই।

এদের এতই টেনেটুনে সংসার চালাতে হয় যে, মাংস কিনে খাওয়া সম্ভব হয় না, আবার নিজেদের ছাগলমুরগি মেরে খাবে যে তাও অভাবের দরুন পেরে ওঠে না—একমাত্র বিয়েশাদি আর পালেপার্বণে ছাড়া। কাজেই মাঝেমধ্যে খাওয়ার পাতে মাংস জোটানোর তাদের একমাত্র উপায় হল শিকার।

শুয়োর, শজারু আর হরিণ সে সময়ে প্রচুর পাওয়া যেত ; ঐ সব জানোয়ার ঘুরতে ঘুরতে চাষের ক্ষেতে এসে পড়লে কচিৎ কদাচিৎ কেউ হয়ত তাদের দুটো একটাকে গুলি ক'রে মারত। আমাদের এলাকায় রেওয়াজ ছিল—আমিও তা মেনে চলতাম—বনের জানোয়ার যার গুলিতেই মরুক, মাংসের ভাগ পাবে সবাই। কারো বন্দুক থাক না থাক, গ্রামের ইতরভদ্র সবাই এইভাবে খাওয়ার পাতে হরিণের বা শুয়োরের মাংসের সংস্থান করতে পারত।

কিন্তু মানুষখেকোটা এই এলাকায় পা দেবার পর থেকে সন্ধ্যের পর এমন কি নিজেদের ক্ষেতখামারে যেতেও কেউ আর সাহস করে উঠতে পারছে না। ফলে, বেশ কিছুদিন যাবৎ বনের পশুশিকার একেবারেই বন্ধ এবং গ্রামের সমস্ত লোক এক টুকরো মাংসের জন্যে বুভুক্ষু হয়ে আছে।

আমি মনে মনে বিলক্ষণ তা জানতাম। আমি বললাম সকালে চলে যাওয়ার আগে একটা-দুটো হরিণ কি শুয়োর শিকার করা যাক, গ্রামের লোকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে। আশেপাশে যারা ছিল, সর্দারজী অবধি—দেখলাম আমার প্রস্তাবে সকলেই রাজী। শুধু তাই নয়, সর্দারজী বললেন তিনি স্বয়ং তাঁর বন্দুক নিয়ে আমার সঙ্গে যাবেন এবং শিকারের কাজে আমাকে তিনি সাহায্য করবেন।

কাছেই এক জমিদারের একটা বন ছিল। সে বনটা বনবিভাগের এক্তিয়ারের বাইরে। আমি দেখলাম সেই বনে গেলে চটপট শিকার করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসা যাবে।

এই জঙ্গলটা ছিল অনেকটা খোলামেলা ; খুব বেশি ঠাসবন্দী ঝোপঝাড় ছিল না, আবার বড় বড় গাছপালাগুলো খুব ঘনবদ্ধ হয়েও ছিল না। সেখানে বেশির ভাগটাই ছিল কুচোকুচো ঘাসে ভর্তি ; তার মাঝখানে খানিকটা করে জটলাবদ্ধ কাঁটাঝোপ আর এখানে সেখানে খুচখাচ বড় বড় গাছের বনস্থলী। চাষের ক্ষেতের যে এলাকা, তার প্রায় গায়ে গা দিয়ে রয়েছে এই বনাঞ্চল। দুয়ের

মাঝখানে শুধু এককালি সবুজ জমিতে ছন্নছাড়া হয়ে জেগে আছে আজেবাজে কয়েকটা গাছ—যেমন : তুন, রুনি, চিল্লা আর চাল।

অমন ন্যাড়া জায়গায় এবং লোকবসতির এত কাছে সাধারণত শিকার পাওয়া যায় না। কিন্তু মানুষখেকো বাঘের ভয়ে লোকে বেশির ভাগ সময় ঘর ছেড়ে বেরোচ্ছিল না বলে আমি এটা ধরেই নিয়েছিলাম যে, শিকারের জন্তুজানোয়াররা নির্ভাবনায় এখন আবাদী এলাকায় যথাসম্ভব কাছাকাছি থাকবে।

সেই বিশ্বাসে সকালে ছ-টার একটু পরে আমি সেই জঙ্গলে গিয়ে হাজির হলাম। আগের রাত্রে বৃষ্টি হওযায় গোটা এলাকাটি ছিল জলে ভেজা এবং আবহাওয়াটি ছিল ভারি স্নিগ্ধ। পায়ের তলায় পুরু হয়ে বিছানো ঝরা পাতা আর শুক্‌নো-খড়খড়ে ঘাসের আস্তরণগুলো ছিল নরম ভিজে-ভিজে। তার ওপর নিঃশব্দে হাঁটা যায়। মাথার ওপর গাছের ডালগুলো থেকে টুপটাপ টুপটাপ করে জল পড়ার শব্দে আর জমির ওপর আড়াআড়ি ছোট্ট স্রোতস্বিনীর মধুর কলতানে সারা বন তখন প্রাণোচ্ছল।

দলে আমরা ছিলাম চারজন. বন্দুকধারী আমি আর সর্দারজী, এবং মঙ্গলদের গ্রামের ফুলবাবু জেন্দু আর আমার ভৃত্য। শেষের দুজনের ওপর ভার ছিল সেই ভাগ্যহত সকালে জঙ্গল পিটিয়ে হরিণ আর শুযোর খেদানোর। আমার কাছে ১২-বোরের বন্দুক, দুটো নলেই গুলি ভর্তি সর্দারজীরও তাই। আমার ভৃত্যের হাতে আমার দোসরা বন্দুক 'প্যারাডক্স', সেটা গুলিভরা ছিল না। দু ঘণ্টার মধ্যে রোগাপটকা জঙ্গলটার অর্ধেক আমরা পার হযে এলাম। আমরা খানিকটা ধারাবাহিকভাবে এগোচ্ছিলাম। বনের ধার দিয়ে দিয়ে আমার বন্দুক নিযে অলক্ষিতে এগিয়ে আরম্ভের জায়গা থেকে শ' দুই গজ দূরে গিযে দাড়িয়ে খেদাড়েদের এসে পড়ার জন্য অপেক্ষা করব। ওরা আসবে বনের ভেতর দিয়ে প্রত্যেকটা ঝোপে ঢিল ফেলতে ফেলতে আর আসার পথে প্রত্যেকটা কোণাঘুপ্‌চি পাঁতি পাঁতি করে খুঁজে দেখে। হুড়মুড় করে এক অংশ দেখা শেষ করে

তার পরের অংশ—এমনি ক'রে আধাআধি এসেও এমনকি একটা খরগোশের আমরা টিকি দেখতে পেলাম না।

আমরা একটু দমে গেলাম, কিন্তু হাল ছাড়লাম না। পরের জঙ্গলটাতে যাবার আগে শেষ পর্যন্ত খেদানোর কাজ চালু থাকল। কতকটা ফাঁকাগোছের পরের টুকরোটা ধরা হল ; তাতে মাত্র গোটা কয়েক কম ঘন ঝোপঝাড় আর ডজন দুয়েকের মত ক্ষয়াখর্বুটে ধরনের গাছ ছিল। তার এক কোণে ছিল ছোট একটা খোয়াই, সেটা সাপের মত ওপাশে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে; খোয়াইটা দিয়ে কাল রাত্রের বৃষ্টির জল গড়িয়ে গিয়ে পড়ছে কাদাগোলা একরত্তি একটা নদীতে। শুকনোর সময় এই খোয়াইটা দু একটি প্রাণীর আশ্রয়স্থল হতে পারত। কিন্তু জলকাদা থাকায় এখন আর তার সম্ভাবনা নেই।

আমাদের যেহেতু আরও এগিয়ে যেতে হবে এবং খোয়াইটা আমাদের পথেই পড়ছে, সেইজন্যে আমরা সেটা খেদাবার কথা ভাবলাম এবং সেই অনুসারে যে যার জায়গামত দাঁড়িয়ে গেলাম—বন্দুকধারীরা আগে আর খেদাড়েরা পিছে আরম্ভস্থলে।

ধার দিয়ে দিয়ে এগিয়ে আমি চলে গেলাম খোয়াইয়ের ও-প্রান্তে। খোয়াইয়ের দুধারে পঞ্চাশ গজেরও বেশি একটা সমতল ঘাস জমি। জমিটার মাথায় প্রায় হাত তিরিশেক দূরে ছোট এই উইঢিবি। তার আড়ালে আমি ওৎ পেতে থাকলাম। ফাঁকা জায়গার এদিক থেকে ওদিকে ছড়ানো কয়েকটা ঝোপঝাড় আর তার মধ্যে এখানে সেখানে আড় হয়ে আছে কারিপাতার গুল্ম। খোয়াইয়ের ও-প্রান্তে এইসব ঝোপ জোটবদ্ধ হয়ে পুরু মেখলার আকারে আঁকাবাঁকা সারিতে গাছের জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে। গাছের এই জঙ্গলই হল জমিদারের বনকরের সীমানা। আমার থেকে সত্তর গজ তফাতে ঝোপের সেই আঁকাবাঁকা সারির পাশে সর্দারজীকে দাঁড় করিয়ে বললাম, কোনো জানোয়ার গাছের জঙ্গলের দিকে পালাতে গেলেই উনি যেন তাকে গুলি করেন।

খোয়াইয়ের দুদিকে এবং আশপাশের এলাকায় প্রায় পাঁচশো বর্গ গজ জায়গা জুড়ে এর আগে আধপাকা অবস্থাতেই ঘাস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তলার দিক পুড়ে গেলেও, ডগাগুলো আধঝল্‌সানো হয়ে ছিল। পোড়া ঘাসের গোড়ার কালো আর ঝল্‌সানো ঘাসের ডগার হলুদ—আগের রাত্রের বৃষ্টিতে ধোয়ামাজা এই দুই মেলানো মেশানো রং দেখে ডোরাকাটা বাঘছালের কথা আমার মনে পড়ে গেল।

খেদাড়েরা ক্রমশ কাছে সরে আসছে।

জেন্দুর কাশির শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। লুকিয়ে থাকা জানোয়ারগুলোকে খেদাবার জন্যে জেন্দু থেকে থেকে হাততালি দিচ্ছিল। কিন্তু ফিরে বারেও সেই পোড়া কপাল।

নিজের মনেই বললাম, 'গাঁসুদ্ধ লোকের ফসলে পেট মোটা করা জানোয়ারগুলো গেল কোন্ চুলোয়? কিসের ভয়ে ওরা পালিয়েছে?'

পরমুহূর্তেই, যেন আমার প্রশ্নের জবাবে, আমার বিশ হাত তফাতে খোয়াইয়ের কাছাকাছি বাঘ-রঙা জমির টুকরোটাতে আমি ঘাস নড়ে উঠতে দেখলাম। নড়ে নড়ে খোয়াইয়ের দিকে সেটা যাচ্ছিল। যাই হোক সেটা, এক্ষুনি সে মধ্যেকার একটা ঝোপের ভেতর সেঁধিয়ে যাবে।

জড়িয়ে থাকা ঘাসের ডগার ভেতর দিয়ে ক্ষণেকের জন্যে আমি সেই দ্রুতসঞ্চরমান জীবটির সামান্য একটু আঁচ পেলাম—লাল্‌চে রঙের কী যেন একটা তরতর করে সবেগে চলে যাচ্ছে, অনেকটা ঢেউ খেলানো রোদের চকরা-বকরার মতন। ওটাকে কাকর (কুট্‌রা) ভেবে নিয়ে তৎক্ষণাৎ বন্দুক ছুঁড়লাম। তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। ঘাসের মধ্যে কোনো আছাড়ি-পিছাড়ি নেই, খোয়াইয়ের ধারে-পাশে ধুপধাপ কোনো আওয়াজ নেই। আমি ধরে নিলাম গুলিটা ডাহা ফসকেছে এবং যাচ্ছেতাইভাবে গুলি করার জন্যে নিজেই নিজের মুণ্ডপাত করলাম।

খেদাড়েদের আসবার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম। কেউই এল না। সময় চলে যাচ্ছে, মিনিটের পর মিনিট পার হচ্ছে—তবু

লোক দুটোর কোনো চিহ্ন নেই। আমি যখন অমন একটা 'বাঁধিয়ে রাখা'র মত গুলি করে নিজের গালে চুনকালি মাখালাম, তখন নিশ্চয়ই ওরা খুব একটা দূরে ছিল না। খুব বেশি হলে তিরিশ গজ দূরে জেন্দুকে আমি এমন কি কাশতেও শুনেছি। হল কী ওদের? কোন্ চুলোয় গেল?

আমিও আরও দশ মিনিট ওদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তবু খেদাড়েদের দেখা নেই। জঙ্গলটা শান্ত, একেবারে নিশ্চুপ নিঃসাড় —ঝড় ওঠার আগে থমথমে সমুদ্রের মত। মাথার ওপর গাছের গায়ে একফোঁটা হাওয়া নেই, নিচে ঘাসগুলোতে কোনোরকম আন্দোলন নেই। এর আগে গাছের মগডালগুলোতে কাল রাত্রের বৃষ্টির জল জমে প্রথমে নিচের পাতায়, তারপর মাটির ওপর টিপির টিপির করে যে সমানে পড়ছিল, তাও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। আমার এমন একটা ধন্ধ-লাগা ভাব হয়েছিল যে, অতি স্পষ্ট জিনিসও আমার মাথায় ঢুকছিল না। খেদাড়েদের জন্যে একদিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি, ওদিকে আবার মনে মনে এড়াতেও চাইছি—কেননা দেখা হলেই তো আমাকে আবার গুলিটা করার বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে।

আরও পাঁচ মিনিট কেটে গেল। তখনও খেদাড়েদের দেখা নেই। বনের সেই নৈঃশব্দ্য জগদ্দল পাথরের মত আমার বুকে চেপে বসছিল। আমার মধ্যে কেমন যেন একটা আনচান-করা ভাব হচ্ছিল। আমার পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না, ওদের চলে আসতে বলার জন্যে আমি শিস্ দিলাম। তার জবাবে ওদের মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ শিস্ দিয়ে সাড়া দিল, কিন্তু শিসের আওয়াজটা অপ্রত্যাশিতভাবে উঁচু থেকে ভেসে আসায় আমার কেমন যেন একটু খট্‌কা লাগল। জায়গাটার ধারে-কাছে কোনো টিলা বা ঢিবি, কই, এসে অবধি আমার তো চোখে পড়ে নি! তাহলে শিস্ দেওয়ার আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে?

চারদিকে চোখ চেয়ে চেয়ে শেষকালে দেখি প্রায় ষাট গজ দূরে

একটা গাছের মগডালে উঠে বসে আছে আমাদের জেন্দুবাবু। সে প্রাণপণে হাত নেড়ে নেড়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। আর তার কাছেই বসে ছিল ভৃত্যটি; সেও ঐভাবে পরিত্রাহি হাত নেড়ে চলেছে। যখন ওদের দিকে আমি চোখ তুলে তাকালাম, জেন্দু হাত দিয়ে বিচিত্র রকমের এক ইশারা করল। জেন্দু তার মুখের দুপাশে হাতদুটো উঁচু করল এবং আকর্ণ হাঁ করে হাতদুটো ক্রমশ ফাঁক করে চলল—তার হাতের আঙুলগুলো টান টান হয়ে থাকল।

আমি তার সেই বিট্‌কেল মূকাভিনয়ের কোনো মানে খুঁজে পেলাম না। ওর রকম দেখে আমার মজা লাগল এবং মনে মনে হাসলাম। এরপর আমি যখন ওকে ইশারা করে নেমে চলে আসতে বললাম, জেন্দু তখন প্রবলভাবে মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে দূরে খোয়াইয়ের একপ্রান্তে যেখানে সর্দারজী মোতায়েন ছিলেন, সেইদিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে দেখাতে লাগল। সেদিককার ঝোপের ভেতর কী একটা যেন জিনিস সে আঙুল দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু তখনও আমার বোধগম্য হচ্ছিল না লোকদুটো ঠিক কী বলতে চাইছে। কাজেই তখন আমি উইঢিবির পেছন থেকে সরে গিয়ে খোয়াইয়ের ধার থেকে বেশ খানিকটা দূরে দূরে থেকে খোয়াইটার পাশ দিয়ে ঘুরে, ওরা যে গাছে বসে ছিল আমি পেছন দিক থেকে সেই গাছতলায় এসে পৌছুলাম। ওরা হাত নেড়ে আমাকে গাছে উঠে পড়তে বলল। ওটা ছিল কাঁটাওয়ালা খের গাছ; গাছের কাটাগুলো শক্ত বাকা ধরনের; এর কাটায় গা ছড়ে গিয়ে রক্ত বার হয় এবং বিছের কামড়ের মত জ্বালা ধরে।

আমি খানিকটা কষ্ট করে গাছে চড়ে জেন্দু যে ডালে বসে ছিল, সেই ডালে গিয়ে ঠেলে উঠলাম: ওঠবার সময় শরীরের নানা জায়গা ছড়ে কেটে গেল। রুদ্ধ নিশ্বাসে জেন্দু আমাকে বলল, বাঘটা হেঁচ্‌ড়ে হেঁচ্‌ড়ে দূরের ঝোপটাতে গিয়ে ঢুকেছে—বেঁচে আছে, না মরে গেছে, তা সে জানে না।

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, 'বাঘ? কী বলছ তুমি?'

জেন্দু বলল, 'হ্যাঁ, বাঘই তো। এই গাছটা থেকে হাত চল্লিশ দূরে, ঐ যে ঐখানে, খোয়াইতে যাওয়ার মাঝপথের ঝোপটার মধ্যে বাঘটাকে আমি ঘাঁটাই। জমিতে ঘাড় গুঁজে পড়ে থেকে আপনার দিকেও তাকিয়ে ছিল। ওর ল্যাজটা ছিল আমার দিকে—ঠিক সাপের মত ল্যাজটা নড়ছিল। ল্যাজটাই আগে চোখে পড়ায় আমি ওটাকে সাপ বলেই মনে করেছিলাম। ঐ যে পিঠে কালো আর হলুদে নক্সা-কাটা কী যে একটা নাড়াকাতুরে সাপ, আপনি তো জানেন, ঠিক তার মতন। আমি ভেবেছিলাম ওটা সেই সাপ। সাপের মাথা ছেঁচে দেবার জন্যে আমি খোয়াইয়ের ধার থেকে পাথরের একটা চাঙড় খসিয়ে নিলাম। পাথরটা খসাতে গিয়ে যে শব্দটুকু হল, তাতেই বাঘের চমক ভেঙে গেল। সটান উঠে দাঁড়িয়ে গোটা শরীর জাগিয়ে তুলে সে পেছন দিকে তাকাল। আমার সবচেয়ে কাছে ছিল এই গাছটা। কিভাবে জানি না, তবে পরমুহূর্তেই দেখি তড়াক করে আমি এই গাছের মগডালে উঠে বসে আছি। আমার দেখাদেখি আপনার চাকরটিও গাছের ওপর এসে জুটে গেল। বাঘটা আমাদের দিকে তাকাল, তারপর নজর দিল সামনের দিকে—সেখানে উইঢিবির পেছনে আপনাকে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। বাঘকে আমি তাড়াবার পর সে দিক পরিবর্তন করে খোয়াইয়ের দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিল। যখন সে ঘাসের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল, তখনই তাকে আপনি গুলি করেন। আমি সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। বাঘ তার ঘাড় গুঁজে খোয়াইয়ের তলায় হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়েছিল। খানিকক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে বাঘ আবার উঠে দাঁড়ায়। এক মুহূর্ত ঝিম ধরা অবস্থায় থেকে, তারপর টলতে টলতে খোয়াইয়ের ভেতর দিয়ে সে ঝোপের মধ্যে চলে যায়। আমার ধারণা, এখনও সে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ঝোপের মধ্যেই আছে।'

আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারলাম, বোকার মত কাজ করে সর্দারজীকে আমি কিভাবে প্রায় যমের মুখে ঠেলে দিয়েছি। কাকে

নিশানা করছি না জেনে গুলি করাটা শুধু মূঢ়তা নয়, সাংঘাতিক অপরাধ—এতে শিকারের সমস্ত রীতিনীতি ভয়ানকভাবে লঙ্ঘন করা হয়। ভয়ে আমার পেটের ভেতর গুড়গুড় করে উঠল; সর্দারজীর কথা ভেবে আমি বেজায় উতলা হয়ে পড়লাম। আহত বাঘ যেখানে পড়ে আছে বলে জেন্দু বলছে, তার কাছেই সর্দারজীর থাকবার কথা। আমার গুলির শব্দে কৌতূহলী হয়ে উনি যদি আমার কাছে চলে আসবেন বলে ঠিক করে থাকেন, তাহলে উনি হয়ত রাস্তা সংক্ষেপ করে খোয়াইয়ের ভেতর দিয়ে আসবার সিদ্ধান্ত নেবেন। আর তা যদি করেন তাহলে একেবারে সোজা চোট-খাওয়া বাঘের মুখে।

ভেবে আমি শিউরে উঠলাম। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে গাছ থেকে আমি নেমে পড়লাম। আমার পেছন পেছন এল জেন্দু আর আমার ভৃত্য। ডানদিকে খোয়াইটা বেশ খানিকটা দূরে রেখে আমি সর্দারজীর জায়গার দিকে ছুটে গেলাম।

গিয়ে দেখি সর্দারজী বেশ বহালতবিয়তেই আছেন। বাঘ কাছেই যে রয়েছে, এসব তিনি ঘুণাক্ষরেও জানেন না। দিব্যি গাছ থেকে টেপারি পেড়ে খাচ্ছেন।

আমি চটপট সব ব্যাপার বলে দিয়ে তাঁকে গাছে উঠে পড়তে বললাম।

ভদ্রলোকের বেজায় খোদার খাসির মত চেহারা। যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া। সে তুলনায় কটিদেশের বহর একটু বড় এবং ভুঁড়িটিও অস্বাস্থ্যকর রকমের বড়। প্রাণপণে তিনি গাছে ওঠবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু যতবারই ওঠেন ততবারই পড়ে পড়ে যান। আমি আর জেন্দু দুজনে মিলে ঠেলাঠেলি করেও সেই সাড়ে তিনমণী লাশকে গাছে তুলতে অপারগ হলাম। আমি ওঁকে বললাম উনি বরং খোয়াইটা থেকে দুশো হাত সরে গিয়ে গাছের জঙ্গলটার কাছে ঘাপ্‌টি মেরে থাকুন। সর্দারজী তা করলেন না; উনি যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে সেই জায়গাতেই পায়ে শেকড় গজিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

যেখানে সর্দারজী রয়ে গেলেন, সেই জায়গা আর খোয়াইয়ের মাঝপথে একটা গাছের ওপর জেন্দুকে আমি উঠে পড়তে বললাম। জেন্দু গাছের ওপর উঠে পড়ে ইশারায় জানাল বাঘটাকে সে আদৌ দেখতে পাচ্ছে না—অতটা উঁচু থেকে ঝোপটা পরিষ্কার দেখা যাওয়া সত্ত্বেও। ভৃত্যটিকে সঙ্গে নিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে একটা গাছ পাকড়ালাম। বাঘ যে ঝোপে আছে বলে বলা হচ্ছে, গাছটা তার মাত্র হাত বিশেক দূরে। ভৃত্যটিকে গাছের মগডালে উঠে পড়তে বললাম এবং ঝোপের ভেতর কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা জানাতে বললাম। হাতে গুলিভরা বন্দুক নিয়ে গাছটাকে আড়াল করে মাটিতে আমি খাড়া হয়ে থাকলাম।

এটাও একটা খের গাছ। গাছে পাতা নেই, কাঁটাভর্তি খসখসে ছাল, তবে ডালপালার কাঠ খুব শক্ত মজবুত। গাছের বেড় পাঁচ ফুটের মত এবং লম্বায় তিরিশ চল্লিশ ফুট। দশ ফুট উঁচুতে গাছটাতে একটা জুতসই ডাল ছিল, যেটা খোয়াইয়ের দিকে চলে গেছে; তার সামান্য ওপরে আরেকটি ডালও সমান্তরাল হয়ে খোয়াইয়ের দিকে গেছে। আমার ভৃত্যটি নিচের ডালে পা রেখে উঁচু ডালটি হাত দিয়ে ধরে সামনের ঝোপটা তন্ন-তন্ন করে দেখছিল। সে মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল বাঘটাকে সে আদৌ দেখতে পাচ্ছে না।

আমি তাকে ইশারা করে উঁচু ডালটাতে উঠে দেখতে বললাম। এবারও সে মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল বাঘকে সে দেখতে পাচ্ছে না। এবার সে আরও উঁচুতে উঠে গেল; দাঁড়াবার কোনো ডাল না পেয়ে গাছের মূল কাণ্ডটা সে আঁকড়ে ধরে থাকল। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি ও কী ইশারা করে দেখার জন্যে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ঝোপের এ-প্রান্তে একাগ্রদৃষ্টিতে কী যেন ও দেখছে। যত দেখছে ততই ওর চোখ বড় বড় হয়ে উঠছে।

ওর ইশারার অপেক্ষায় আর না থেকে যে ডালে ও গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল, সেই ডালটাতে আমি ঝাঁপ দিয়ে উঠে পড়লাম। শরীরের দোলানি কমাবার জন্যে আমি সবে বাঁ হাত দিয়ে ওপরের

ডালটা শক্ত করে বাগিয়ে ধরেছি, ঠিক সেই সময় একটা হিংস্র গর্জনে গোটা ঝোপ ফেটে পড়ল। পরমুহূর্তেই দেখি বাঘ তার পেছনের দুপায়ে দাঁড়িয়ে আমাকে ধরবার জন্যে গাছের গা নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে।

এরপর কী কী ঘটেছিল আমার ভালো মনে পড়ে না। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, আমি বন্দুক-ধরা হাতটা এক ঝট্‌কায় মোটা-মুটি বাঘের দিকে নামিয়ে ওপরকার ডাল জড়িয়ে থাকা বাঁ হাতটা দিয়ে বাঘের হা-করা মুখের ভেতর গুলি করেছিলাম—বন্দুকের নলের মুখটা ছিল বাঘের মুখ থেকে ফুট দুয়েক দূরে। বন্দুকটা ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে আসার ফলে আমার আঙুলগুলো বিশ্রীভাবে ছেঁচে গিয়েছিল এবং আমার থুতনিটা খুব জোরে ঠুকে গিয়েছিল। একটা বালির বস্তা পড়লে যে রকম শব্দ হয়, তার চেয়েও বেশি আওয়াজ করে আতঙ্কিত বাঘের সে কী পতন। বিজিত সেই বীর তার শক্তির শেষ বিন্দুটুকু জীইয়ে রেখেছিল সম্ভব হলে তার ঘৃণ্য শত্রুকে শেষ আঘাত হানবার জন্যে, যে শত্রু কাপুরুষের মত ঝোপঝাড় আর গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে তার ওপর মৃত্যুবাণ ছুঁড়েছে · · ·

আমরা দুজনেই বেশ খানিকটা সময় অবধি প্রাণভয়ে যে যার ডাল ধরে অপেক্ষা করে রইলাম—যেন দুটো রামদাসের শরীরের রাঙা বিশেষ অঙ্গে হঠাৎ বিস্ফোটকের উৎপাত দেখা দিয়েছে। আমরা একটুও নড়ছি না, বোধহয় নিশ্বাস অবধি নিচ্ছি না। অতিরিক্ত খড়-ঠাসা কাকতাড়ুয়াদের মত আমরা গাছটাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছি; দড়িতে টাঙানো মাড়-দেওয়া একজোড়া পাতলুনের মতন আমরা পত্‌ পত্‌ করছি। আর ঠিক তারপরেই আমার ভৃত্যটি হঠাৎ হো হো হো-হো করে পেট ফাটিয়ে হেসে উঠল। তার হাসির কারণ না জেনে আমিও তার হাসিতে যোগ দিলাম। যতক্ষণ না আমাদের চোখ ফেটে জল এল, ততক্ষণ আমরা কেবল হাসতেই থাকলাম, হাসতেই থাকলাম।

অনেক কষ্টে আমি নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে ঘাড় উঁচু করে ওর দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম, অমন উজবুকের মতন কেন ও হাসছে। তখনও ওর হাসির দমক শেষ হয় নি, বিড়বিড় করে ও যে কী বলল বুঝলাম না। জেন্দু আর সর্দারজীকে যেখানে আমরা রেখে এসেছিলাম, ও সেইদিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল। সেদিকে তাকিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, তার কথা মনে করলে আজও আমার হাসিতে পেটে খিল ধরে।

একটা ঝোপের তলায় সর্দারজী, তাঁর মাথার চুল গাছের কাঁটায় আটকে গেছে এবং তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে প্রাণভয়ে তিনি ছুটছেন। গাছের কাঁটা তাঁর মাথার ঝুঁটি যে পাকড়ে আছে এবং তিনি যে ঝোপটা ছেড়ে একপাও নড়তে পারছেন না, সে বিষয়ে তাঁর একেবারেই হুঁশ নেই, তাঁর মাথায় এইটুকু রয়েছে যে, যত জোরে পারেন তাঁকে ছুটতে হবে। যে রকম বেগে তিনি পা ছুঁড়ছিলেন এবং তার জন্যে তিনি যতটা সময় নিচ্ছিলেন, তাতে মাইল দুই রাস্তা অনায়াসে তিনি কাবার করতে পারতেন। কিন্তু সার্কাসের নাচওয়ালা জলহস্তীর মতন বেচারা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে সমানে তাল ঠুকছিলেন। দু মাইল পথ কায়মনোবাক্যে তিনি ছুটতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নোঙরটা তোলা হয় নি বলে যাত্রারম্ভ ক'রেও সর্দারজী যেখানকার সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। সত্যিকারের নাচওয়ালা জলহস্তী--সেই রকমই তাঁকে দেখতে হয়েছিল। এই সারাটা সময় একই জায়গা দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক কী দৌড়টাই না দিয়েছেন।

এ ছিল সেই মানুষখেকো বাঘিনী, যে আমাকে চূড়ান্ত রকমের ভুগিয়েছে। এটা প্রমাণ হয় ছিল পরেকার ঘটনাবলীতে—অথবা ঘটনার অভাবে—কেননা এরপর আর দীর্ঘদিন ও-অঞ্চলে কাউকে বাঘের হাতে মারা পড়তে দেখা যায় নি।

বাঘিনীটি ছিল একটি পঙ্গুপ্রায় প্রাণী। বুকে, দাবনায়, তার

গা ভর্তি গভীরভাবে শজারুর কাঁটা বিঁধে ছিল। কাঁটার বার-হওয়া অংশগুলো সে দাঁত দিয়ে কেটে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু ফুটে-থাকা অংশগুলোর দরুন তার গায়ে বেশ কয়েকটা পচা ঘা-র সৃষ্টি হয়েছিল। ওর সামনের ডান পায়ের দাবনায় পুঁজ জমে তা থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল এবং ঘাড়ের তলার ক্ষতটিতে সাদা ধড় আর কালো মুণ্ডুওয়ালা মোটা মোটা পোকা কিলবিল করে বেড়াচ্ছিল।

বাঘিনীর এক চোখ কানা ছিল এবং তার চোখের ফাঁকা কোটর থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে ছিল একটি ভাঙা কাঁটার সরু দাঁড়া। কাঁটাটা তুলে ফেললাম ; হরিদ্রাভ রঙের প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা কাঁটা ; তার তিনভাগের একভাগ মাংসের মধ্যে গাঁথা ছিল এবং ভেতরকার ফুটে-থাকা অংশের প্রান্তভাগ ছিল অংশত পচা-গলা। শজারুর কাঁটা পচে গ'লে তার ঐ অবস্থা হতে নিশ্চয়ই ছ'মাসেরও বেশি সময় লেগেছিল—সেটাই হল বাঘিনীর মানুষখেকো জীবনের মেয়াদ। বোঝাই যাচ্ছে, একটি তরুণ কিন্তু দুর্ভাগা প্রাণীর শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর মানুষখেকোতে পরিণত হওয়ার মূলে ছিল সেই শজারুটি।

হতভাগা জানোয়ারটিকে ভীষণ কষ্ট পেতে হয়েছে। তার শরীর শুকিয়ে টিংটিঙে রোগা হয়ে গিয়েছিল। তেলচর্বি ছিল না বললেই হয় ; যেটুকু মাংস ছিল, তাও গ'লে গ'লে পড়ছিল। আমি জানি, কোনো শিকারীর খপ্পরে না পড়লেও এমনিতেই সে কিছুদিনের মধ্যে পটল তুলত। কিন্তু যত কম দিনই সে বেঁচে থাকুক, আরও ক'টা মানুষের জীবন সে নষ্ট করত কেউ বলতে পারে না।

বাঘিনীটি মেপে দেখা গেল, বক্ররেখা বরাবর সাত ফুট দু ইঞ্চি এবং একেবারেই উল্লেখের যোগ্য নয়।

আমার প্রথম বুলেটটি লেগেছিল ওর বাঁ পাশে—পাঁজরের শেষের হাড়টির খুব কাছে ; গুলিটা ওর কলজে স্পর্শ না করে ঘুরে গিয়ে বুকে লেগে ডানদিকের ফুস্‌ফুস্‌টা ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল।

ময়না তদন্তের জন্য বাঘটিকে আমরা কাঁটা-ছেঁড়া করেছিলাম ; কিন্তু তার ক্ষত থেকে ভক ভক করে দুর্গন্ধ আর গল্‌ গল্‌ করে পুঁজ

বার হওয়ার ফলে আমাদের এমন অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবার যোগাড় হল যে, ঐ পর্যন্ত ছাল ছাড়িয়েই আমাদের সে কাজে ইস্তফা দিতে হল। বাঘিনীকে আমরা কবর খুঁড়ে মাটি চাপা দিতে চেয়েছিলাম; কিন্তু আমাদের কাছে খোন্তা-শাবল না থাকায়, আশপাশ থেকে কাঠকুঠো যোগাড় করে এনে বাঘিনীকে আমরা চিতায় চড়ালাম।

# আমার কথাটি

একদিন সন্ধ্যেবেলা ক্লাবে ব'সে আছি। মিষ্টি দেখতে একটি মেয়ে এসে জিগ্যেস করল, 'থেকে থেকে কেন আপনি বাঘের পেছনে ছোটেন?'

উত্তর দিই, 'সুন্দর ব'লে।'

'সুন্দর? ভয়ঙ্কর নয় বুঝি?'

'ভয়ঙ্কর, হ্যাঁ, একদিক থেকে তাই। বলতে পারেন 'ভয়ঙ্কর সুন্দর'।

'ও, আচ্ছা।'

'বাঘ কিন্তু অর্ধেক ভয়ঙ্করও নয়, ধরুন, সেই সুন্দরী রমণীর চেয়ে যিনি নিজের দেমাক খুশি করার জন্যে ভালবাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন, বশীকরণের মন্ত্রে যিনি মারণ-উচাটনের বাণ হানেন।'

'বটে, বটে! আপনি দেখছি মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন। তাই না?'

'উঁহু। বরং বাঘ সম্বন্ধে তার চেয়ে ঢের বেশি জানি, বা জানবার ভান করি। বাঘ সত্যিই মহাশয় প্রাণী, কারো সাতে পাঁচে নেই, সব সময় নিজেকে আড়াল ক'রে রাখে। দাঙ্গাবাজ দেশভক্ত বা ভুঁইফোঁড় ঠিকেদারদের হাতে পড়ার চেয়ে ঢের নিরাপদ বরং বাঘের মুখে পড়া। গাড়িঘোড়ার ভিড়ে রাস্তা পার হওয়ার চেয়ে ঢের নিরাপদ বরং জঙ্গলের মধ্যে হাঁটা। মানুষের রক্তচোষা মুনাফালোলুপ নিরামিষাশী মহাজনের চেয়ে মাংসাশী বাঘ বরং কম হিংস্র, কম নির্দয়।'

'তোফা বলেছেন। কিন্তু একটা কথা। আপনি বললেন বাঘ সবচেয়ে সুন্দর প্রাণী, উদারচেতা এবং নির্বিবাদী, তেমন বিপজ্জনকও নয়—যদি তাই হয় তো মারেন কেন? মনে হচ্ছে, আপনি তাদের ভালবাসেন, আবার খতমও করেন। এ দুটো কি পরস্পরবিরোধী হচ্ছে না?'

'হ্যাঁ, হচ্ছে। যদিও স্বীকার করতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। মানুষের মনের যে কত রকমের বিকার থাকে, তা কি আপনি জানেন না? মানুষ নামের এই জঘন্য জীব চোখে কিছু ভালো ঠেকলেই তাকে নিকেশ করে। মানুষ গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে নেয়—ফুল জিনিসটা সুন্দর গন্ধ ব'লে। পাখি রংচঙে আর সুকণ্ঠ ব'লে মানুষ তাকে খাঁচায় পুরে রাখে। মেয়েরা দেখতে সুন্দর আর প্রাণমন নন্দিত করে বলে বিয়ের নামে তাদের হাতে-পায়ে বেড়ি পরানো হয়। মানুষ সব সময় সব কিছু ভোগদখল করার জন্যে হেদিয়ে মরছে, নিদারুণ এই লালসা যাকে ছোঁবে, তাই নিষ্প্রাণ হয়ে নেতিয়ে পড়বে। শত শত বছরের সভ্যতা আর প্রগতি সত্ত্বেও মানবাত্মার এই জঘন্য বিষাক্ত ব্যাধির আজও নিরাময় হয় নি। আশা করা যায়, আমাদের পরে যারা আসবে তারা আমাদের চেয়েও ঢের বেশি সভ্য হবে। আমাদের চেয়ে তারা ঢের বেশি সংবেদনশীল হবে, আমাদের চেয়ে ঢের বেশি সংস্কৃতিসম্পন্ন প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থায় তারা বাস করবে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, যখন কোনো বাঘ, বলতে গেলে কোনো বন্য প্রাণীই আর নিজের নিজের বাসস্থানে টিকে থাকবে না' - কথাটা ঠাট্টার সুরে ব'লে মেয়েটি প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল।

দিন কয়েক আগে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার এই অনতিদীর্ঘ সংলাপ—আমার মনে হচ্ছে, আমার বইয়ের বাংলা সংস্করণে এটা 'লেখকের কথা'র মুখপাত হিসেবে যথাযথ হবে। ভারতের বনেজঙ্গলে আজও অবাধে যে সংহারপর্ব চলেছে, তাতে ভবিষ্যতের কথা ভেবে মর্মবেদনা বোধ করছি। নইলে ভারতে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিল এশিয়ার বিলুপ্তপ্রায় যে সিংহ, তার এই ক্রমক্ষীয়মাণ অবস্থাই বা হবে কেন? (এশিয়ার অন্য কোথাও আজ আর সিংহের নামগন্ধ নেই; আছে একমাত্র ভারতভূমিতে—সেখানেও তার টিকে-থাকা ক্রমেই অসাধ্য হয়ে পড়ছে)। এদেশে সিংহদের কড়া নজরে রক্ষা করার (?)

কথা, গির্ অরণ্যের অভয়বনে সতর্ক প্রহরাধীনে (?) তাদের থাকবার কথা।

এটা কি লজ্জার কথা নয়? ক্লাবে মেয়েটি সেদিন পরিহাস ক'রে যে ভবিষ্যতের ছবি তুলে ধরেছিল, আমরা কি যথার্থই সেইদিকে যাচ্ছি না? বিষয়টা আমাদের একটু তলিয়ে ভেবে দেখা উচিত; কিছু একটা আমাদের করা উচিত—তা না হলে আমাদের এত মূল্যবান, এমন অনন্য জাতীয় ঐতিহ্য, সব রসাতলে যাবে।

প্রকাশক ধরেছেন আমি যেন নিজের সম্বন্ধে কিছু বলি। দুচার কথায় তা এই :

একটি একটি ক'রে দুর্দৈবের মালায় গাঁথা আমার জীবন—কত যে কাটা ছেঁড়া, কত যে খোঁচা খাওয়া, তার অন্ত নেই। জোড়াতোড়া যে জিনিসটাকে বলা হয় জীবন—একেবারেই দৈবাৎ, নেহাৎ 'আপতিক' থেকেই তার আরম্ভ। এমন যে জীবন, তার কাছ থেকে কেউ এ ছাড়া আর কীই বা প্রত্যাশা করতে পারে। এ আমার চেয়ে-পাওয়া ধন নয়; দেবার আগে কেউ আমাকে জিগ্যেসও করে নি।

তবু এই দুঃখের গোলকধামের মধ্যেও আমার কিন্তু সান্ত্বনার একটা দিক আছে—বিশেষ এক জায়গায়, বিশেষ এক পরিবারের মধ্যে আমার গিয়ে পড়ার ব্যাপারটা। জায়গাটা হল হিমালয়ের কোলেপিঠে—যে জায়গা শিকারীদের ভূস্বর্গ; পরিবারটি হল এক স্বনামধন্য ক্রীড়ামোদী যোদ্ধবংশ।

আমার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন উপজাতির অপূর্ব মানুষ। খাঁটি মাটির সন্তান। মাটির মতই জীবনে মরণে তাঁরা ছিলেন সমান নির্লিপ্ত। মারতে বা মরতে তাঁরা পরোয়া করতেন না জীবনের—না নিজেদের, না পরের। তাঁদের ছিল ফুর্তিতে বেঁচে থাকা, মৃত্যুও

তাই—ছুটোই খুব দিলদরাজভাবে ফেলে ছড়িয়ে। তাঁরা হাঁটতেন বুক ফুলিয়ে; মাথা নোয়ানোকে দেখতেন ঘৃণার চোখে। মোগলদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে তাঁরা পুরুষানুক্রমে লড়েছেন; দেয়ালে যখন পিঠ ঠেকে গেছে, তখন তাঁরা রাজস্থান থেকে চাটিবাটি উঠিয়ে চলে গেছেন চিরদিনের মত; দখল ক'রে বসেছেন শিবলিক পাহাড়ের সানুদেশ; সেখান থেকে লড়াই চালিয়ে গেছেন গেরিলা পন্থায়।

মেয়েমানুষ, মারণাস্ত্র, ঘোড়া, কুকুর, গানবাজনা আর কবিতা—ঠিক এমনি ক্রমপরম্পরাতেই তাঁরা ভালবাসতেন। হাতে যখন লড়াই থাকত না, তখন তাঁরা বেরিয়ে পড়তেন বাঘভালুক শিকারে। তাঁদের কোনো কোনো আবেগের ঢল তাঁরা আমার রক্তেও বইয়ে দিয়ে গেছেন, তবে আমি তাঁদের মজ্জাহীন, অযোগ্য সন্তান—তাই আমার পছন্দের ক্রম কিছুটা পাল্টেছে: আমার ক্রমানুসারে অস্ত্রই প্রথম, শিকার দ্বিতীয়…

তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় নেমে আমারও হয়েছিল ফাঁসির হুকুম; পরে সেই সাজা মকুব হয়ে আমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। আমার পূর্বপুরুষেরা পারেন নি; আমি পেরেছি জয়ের ফল আস্বাদন করতে। কিন্তু আজকের শাসকচক্রের হাতে প'ড়ে সে ফল আজ তিক্ত; এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রে আমার যেকোনো পূর্বপুরুষের পরাজয়ের চেয়েও তার জ্বালা আরও দুঃসহ।

বড় হয়ে আমি পেশায় হব যোদ্ধা—সেইভাবেই ছোট থেকে আমাকে তালিম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিশের দশকের শেষের দিকে হাওয়া এমন গরম হয়ে উঠল যে, আমি রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়লাম এবং তার ফলে কারাগারে বন্দী হলাম। লম্বা মেয়াদে জেলে থাকায় লেখাপড়ার ক্ষেত্রে আমার যা ঘাটতি ছিল তা পূরণ করার সুযোগ মিলে গেল। দীর্ঘ চোদ্দ বছর ধ'রে প্রাণপণ পরিশ্রম ক'রে আমি আমার মনের চৌহদ্দি বড় ক'রে নিলাম। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমি শিখে প'ড়ে নিলাম, গড়পড়তা ধরনের মানসিক

বৃত্তিতে যতটা সম্ভব। কিন্তু কী ক'রে নিজের মধ্যে, কী ক'রে নিজের জীবনের ক্ষেত্রে পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়, সেটা আর শেখা হল না। যে চিরচঞ্চল বন্য প্রাণী ছিলাম; তাই থেকে গেলাম। আমার শৈশব কেটেছে অবাধ্য গররাজী বন্যতায়; বড়রা আমার মধ্যেকার জানোয়ারটাকে যতই বাগে আনতে চেয়েছে—ততই সে জবরদস্ত হয়ে উঠেছে, তেড়েফুঁড়ে উঠেছে এবং ততই হয়েছে হুঁশিয়ার। আমি সমানে আত্মরক্ষা করেছি, একা একা গুম হয়ে থেকেছি—যা না হলে দুঃখের পারাবার পাড়ি দেওয়া যায় না।

বন্ধনদশায় আমার মনে হয়েছে সুখ থেকে বঞ্চিত, বেদনায় ক্ষতবিক্ষত, নিঃসঙ্গ, করাল ঢেউয়ের নিরবচ্ছিন্ন ওঠাপড়াই জীবন। মনে হয়েছে জীবন এক মর্মান্তিক পরিহাস, আদিজননীর দুর্ভাগ্যপ্রসূত বলাৎকৃত এক অপসৃষ্টি, প্রকৃতির এক দারুণ দুর্বিপাক। অর্থহীন হতে হতে যার অস্তিত্ব অবধি খোয়া যায়। সেই তলকালাম জীবনের মধ্যে ঝিকমিক করা কয়েকটি বিরল অভিজ্ঞতা, ঘটনা, ক্রিয়াকর্ম আর চিন্তাভাবনার মধ্যে আমি জীবনের অর্থ খুঁজতে চাই নি। জীবনকে আনন্দময় করার জন্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের রচনা, নন্দলালের ছবি, শুভলক্ষ্মীর গান। কিন্তু সে তো শুধু দুঃখের সাগরে ঢেউয়ের শিখরে বহু আরাধনায় পাওয়া ক্ষণিকের ফেনপুঞ্জেরই মত; দেশের সবাই যে লক্ষ্যে একাগ্র তার থেকে নিজেকে এক ঘণ্টার জন্যে অতটা ওপরে ওঠানোর সুখ যেন নক্ষত্রের মত জ্বল জ্বল করত—যারা দেখত তাদের মনে হত এ যেন এক শাশ্বত সত্য, যেন তাদের নিজেদেরই সুখের স্বপ্ন। কিন্তু সেই ছোট্ট তারায় ঝিকমিক করা আলোর চেয়েও বড় জিনিস ছিল দুঃখে রক্ত আর কান্নায় ভরা গর্জমান সমুদ্র আর আকাশের দিকে সারাক্ষণ পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠা বেদনার কুঞ্ঝটিকা।

তাই ব'লে এমন নয় যে, জীবনে কখনও সুখ পাই নি। সবচেয়ে অসুখী জীবনেও জাগে মেঘভাঙা রোদের কোনো কোনো মুহূর্ত, ঊষর পাথরের মধ্যেও ফোটে সুখের ছোট্ট ছোট্ট ফুল। কিন্তু মোটের ওপর আমি খুবই অসুখী; এবং অন্যদেরও আমি অসুখী করেছি,

অর্থাৎ, যখনই আমি তাদের ভালবেসেছি বা তারা আমার ভালবেসেছে। কেননা আমাকে ভালবাসতে গিয়ে তারা শুধু আমার একটা দিকই দেখেছে। মার্জিত রুচির মজার মানুষ হিসেবে আমাকে অনেকের ভাল লেগেছে; আমার ভেতরকার বন্য প্রাণীটাকে দেখে তারাই আবার আঁতকে উঠেছে, হতাশ হয়েছে। তা তো হবেই, আমি জেনে শুনে স্বাভাবিকভাবেই চেয়েছি, অখণ্ডভাবে দেখে লোকে আমাকে ভালবাসুক, যাদের ভালবাসা আমার কাছে সবচেয়ে কাম্য ব'লে মনে হয়েছে, বেছে বেছে ঠিক তাদেরই ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, আমার ভেতরের পশুত্বকে আড়াল করতে আমি সবচেয়ে অপারগ হয়েছি।

এমন মানুষও পেয়েছি, যারা আমার মধ্যেকার পশুটাকেই ভালবেসেছে—যে বাঁধা নয়, যে হিংস্র, যে জবরদস্ত যাকে কখনই পোষ মানানো যায় না। যখন হঠাৎ তারা দেখে ফেলেছে—শয়তান বন্য পশুটা আবার মানুষও বটে, সদ্গুণ যার সহবত সে কামনা করে, শুনতে চায় মোজার্ট, পড়তে চায় হাফিজ আর রবীন্দ্রনাথ, লিখতে চায় কবিতা, আঁকতে চায় ছবি আর মনে মনে পোষণ করে মানবিক শ্রেয়োবোধ—তখন তারা অদ্ভুতভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, নিরাশ হয়েছে। সাধারণত তাদেরই আশাভঙ্গ আর রাগ হয়েছে সবচেয়ে বেশি, এমনি ক'রে যখনই আমি তাদের সংস্পর্শে এসেছি, আমি আমার দ্বৈত দ্বিধাবিভক্ত স্বভাবটা অন্যের ভাগ্যের মধ্যে এনে তাদের মধ্যে অসুখীভাবের সংক্রমণ করেছি

সেইজন্যেই আমি চেয়েছি নিজের শক্ত খোলসের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখতে, নিজের চারধারে দুর্ভেদ্য জেলখানার মতই নিঃসঙ্গতার পাঁচিল তুলতে। সুখ যদি কখনও পেয়ে থাকি তো পেয়েছি একা থেকে কিংবা গহন বনের ভেতর গিয়ে। আধুনিক সভ্যতার গোটা ব্যাপারটা—শহরপ্রান্তের শৌখিন বাড়ি থেকে জমকালো হোটেল, হাইড্রোজেন বোমা থেকে কল্যাণকর রাষ্ট্র—সারবন্দী লাইন, লোকের ভিড়, ঝুলকালি, চাকার ঘর্ঘর, সিনেমা

জ্যাজের আর্তনাদ, অমানুষিক দারিদ্র্য আর মানুষকে অমানুষ করার টাকা—এ সমস্ত কিছুতেই আমার বিতৃষ্ণা। বড়লোকী দুনিয়া (যেখানে হিপি-ব্রতের জন্ম) সম্বন্ধে আমার ঘৃণার তীব্রতাকে আমি সামাল দিই প্রকৃতির সমস্ত দিকে একটানা গভীর আসক্তি আর মনের টান দিয়ে। আরণ্যক জীবনে আমি গভীর আনন্দ পাই; পাই বাঁচার প্রেরণা। এই ব'লে আমি নিজেকে তোয়াজ করি যে তাদের একজন হওয়ার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। কখনও সখনও আমি যে জীবহত্যা ক'রি—তাও তাদেরই মতন বিবেচনার সঙ্গে, নির্বিচারে নয়।

বনজঙ্গল আর তার বাসিন্দাদের কাছ থেকে যে আনন্দ আমি পেয়েছি, বাংলাভাষার পাঠকদের কাছে যদি তা পৌছে দিতে না পেরে থাক, আমারই তা প্রকাশের অক্ষমতা—অনুবাদকের নয়। বাংলাভাষার একটা বড় গুণ তার নিজস্ব ঘরোয়া ভঙ্গি—তারই জন্যে বাচনভঙ্গি আর শ্রুতিমাধুর্যে বাংলাভাষা একান্তভাবেই স্বকীয়। অনুবাদক সেই গুণ এতে যোগ করেছেন।

মডেল টাউন, শের জঙ্গ
দিল্লী